www.banglastreet.online
কলকাতা ও লন্ডন থেকে
একযোগে প্রকাশিত
বাংলা ST.
উৎসব
১৪২৮

TECHNO INDIA GROUP

www.technoindiagroup.in

Accreditation NAAC | NBA* | Ranking nirf | ARIIA | Approval & Affiliation

B.Tech. (Hons) 4 Yrs.
B.Tech. 3 Yrs.
(Lateral Entry)

Computer Science Engg.
Information Technology
Electronics & Comm. Engg.
Electrical Engineering
Bio Medical Engineering
Appl. Electronics & Instr. Engg.
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Computer Sc. & Business System
Artificial Intelligence and Machine Learning

B.HMCT 4 Yrs.
Bachelor of Hotel Management & Catering Technology

MBA 2 Yrs.
MBA (HR | Marketing | Finance)

MCA 2 Yrs.

আপনার পুজো ভাল কাটুক

Diploma 3 Yrs.
Hotel Management & Catering Technology
Computer Science & Engineering / Technology
Electronics and Tele Communication Engg.
Electrical Engg. | Civil Engg. | Mechanical Engg.

M.Tech 2 Yrs.
Electronics & Comm. Engg.
Computer Science Engg.
Control & Instrumentation
Power Systems
Geotechnical Engg.

Under Graduate Programme
■ Bachelor of Computer Applications (BCA & BCA-Hons) ■ Bachelor of Business Administration (BBA-Hons) ■ Bachelor of Travel & Tourism (BTTM-Hons) ■ BBA in Hospital Management (BBAHM-Hons) ■ B.Sc. in Hospitality & Hotel Administration (Hons) ■ B.Sc. in Cyber Security ■ B.Sc. in Data Science ■ B.Sc. in Culinary Science ■ BBA (Business Analytics)

Our Colleges

NETAJI SUBHASH* ENGINEERING COLLEGE
www.nsec.ac.in
9831817307,7044002539

MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
www.msit.edu.in
8910670685, 7044598807

TECHNO INTERNATIONAL NEW TOWN
www.tint.edu.in
9674112076, 9674112079

TECHNO INTERNATIONAL BATANAGAR
www.tib.edu.in
9830025810, 9830066214

SILIGURI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
www.sittechno.org
7477660427
9434527272

MAVEN INSTITUTE OF LEARNING AND EXCELLENCE
www.themaven.co.in
8240223141

ASANSOL ENGINEERING COLLEGE (JV)
www.aecwb.edu.in
9830261203

ABACUS INSTITUTE OF ENGG. & MGMT. (JV)
www.abacusinstitute.org
9830261203

TIG Helpline: 8013302685 / 7439934030

বাংলা স্ট্রিট উৎসব ২০২১

প্রকাশন সংস্থা
লুক ইস্ট মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

সম্পাদক
আশিস পণ্ডিত

অনুপ্রেরণা
সাগরিকা ভট্টাচার্য
বিপ্লব ঘোষ

সহযোগী সম্পাদক
পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক
প্রণব দত্ত

ব্যবস্থাপনা
মহম্মদ শাজাহান
দীপিকা শাসমল

সিস্টেম অ্যাডমিন
অভয় দে

অলঙ্করণ
শুভ্রনীল
বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী (অপারেশন নন্দাদেবী)

শিল্প নির্দেশনা ও প্রচ্ছদ
শুভ্রনীল

প্রচ্ছদের মডেল
মেধা চৌধুরী

বিপণন
তপন পাল
জয় মল্লিক

বিশেষ সংবাদদাতা
করিম রেজা
হাউস নং ২৭বি, রোড-৩
ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৫
ফোন +৮৮০১৪০৮২৬৫৪৯০
ইমেল rezakarimyvr@gmail.com

লন্ডন প্রতিনিধি
এ কে এস মাসুদ
১১২ শেরউড গার্ডেন, লন্ডন, ই১৪৯,
ডব্লিউ ডব্লিউ
ফোন ৪৪৭৭২৩৩১৭৮১৩

আশিস পণ্ডিত কর্তৃক সি ই ১৭ সল্ট লেক,
কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও
কলকাতা গ্রাফিক প্রা লি, ৩বি মানিকতলা
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট থেকে মুদ্রিত
RNI No. WBBEN/২০০৯/৩৫২৯৯

সম্পাদকীয় দপ্তর
সি ই ১৭, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪
টেলিফ্যাক্স ২৩২১ ০৭৩৮

ইমেল
write@banglastreet.online

ওয়েবসাইট
www.banglastreet.online

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে আরো একটা বছর কেটে গেলো। করোনার ভ্রুকুটি এখনো কাটে নি তারই ভেতরে প্রকৃতির রুদ্ররোষ মাঝেমধ্যেই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। কিন্তু এতকিছুর মধ্যেও উৎসবের জন্যে সেজে উঠতে চলেছে চারপাশ। কালো মেঘের মধ্যে থেকে থেকেথেকে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে সোনালি রোডের হাসি। প্রাণের তারে বেজে উঠছে আবাহনী সুর। সমস্ত বিপদের মধ্যেও মা আসছেন এই বার্তাই দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে আনন্দের রেশ। আবার জেগে উঠছে প্রাণের চাঞ্চল্য। আবার। আবার। আর সেই প্রাণের সুরেই প্রতি বছরের মতো এবারেও সেজে উঠেছে 'বাংলা স্ট্রিট', তার উৎসব সংখ্যার পশরা নিয়ে। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি সর্বত্র আজ যে অসুখের গভীর কালো ছায়া, তা যেন কোনো মতেই ছাপ না ফেলতে পারে আমাদের মনের মণিকোঠায়। সবার ভালো হোক। সবাই আনন্দে থাকুক। সবার মুখেই ফুটুক হাসি। নিরাপদ হোক চারপাশ। উৎসবের দিনগুলি সকলের কাছে মঙ্গলময় হয়ে আসুক – এ-ই হোক আজ আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

© banglastreet.online 2021

ONE STOP SKILL
#GETSKILLSSOARHIGH

One Stop Skill

Now in Bangladesh

Earn and Learn about Social Media, Youtube,SEO & Digital Branding and Marketing.

OUR COURSES

- Digital Marketing Courses
- Faculty Development Programs

DIGITAL SERVICES

- Website Development
- Graphic Design
- Digital Marketing Campaigns
- Content Planning
- SEO
- Social Media Marketing

www.onestopskill.com
Kolkata, Pune & Dhaka

Phone No:
9674747600

Check Us Out:
www.facebook.com/onestopskill

সূচিপত্র

উৎসব ২০২১

বাংলাস্ট্রিট

বিশেষ রচনা

মা আমাদের ৯
কুন্তলা ভট্টাচার্য

উজ্জ্বল উদ্ধার

ধলঘাটের খণ্ডযুদ্ধ ১৩
গণেশ ঘোষ

দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে ১৫৭
অরুণদেব গুপ্ত

শতবর্ষে সত্যজিৎ

সত্যজিৎ ও নারী ১৬৩
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

শঙ্খ ঘোষের কবিতার উপাদান , ছন্দ ও বোধ ১৯
অনুরাধা মহাপাত্র

শেষে কৃত্রিম মেধার কাছে হার মানতে হবে ৪৭
অর্ধেন্দু সেন

উনিশ শতকে কলকাতার মেয়েরা ১০১
সুস্নাত দাশ

ভারতীয় মার্গ সংগীত ১৪৮
লিপিকা ভট্টাচার্য

কিছু বই , ছায়াছবি ১৭৯
দেবতোষ মিত্র

উপন্যাস

অপারেশন নন্দাদেবী ৬৭
বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

নভেলা

বাতাসপুর ৩৫
রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কনকম্বরম ৫৪
সুদেষ্ণা মজুমদার

অসম্পূর্ণ প্রেম কাহিনি ১৩৮
প্রণব দত্ত

Nightingale
CLINIC IVF LAB

Dhaleswar, Road No 13, Near UBI, Blue Lotus Club
Chowmuhani, Indranagar, Agartala - 799007
Email : nightingaleivf@gmail.com
Phone : +91 82599 10536

Ultra Modern Clinic
Reputed Foreign Doctor
Imported Machinery
Affordable Cost

Only IVF Clinic in Agartala Now Open

Reg. Off. **KROMOSOM DIAGNOSTICS LLP,**
CE - 17, Sec - 1, Salt Lake, Kolkata - 700064, Ph : 033 2321 3919 / 29

বড়ো গল্প

এতগুলি ভাত খাবি ২৬
কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

বটতলার বকেরা ১২১
নিবেদিতা ঘোষরায়

গল্প

নিজেকে লেখা চিঠি ৫১
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

কাটাকুটি ১১৬
কৌস্তুভ দাস

স্মৃতিদাগ ১৫০
শৃঙ্খন্তী চক্রবর্তী

নৃপেনবাবুর গ্যাঁড়াকল ১৫৩
সুস্মিতা কৌশিকী

অনুবাদ গল্প

একটি দিনের গ্রীষ্ম ৩২
রে ব্র্যাডবুরি/ময়ূরাক্ষী দাশ

কবিতা ১২৭

দেশভাগের কবিতা
মলয় রায়চৌধুরী

সব্যসাচী মজুমদারের কবিতা

পাঁচটি কবিতা
সুদীপ্ত সাহা

উদ্বোধক
প্রিয়ব্রত ঠাকুর

খানাপিনা

রান্নায় রাজস্থান ১৭১
স্নিগ্ধা দাশ
নীতিন দাশ

গ্যালারি

ইস্টবেঙ্গল , তুমি কার ১৬১
প্রসেনজিৎ মজুমদার

ফ্যাশান ১৮৭

ফটো ফিচার ১৯০

Best Wishes from

Lokenath Stores

Tollygunge Circular Road

NIIEM
National Institute of Innovation & Entrepreneurship Management

Make Yourself **Valuable** for the **New World**

Become the Most Coveted & Successful **Innoprenuer**

What we make of You ?

- **Individual** With a **Winning Mindset**
- Strategic **Entreprenuer**
- Industry Admired **Innovator**

More Information:

+91 9830-500-609

NIIEM Social

NIIEM Social

www.niiem.com

মা আমাদের

কুন্তলা ভট্টাচার্য

এক

বর্ষা, প্রকৃতির দমকল। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জল আবার বেশি বেশি ঢাললে নোয়ার নৌকো, 'প্রলয়পয়োধিজলে' মাছ চলে আসবে। কলিযুগে সত্যযুগ তো আসতে দেওয়া যায় না। প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অতএব, জল শুকিয়ে নেওয়ার জন্য ড্রায়ার শরৎ। প্রকৃতির ইউনিফর্মিটিও বজায় থাকল। শরতের মেঘমুক্ত আকাশে তখন তরলীভাব সূর্য। গলে গলে পড়ছে। মৌসুমী বায়ুর ফিরতি পথে ঢোকে শরৎ। অফিশিয়াল আগমন সেপ্টেম্বর মাসে। বাংলায় ভাদ্র। 'ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা'... পচা রোদে পুড়তে বেরিয়ে পড়ে তোষক-বালিশ, দিদার শাড়ি, ঠাকুমার কম্বল।

দুই

প্রভাতফেরির মতো বেরিয়ে আসে স্মৃতি। শাড়িদের

ঐতিহাসিক দলিল। লেপের ওয়ারের জমিজরিপ। একটাই মাত্র গয়নার বাক্স, তাতে প্রাণভোমরা একখান আইভরির সিঁদুরকৌটো। নামেই গয়নার বাক্স। মা গো মা, তাই নিয়ে কী আদিখ্যেতা! কৈ, আমার বেলায় তো একফোঁটা দরদ দেখি না। চুমকি দেওয়া সেই আমার ব্যাগটা হারিয়ে গেল। কী শোক, উঃ! শোকে সুখ নেই, অথচ দ্যাখো 'কী করে হারিয়ে গেল' কৈফিয়ত চায় এরা। হয় বকছে, নয়ত করছে খিল্লি। এদের স্বভাবই এরম। পরের বেলায় চিমটি কেটে দেওয়া। ঠিক আছে। শোকস্মৃতি আমারও জমবে। হে, স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা দেবী! আমায় স্মৃতি দাও মা! তথাস্তু বচনে দেবী আমার আশাপূর্ণা। ঢেলে দিয়েছেন স্মৃতি। যক্ষিনীর মতো আগলে রাখি। লুটতরাজ চলে তবু। ভাদ্র-আশ্বিন আদপে পকেটমার। বেখেয়াল হয়েছ কী জেব ফাঁকা। 'ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি'—আঙুলফাঁকে গলে যায় অঞ্জলি।

তিন

অঞ্জলি বলতে মনে পড়ল, আমাদের পাড়ার পুজো। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে মেয়েটাই যে বিমুগ্ধদৃষ্টি পাবে, মনে মনে জানি। মেয়েটিরও যদি কাউকে মনে ধরে তাহলেই হয়েছে আর কী! ছেলেদের জটলার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়, সেই সুন্দরী আমাদের মতো খেদিপেঁচিদের ধমক দেবে, আদেশ দেবে, ওর হাতে লাগবে... এসব আমাদের করতে হবে। রিহার্সাল ছাড়াই। অভিনয়ে বোঝাতে হবে, ঐ সুন্দরী কন্যার দাপট আছে। আমরা সাপোর্টিং রোল। 'জি মালকিন' আমাদের ডায়লগ।

চার

আমাদের মতো নড়েভোলা পাবলিকদের মেল্টিং মেরুদণ্ড। গরমে নরম। স্পর্ধা নেই। প্রতিবাদ নেই। আছে এক, দলছুট হয়ে যাওয়ার ভয়। জোরদার তাপ্পি লাগায়, পরিবেশ পরিস্থিতি, সেই ভয়ের গায়ে। আলাদা রকমের 'কেউ'-কে আমরা দলের বাইরে রাখি। ওটাই দস্তুর। যেমন আমাদের পিঙ্কি। পিঙ্কি খুব ডানপিটে। খেলায় সেরা। দাদাদের ক্রিকেট খেলার সময়, ছয় রানের তেড়ে আসা বল লুফে নেয়। তা, ক্লাস

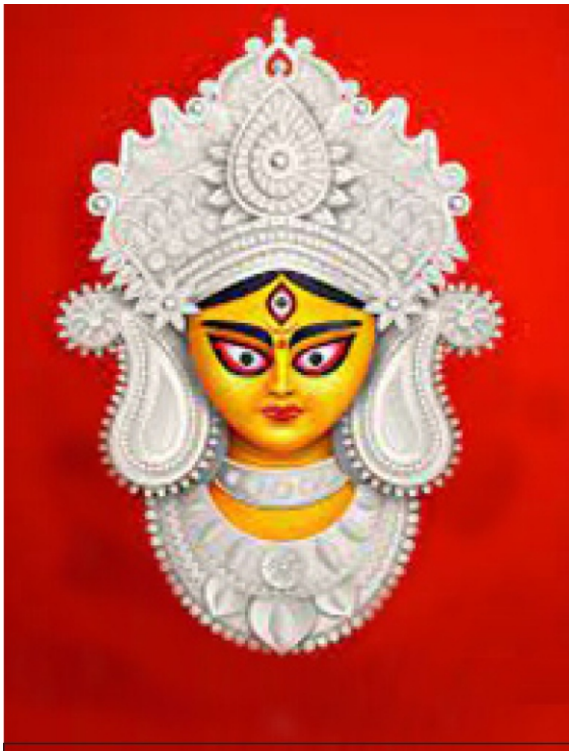

Best Wishes from

Devansh Agarwal

Alipore, Kolkata

ফোরের পুজো প্যান্ডেলে আমরা খেলছি। নকল বন্দুকযুদ্ধে শত্রুবধ। মুখ দিয়ে 'টিচক্যাঁও টিচক্যাঁও' আওয়াজ। খেলতে খেলতে কখন যেন বুম্বার চোখ ঘেঁষে ক্যাপ ফাটিয়েছে পিঙ্কি। গাঁকগাঁক মাইকে গান হচ্ছে। ভালো করে কিছু শোনা যাচ্ছে না। খানিক বাদে মাইক বন্ধ হয়ে গেল। বুম্বার মা-বাবা মণ্ডপে। খেলার মধ্যে মা-বাবা চলে এলে খুব বিরক্ত লাগে। অভিভাবক আর মাইক বন্ধ হয়ে গেছে বলে একটা জটলা পাকিয়ে উঠছে। কেস সুবিধের নয়। এইবার শুরু হল, পিঙ্কির খোঁজ। খোঁজের মধ্যে কোনটা সমঝোতার ডাকা, কোনটা চোখ রাঙানির—আমরা জেনে গেছি তদ্দিনে। বুঝলাম, পিঙ্কি দোষী। আজ যদি বুম্বার চোখে আগুন ঢুকে চোখ নষ্ট হয়ে যেত!!! প্রাকল্পিক সম্ভাব্য যুক্তি দিচ্ছে। পিঙ্কির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। বায়ুচাপ বলয় আমাদেরও ঘিরে রেখেছে। শেষ পাতে, বুম্বার মা বললেন, 'তোরা আলাদা খেল না! বন্দুক নিয়ে খেলা তো ছেলেরা খেলে। তোরা গল্প কর, গানের লড়াই খেল।' বিভেদীকরণের রাজনীতি শুরু সেই

থেকে। উপায় বাৎলে দিতে গিয়ে কাকিমা ইউনিভার্সাল স্টেটমেন্ট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কোনটা ছেলেদের খেলা, কোনটা মেয়েদের। কাকিমার মুখে সেদিন থেকে আমি একটাই চোখ দেখতে পাই। উদ্ভট একটা চোখ, এখুনি যেন খসে পড়বে। আর সেদিন আমার চোখ ফুটেছিল। অকালবোধন। অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে চোখ খুলে দিয়েছিল, একচোখা কাকিমা। পোড়ারমুখী কপাল। রামচন্দ্রের মতো যজমান জোটেনি।

পাঁচ

শরতের দুর্গাপুজো রামচন্দ্রের থেকে। রাবণবধের সংকল্প নিয়ে শত্রুনাশিনী দেবীকে তিনি জাগিয়েছেন। হায় রাম! মর্যাদাপুরুষোত্তম হয়েও আপনি একজন মহিলার শরণাপন্ন হয়েছেন। ইগোতে লাগেনি আপনার? এদিকে কলিযুগে ছোটো ছেলে একটা মেয়ের হাতে মার খেয়েছে বলে ছেলের মা খেলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন লিঙ্গবৈষম্য। আপনি ঠিক কি ভুল জানি না, তবু অন্তত এইটুকু স্বীকৃতি দিতে পেরেছিলেন যে, অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধবিদ্যায় একজন মহিলা আপনার থেকে বেশি কেপেবল্। শরণাপন্ন হতে আপনার ইগো চুরচুর হয়নি।

ছয়

শুনেছি, দেবদেবীরা উত্তরায়ণে জাগেন, ঘুমোতে যান দক্ষিণায়ণে। শ্রাবণ থেকে পৌষ পর্যন্ত চলে দক্ষিণায়ণ। দক্ষিণায়ণে শরৎ। রামচন্দ্র রাবণবধের সংকল্প করে, প্রয়োজনে দেবীকে ঘুম থেকে তুলেছিলেন। মহাজ্ঞানী মহাজনেদের দেখানো রাস্তায় চললে, আমাদের মরণশীল মানুষের গন্তব্য সোজা। তাছাড়া চোখের সামনে আর কোনো পাথব্রেকারকে পাচ্ছি না বলে রাজারামকেই পাকড়েছি। রাম রাম বলতে এখন ভয় করে। আসলে যে 'মরা মরা' থেকে 'রাম রাম' হচ্ছে, সেটাই

যেন বরকরার থাকে বাপু। নিত্যদিন মরছি। মরণোত্তর নিজেকে নিয়ে আবার নতুনভাবে শুরু করতে হয়। মাস-মাইনের চাকরির নিরাপত্তা বাহিনী অর্থনীতি সামলাতে পারে, আত্মনীতির গুহাদরজায় সেটা ভুল মন্ত্র। চিচিং ফাঁক বলে নিজের রুমে ঢুকতে হলে নিমেষে আগের আমি-কে খতম করতে হয়। অজস্র অপমান, বিদ্রুপ, অনাবশ্যক অভিজ্ঞতা থাকে—এগুলো শত্রু। রাবণরাজার মতো তাগড়াই শত্রু আমাদের নেই। এসব ছুটকো-ছাটকা আপদ বিদায় করতে তবু হতক্লান্ত হয়ে যাই। বারবার অকালবোধন দরকার হয় আমাদের। কাঁহাতক আর ডেকে ডেকে তোলা যায়! দেবী হন কী মা হন, বিশ্রাম তো লাগবেই, নাকি!!! তুমি বিশ্রাম নাও। গো মা। 'শীতলপাটি বিছিয়ে দেব, তালপাখার বাতাস'। একটু জিরোও মা!

জন্মান্তরের স্মৃতি থেকে তোমায় যুদ্ধ করতে দেখছি। একা আর কত যুদ্ধ করবে তুমি? অসুররা এখন ঘাপটি মেরে থাকে। এখনকার যুদ্ধকৌশলে তুমি সেকেলে। তুমি বরং রেস্ট নিতে যাও, যাওয়ার আগে আমাদের বোধন করাও। এই যে, তিল হরতকি ফুল আতপ চাল গুঁজে দিলাম তোমার বাঁহাতে। আত্মবোধ জাগিয়ে দাও মা গো! সর্বৌষধিজলে ধুয়ে দাও প্রজন্মবাহিত অপমানলাঞ্ছনা। মা! আমাদের চক্ষুদান করো! প্রাণপ্রতিষ্ঠা করো! করন্যাস, অঙ্গন্যাসে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমাদের গ্যালভানাইজড্ করে দাও। মায়ে-মেয়েতে নাহলে মিশ খাবে কী করে, বলো? তোমার দ্যুতিময় রাগ, অস্ত্র করে তুলে দাও আমাদের দ্বিভুজে। তুমি আরামসে পায়ের ওপর পা তুলে, এক খিলি পান মুখে পুরে দেখবে, তোমার দ্বিভুজাকন্যারা দুই চার ছয় আট করতে করতে নিযুত কোটি হাত-হাতিয়ার হয়ে গেছে।

ঐ দিন এল ব'লে। 'THE FUTURE IS FEMALE'.

উজ্জ্বল উদ্ধার

ধলঘাটের খণ্ডযুদ্ধ এবং নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের আত্মাহুতি

গণেশ ঘোষ

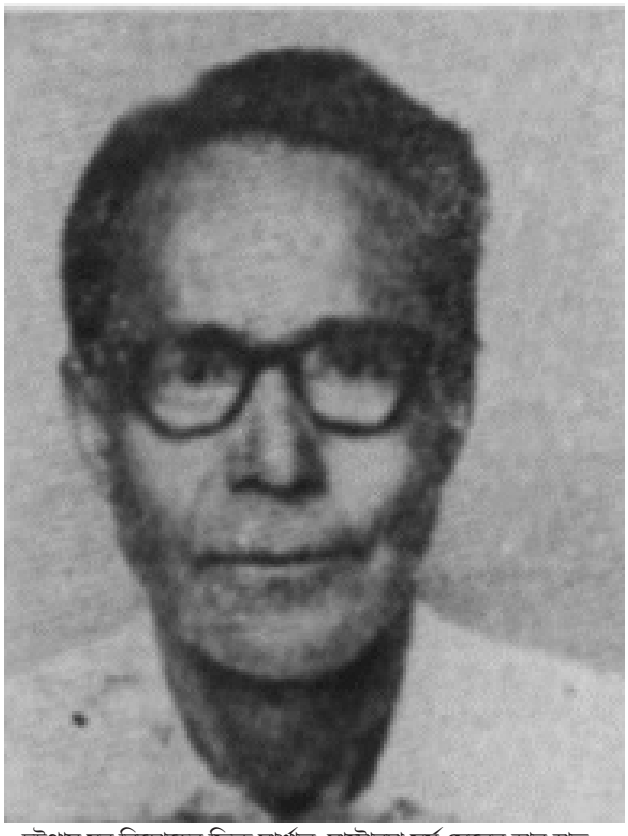

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের ফিল্ড মার্শাল, মাস্টারদা সূর্য সেনের ডান হাত, স্বাধীনতা সংগ্রামী গণেশ ঘোষের জন্ম ওপার বাংলায়, যশোরের বিনোদপুর গ্রামে, ১৯০০ সালে। ১৯৩২ সালে তাঁকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। '৪৬ সালে মুক্তির পর তিনি ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। পার্টি বিভাজনের পর তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) তে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য গণেশ ঘোষ ১৯৬৭ সালে লোকসভার সদস্যও হন। তাঁর বর্তমান রচনাটি ১৭৭৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় অরুণদেব গুপ্ত সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'আর্জব' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায়। স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে এই লেখাটি উদ্ধার করে পুনর্মুদ্রিত করতে পেরে 'বাংলাস্ট্রিট' গর্বিত। রচনাটি উদ্ধার করে দিয়েছেন তরুণ নায়েক এবং অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হল শিবাদিত্য দাশগুপ্তের সৌজন্যে।

সম্পাদক বাংলা স্ট্রিট

তখন ১৯৩২ সাল।

স্থান চট্টগ্রাম জেলা।

তার দুইবছর আগে চট্টগ্রামের দেশপ্রেমিক তরুণেরা সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুক্ত স্বাধীন চট্টগ্রামে একটি স্বাধীন বিপ্লবী সাময়িক সরকার ঘোষণা করেছিল।

তারপর চারদিন পরে সাম্রাজ্যবাদ আবার সমগ্র চট্টগ্রাম জেলা পুনর্দখল করে নেয় এবং জেলায় যত অধিবাসী ছিল প্রায় সেই সংখ্যায় ফৌজ ও সশস্ত্র পুলিশ এনে সমগ্র জেলাটিকে একটি বিকারগ্রস্ত উন্মাদ সাম্রাজ্যবাদ কবলিত প্রতিহিংসাপরায়ণ উন্মত্ত দানবের পৈশাচিক লীলাভূমিতে পরিণত করেছিল।

বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের এই উন্মত্ততা একটি কারণ নিঃসন্দেহে এই ছিল যে ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে সশস্ত্র বিদ্রোহ

ঘোষণার পর বিপ্লবী মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের প্রায় সকল নেতা ও বিশিষ্ট কর্মীগণ চট্টগ্রাম শহরের অদূরবর্ত্তী বিশিষ্ট কয়েকটি গ্রামের মধ্যেই আত্মগোপন করেছিলেন ও কিছু সময় পর পর সেই সব গ্রাম থেকে গোপনে শহরের কেন্দ্রে এসে অথবা জেলার বাইরে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিশিষ্ট বিশিষ্ট কোন ঘাঁটি আক্রমণ করে অথবা অমানুষিক ও সর্বজনীনভাবে ধিকৃত কোন কোন সরকারি কর্মচারীকে আক্রমণ করে আবার গোপনে ঐ সব আশ্রয়স্থানে ফিরে যেতেন। জনসাধারণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল বলেই বিদ্রোহী নেতৃবর্গ ও কর্মীগণের পক্ষে ওই সামান্য কয়েকটি গ্রামের মধ্যেই নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩২ সাল এই দুই বছর নিরন্তর ও নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করেও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পক্ষে ওই সামান্য কয়েকটি গ্রামের মধ্যে আত্মগোপনকারী কোনো বিদ্রোহী নেতা অথবা বিশিষ্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। সন্দেহজনক এক একটি গ্রাম কখনো কখনো নিশ্ছিদ্রভাবে অবরুদ্ধ করে রেখে গ্রামের প্রত্যেকটি হিন্দুবাড়ি অতি সতর্কতার সাথে তল্লাশি করেও সেই সময় পর্যন্ত সরকার কিছুমাত্রও সফলতা পায়নি।

শাসকবর্গের ক্রোধের এইটিই ছিল একটি প্রধান কারণ। তখন ১৯৩২ সালের জুন মাস। ঘটনার কেন্দ্র ধলঘাট গ্রাম।

ধলঘাট চট্টগ্রাম জেলার একটি মধ্যবিত্তপ্রধান বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এই গ্রামে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। গ্রামের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই ছিল উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, স্কুল অথবা কলেজের শিক্ষক, কিম্বা রেল আফিসের অথবা সরকারি কর্মচারী। এই গ্রামে বহু সংখ্যক বিদ্রোহী যুবক আত্মগোপন করে আছেন পুলিশের কাছেও এই কথা অজানা ছিল না। কিন্তু এই গ্রামের বহু বাড়ি তল্লাশি করে এবং কয়েকবার সমগ্র গ্রাম ঘেরাও করে তন্ন তন্ন করে প্রত্যেকটি হিন্দুবাড়ি তল্লাশি করেও পুলিশ সে পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে এই গ্রামে যে সকল বিদ্রোহী তরুণেরা আত্মগোপন করে থাকতেন তাঁরা সতত খুব সতর্ক হয়ে থাকতেন এবং প্রতি মুহূর্তেই বিপদের আশঙ্কায় প্রস্তুত হয়ে থাকতেন।

এই গ্রামেরই একটি অতি গরিব বাড়ি।

বাড়িটি দোতলা। বাড়ির চাল শনের এবং চারপাশের দেওয়াল মাটির। দোতলায় উঠবার সিঁড়ি আছে বাইরে। কিন্তু ভিতরে নীচের তলা থেকে মই দিয়ে উপরে উঠবার ব্যবস্থাও আছে। গৃহকর্ত্রীর নাম সাবিত্রী চক্রবর্ত্তী। অত্যন্ত দরিদ্র এবং তিনি ছিলেন একজন বৃদ্ধা বিধবা মহিলা। ১৫/১৬ বছরের একটি ছেলে এবং তার চাইতে সামান্য কিছু বড়ো একটি বিবাহিতা কন্যা নিয়ে সাবিত্রী দেবী এই বাড়িতে বাস করেন। সাবিত্রী দেবী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং স্নেহশীলা। দীর্ঘকাল থেকেই তিনি বিপ্লবীদলের সকলের মাসিমা। লেখাপড়া বিশেষ না জানলেও মাসিমা নিজস্ব সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিয়েছিলেন যে দেশের

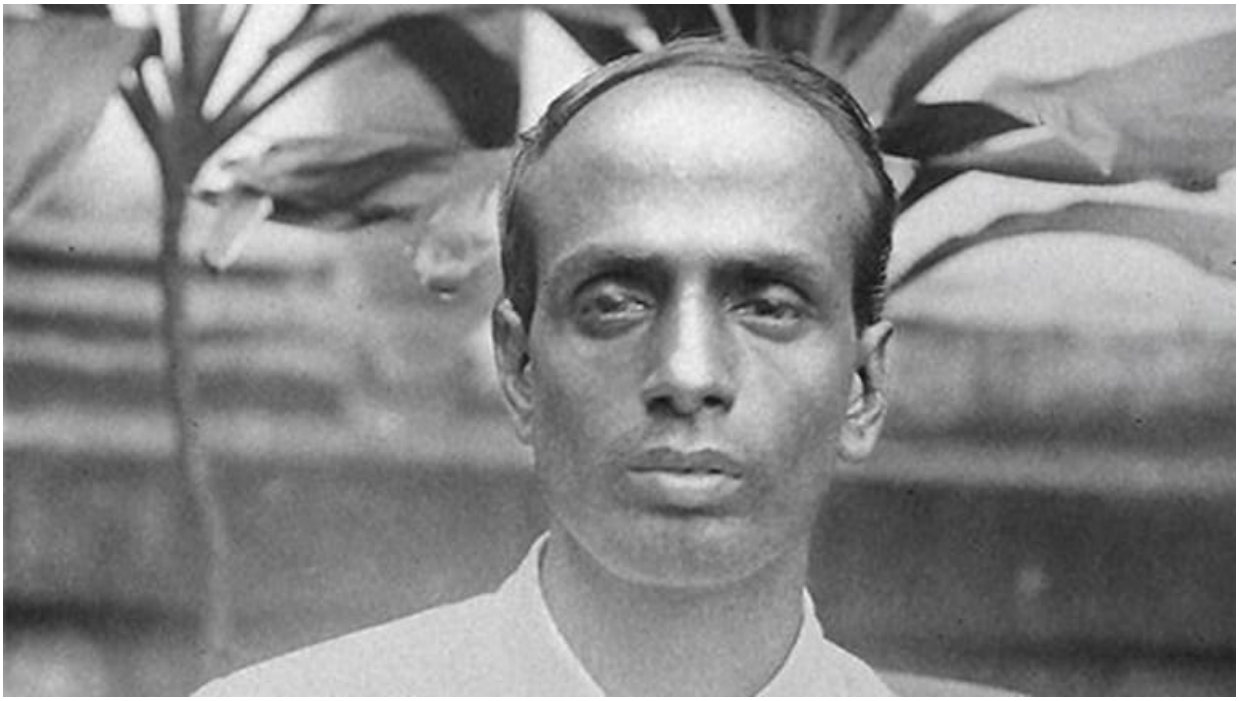

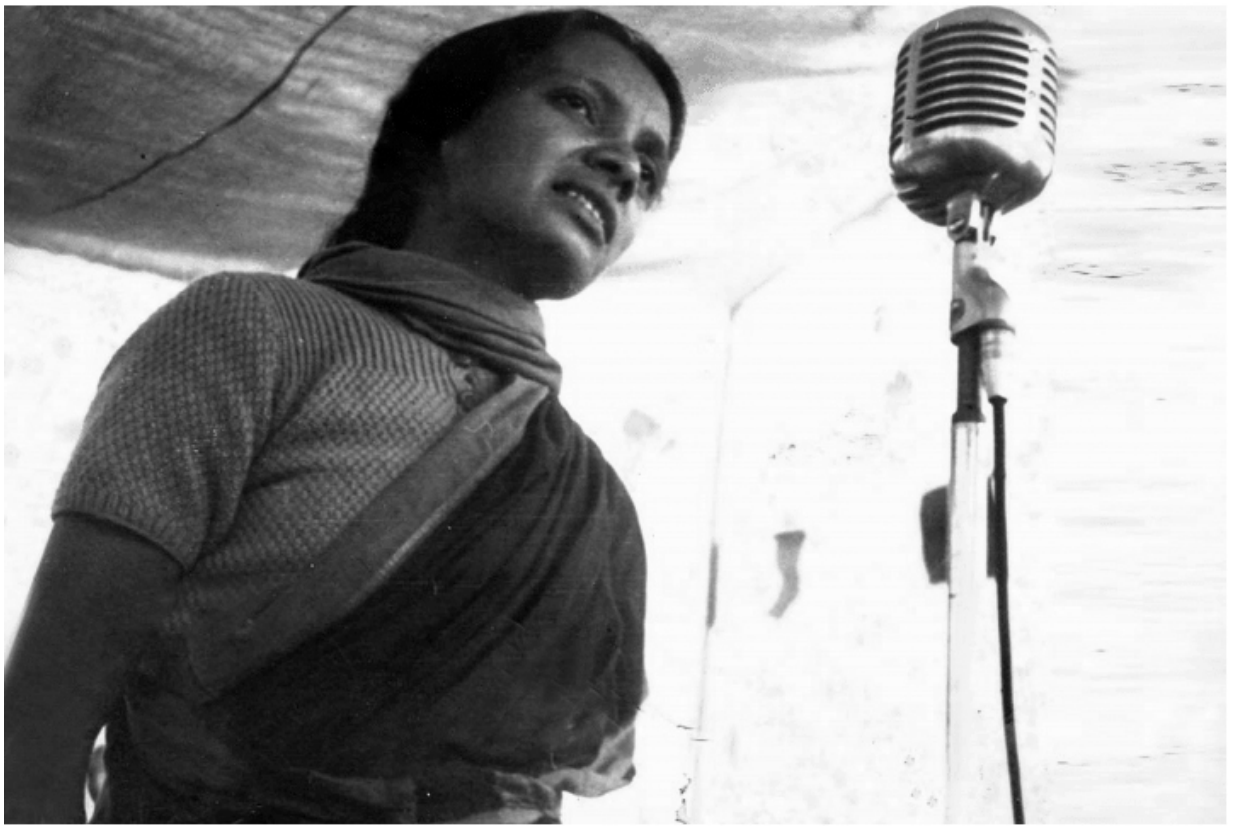

স্বাধীনতার জন্য যারা সংগ্রাম করে, যারা সরকারের সাথে লড়াই করে তারা সকলেই তাঁর খুব আপনজন এবং বাস্তবেও তিনি সর্বতোভাবে তাদের সকলকে সতত সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন।

তাঁর নিজস্ব এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাবিত্রী দেবী জালালাবাদ যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই বহু আত্মগোপনকারী বিপ্লবী যুবককে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন এবং বিপদে রক্ষা করেছেন। অত্যন্ত দরিদ্র ও বৃদ্ধা বলে তাঁর বাড়ি সম্পর্কে সেই সময় পর্যন্ত পুলিশের বিশেষ কোনো সন্দেহ জাগেনি।

ধলঘাট গ্রামের এই বাড়িটি নিরাপদ মনে করে মাস্টারদা ও নির্মলদা দুইদিন আগে এই বাড়িতে এসে উঠেছেন। সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য ও খবরাখবরের জন্য অত্যন্ত বিশ্বস্ত তরুণ বিপ্লবী অপূর্ব সেন আছে। এর অপর নাম ভোলা সেন। মাস্টারদা ও নির্মলদা এই বাড়িতে এসে অনেকগুলি পড়ে থাকা কাজ শেষ করেছেন; শহরের এবং গ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে শেষ সংবাদ সংগ্রহ করেছেন, কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কয়েকটি দায়িত্বশীল কর্মীর কাছ থেকে পাওয়া প্রস্তাব ও পরিকল্পনা সম্পর্কে নিজেদের মনোভাব স্থির করেছেন। একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বেশ কিছুদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া স্থগিত ছিল; এইবার সেই সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মাস্টারদা ও নির্মলদা উভয়েই মন স্থির করে ফেলেছিলেন।

বিষয়টি এই। বেশ কিছুকাল আগে থেকে জেলার সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজ ফিরিঙ্গি কর্মচারীরা চট্টগ্রাম শহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত পাহাড়তলির ইওরোপীয়ান ক্লাবটিকে চট্টগ্রামের জনসাধারণের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন করবার জন্য ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করবার একটি কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। কোন গ্রামের জনসাধারণের উপর কী শাস্তি দিতে হবে, কোন কোন স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের লাঠি পিটিয়ে রাজভক্তি শেখাতে হবে, কোন কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়ি পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে ফেলা হবে অথবা আত্মগোপনকারী অপরাধীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে কার কার বাড়ি ভেঙে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে—ইত্যাদি বিষয়ে সন্ধ্যার পর এই ক্লাবে বসেই পরামর্শ করে স্থির করা হত। চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত বড়ো ইওরোপীয়ান ক্লাবটিকে আর তারা নিরাপদ মনে করত না; তারা আশঙ্কা করত কোনোদিন সন্ধ্যা রাত্রিতেই ওই ক্লাবের উপর একটি প্রচণ্ড আক্রমণ হয়ে যেতে পারে। তাই শহরের ইংরেজ ও ফিরিঙ্গি কর্মচারীগণের বর্তমান সময়ের সমাবেশের কেন্দ্র হয়ে পড়েছিল পাহাড়তলির ইওরোপীয়ান ক্লাব। কয়েকমাস আগে থেকে বিপ্লবীদলের কয়েকজন দায়িত্বশীল কর্মীর কাছ থেকে এবং বিপ্লবীদলের প্রভাবান্বিত অথবা বিপ্লবীদলের সঙ্গে পরোক্ষে যুক্ত ওই পাহাড়তলির ক্লাবের কয়েকজন ভারতীয় কর্মচারীর কাছ

থেকে মাস্টারদার কাছে অনুরোধ এসেছিল অবিলম্বে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে ক্লাবটিকে ধ্বংস করে ফেলবার জন্য।

মাস্টারদা স্থির করেছিলেন এইবারই ওই স্থগিত বিষয়টি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করা হবে এবং সেই জন্যই তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্বদিন, অর্থাৎ ১২ জুন তারিখে, শহরের নন্দনকানন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা প্রীতিলতা ওয়ারদাদারকে বিশেষ সংবাদ দিয়ে ধলঘাট গ্রামের এই বাড়িতে ডাকিয়ে এনেছেন। প্রীতিলতার সঙ্গে মাস্টারদা ও নির্মলদা দীর্ঘসময় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যথাসম্ভব সত্ত্বর কোনোদিন সন্ধ্যাকালে প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবী কর্মীদের একটি ছোটো দল নিয়ে পাহাড়তলির ওই ইওরোপীয়ান ক্লাবটিকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলবার চেষ্টা করবেন। আরো স্থির হয়েছিল পরদিনই অর্থাৎ ১৪ জুন তারিখে সকাল বেলাতেই প্রীতিলতা শহরে ফিরে যাবে এবং সেই দিনই সন্ধ্যার পর মাস্টারদা ও নির্মলদা ধলঘাট ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবেন।

সেদিন ১৩ জুন, ১৯৩২ সাল; আজ থেকে ঠিক ৪৭ বছর আগেকার একটি বিশিষ্ট দিন। সেদিন রাত অনুমান ১০টার সময় নীচে থেকে মাসিমার আহ্বান পেয়ে মাস্টারদা ও প্রীতিলতা রাত্রির আহারের জন্য নীচে নেমে গেলেন। অপূর্বর জ্বর হয়েছিল তাই অপূর্ব উপরেই শুয়েছিল এবং নির্মলদার ক্ষুধা ছিল না বলে তিনিও নীচে যাননি। নীচের রান্নাঘরে সকলে কেবলমাত্র খেতে বসেছেন এমন সময় বাইরের ঘরের দরজায় জোর করাঘাতের আওয়াজ শোনা গেল। মাসিমার কন্যা নির্মলাবালা দ্রুত পদে কিন্তু অতি সন্তর্পণে উঠে গিয়ে বাইরের ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল বহু সংখ্যক ফৌজী সিপাই ও সশস্ত্র পুলিশ সমগ্র বাড়িটি ঘিরে ফেলেছে এবং কয়েকটি পুলিশ দরজা খুলে দেবার জন্য করাঘাত করছে ও চিৎকার করছে। নির্মলা ফিরে এসে চুপে চুপে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মাস্টারদা তৎক্ষণাৎ মই পেয়ে উপরে উঠে গেলেন এবং প্রীতিলতাকে আস্তে আস্তে বলে গেলেন জিজ্ঞাসা করলে প্রীতিলতা যেন নিজেকে মাসিমার কোনো আত্মীয়া বলে পরিচয় দেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপর থেকে শোনা গেল বাইরের কাঠের সিঁড়িতে ভারী বুটের আওয়াজ; বোঝা গেল কে একজন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে।

নির্মলদা চকিতে রিভলবার তুলে নিলেন এবং সিঁড়ির মুখের দরজার খিল নিঃশব্দে খুলে দিয়ে শ্বাস বন্ধ করে দরজার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নির্মলদার হাতে ছিল একটি ৪৫৫ 'বোরের' বড়ো ফৌজি রিভলভার। ভোলাও নিজের রিভলবার হাতে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে নির্মলদার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। মাস্টারদা নিজের রিভলবার হাতে নিয়ে ঘরের এককোণে গিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। মুহূর্তপরেই ৬ ফুটেরও বেশি লম্বা বিরাটকায় একজন ইংরেজ ফৌজি অফিসার

ডানহাতে রিভলভার নিয়ে সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে উঠে এসে দাঁড়াল এবং বাঁ হাত দিয়ে দরজায় একটি থাবা দিয়ে খুলে দেবার জন্য আওয়াজ করল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই নির্মলদাও নিমেষে দরজা খুলে একেবারে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। আক্রমণকারী ইংরাজ অফিসারটি আর তার রিভলবার তুলবারও সুযোগ পেল না। নির্মলদার গুলি তার হৃদপিণ্ড ভেদ করে চলে গিয়েছে। সেই ফৌজি অফিসারের বিরাট দেহটি একবার আপাদমস্তক কেঁপে উঠল; তারপর একবার সামনে খানিকটা একবার পিছনে একটু দুলে সিঁড়ির উপর পড়ে গেল এবং সেই সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচে মাটিতে গিয়ে পড়ল।

বাইরে তখন গাঢ় অন্ধকার। কাছের জিনিসও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। ফৌজি অফিসারের দেহ গড়িয়ে পড়বার সময় কিছুটা দূর থেকে অন্যান্য ফৌজ ও পুলিশের লোকেরা দেখতে পেয়েছিল কিনা বোঝা গেল না; কিন্তু অকস্মাৎ গুলির আওয়াজ শুনে বাড়ির চারিদিক থেকেই সশস্ত্র পুলিশ ও ফৌজের সিপাহীরা বাড়ির দোতলা লক্ষ্য করে প্রচণ্ডভাবে গুলি বর্ষণ আরম্ভ করল। পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠল। দোতলায় আর বেশিক্ষণ থাকা আদৌ নিরাপদ নয় বিবেচনা করে নির্মলদা মাস্টারকে

বললেন তিনি যেন ভোলাকে নিয়ে অবিলম্বে বাড়ির বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন, অন্যথা বিলম্ব করলে বাঁচবার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। এই কথা বলতে বলতেই দরজার ধারে দাঁড়ানো নির্মলদার গায়ে এসে একটি গুলি লাগল। আঘাত মারাত্মক ছিল না। কিন্তু এর প্রত্যুত্তরে নির্মলদা, ভোলা এবং মাস্টারদা তিনজনেই প্রচণ্ডভাবে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলেন। নির্মলদা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তেই যথাসম্ভব দৃঢ়তার সঙ্গে পুনরায় মাস্টারদাকে অবিলম্বে চলে যাবার জন্য বললেন। নির্মলদা আরো বললেন তাঁরা দুজনে যেন বাড়ির পিছন দিকের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং তিনি নিজে নিরন্তর গুলি ছুঁড়ে বাড়ির সম্মুখদিকে ফৌজ ও পুলিশকে ব্যস্ত করে রাখবার চেষ্টা করবেন। নির্মলদার কথার ধরনে মাস্টারদা বুঝলেন নির্মলদার নির্দেশ উপেক্ষা করে আর বেশিক্ষণ সেখানে থাকা সমীচীন হবে না।

অথচ ঐখানে ঐ অবস্থায়, সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নির্মলদাকে রেখে চলে যাওয়াও মাস্টারদার পক্ষে অসম্ভব। নির্মলদা মাস্টারদার শুধু একজন সহকর্মীই ছিলেন না; তিনি ছিলেন মাস্টারদার একজন সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। প্রতি মুহূর্তের সহচর। এবং নির্ভরযোগ্য সাথী। সেই নির্মল সেন নেই; কাছে দূরে কোথাও নেই, নির্মল সেনকে সুনিশ্চিত এবং নিষ্ঠুরতম মৃত্যুর মুখে চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলতে হবে। এ কথা অস্পষ্ট অথবা গৌণ ভাবেও কখনো মাস্টারদার চিন্তার মধ্যে স্থান পায়নি। আজ সেই কঠিন বাস্তব এবং কল্পনাতীত পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাস্টারদা যেন মুহূর্তের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। কিন্তু নিমেষ পরেই তিনি নিজেকে ফিরে পেলেন এবং নিজের আশু কর্তব্য স্থির করে ফেললেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজার কাছে দাঁড়ানো নির্মলদার বুকে আর একটি গুলি এসে লাগল। নির্মলদা বুঝলেন আঘাতটি গুরুতর এবং সম্ভবত মারাত্মক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনো তাঁর চিন্তাশক্তি বিন্দুমাত্রও ব্যাহত অথবা বিশৃঙ্খল হয়নি। তাই তিনি সেই মুহূর্তেই প্রায় আদেশের সুরে মাস্টারদাকে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে বললেন। মাস্টারদাও সেই মুহূর্তে নির্মলদার কাছ থেকে তড়িৎ বিদায় নিয়ে অপূর্বর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে গেলেন এবং অস্থির, উৎকণ্ঠিত, অশ্রুসিক্ত প্রীতিলতাকে সঙ্গে নিয়ে নিঃশব্দে পিছনের দরজা খুলে বাইরের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

গুরুতর ভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও নির্মলদার আরো কিছুক্ষণ পরিপূর্ণ জ্ঞান ও শারীরিক সামর্থ অক্ষুণ্ণ ছিল এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও চিন্তাধারা বিন্দুমাত্রও আচ্ছন্ন বা বিক্ষিপ্ত হয়নি। অবশ্যই নির্মলদার অস্বাভাবিক মনের জোর এবং অমানুষিক মানসিক দৃঢ়তা ছিল বলেই গুরুতরভাবে আহত হয়েও মানুষের পক্ষে যতখানি সম্ভব ততখানি দ্রুততার সঙ্গেই তিনি বাড়ির সম্মুখ দিক এবং তার আশে পাশে গুলি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। নির্মলদার ওই কৌশল সফল হল; ফৌজ ও পুলিশ পরিপূর্ণ ভাবে বিভ্রান্ত হল। তারা ভাবল ওই বাড়িতে অবরুদ্ধ বিদ্রোহীরা গুলির জোরে সম্মুখ দিকের পুলিশ ও ফৌজি বেষ্টনী ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাই ফৌজি অফিসার সময় থাকতেই বুদ্ধি করে ওই বাড়ির পেছন এবং অন্যান্য দিক থেকে সিপাহীদের সরিয়ে এনে বাড়ির সম্মুখ ভাগকেই যথাসাধ্য শক্তিশালী করে ফেলল, যেন ওই পথ দিয়ে অবরুদ্ধ বিদ্রোহীদের একজনও বেরিয়ে যেতে না পারে।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তখনো মাস্টারদা প্রীতিলতা এবং ভোলাকে নিয়ে বাড়ির সীমানার বাইরে চলে যেতে পারেননি। তিনি সেই গভীর অন্ধকারে বাড়ির পিছন দিকের সীমানার গাছপালা ঘেঁষে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিতি যাচাই করে দেখছিলেন। সেখান থেকে ৮/১০ হাত দূরে বাড়ির উঠোনের শেষ প্রান্তে ঘন জঙ্গলে পূর্ণ বাগান আরম্ভ হয়েছে। নিঃশব্দে অপূর্ব একটুখানি এগিয়ে গিয়ে উঠোনের সেই প্রান্তে অবস্থিত সুপারিপাতার ঘেরা বেড়া একটুখানি সরিয়ে সেইখান দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সামান্য একটুখানি পথ করে নিচ্ছিল। হয়তো সেই সময়ে শুষ্ক পাতার ক্ষীণ একটুখানি আওয়াজ গভীর অন্ধকারে নিকটে দণ্ডায়মান ফৌজি সিপাহির কানে গিয়েছিল; আর ঠিক সময়েই আন্দাজে নিক্ষেপ করা তারই একটি গুলি এসে আকস্মাৎ অপূর্বর বুক ভেদ করে চলে গেল। অপূর্বর মুখ দিয়ে সামান্য একটুখানি শব্দও বের হল না; অপূর্ব্ব পড়ে গেল এবং মুহূর্তে তার প্রাণবায়ু তার দেহ থেকে নির্গত হয়ে গেল। সামান্য কয়েক হাত দূরে, অপূর্বর ওই অবস্থা দেখে প্রীতিলতা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নিমেষের জন্য অপূর্বর দিকে তাকিয়ে মাস্টারদা শক্ত করে প্রীতিলতার হাত ধরে নিঃশব্দে দ্রুতপায়ে সম্মুখের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন নিস্তব্ধ গভীর জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। উপরে দোতলা অনেকক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে আর গুলি বর্ষণের কোনো আওয়াজই আসছিল না। তা সত্ত্বেও প্রায় সারারাত ধরেই ফৌজ ও পুলিশ সতর্ক প্রহরায় বাড়িটিকে ঘিরে রেখেছে এবং মাঝে মাঝেই গুলি ছুঁড়ে নিজেদের সতর্কতার প্রমাণ দিয়েছে এবং প্রতিপক্ষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

পরদিন সকালবেলা শহর থেকে ইংরেজ জেলাশাসকের সঙ্গে আরো বহুসংখ্যক ফৌজি সেপাই সেখানে আসে। তারপর কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবার পর অফিসারদের

নির্দেশে কিছুসংখ্যক ফৌজি সিপাই অতি ধীরে ধীরে এবং অতিমাত্রায় সতর্কতার সঙ্গে বাড়িটির দিকে এগিয়ে যায় এবং সিঁড়ির ধারে মাটির উপর ফৌজি অফিসার ক্যামারুণের মৃতদেহ দেখতে পায়।

তারপর তারা আরো সন্তর্পনে এবং আরো সতর্কতার সঙ্গে উপরে উঠে যায় এবং ঘরের ভি তরে দরজার সামনেই নির্মলদার শায়িত দেহ দেখতে পায়। দেহে প্রাণের চিহ্ন নেই। আছে রাইফেলের গুলির বহু আঘাতের চিহ্ন। পিছনদিকের উঠানের শেষপ্রান্তে অপূর্ব সেনের মৃতদেহও পাওয়া গেল। অপূর্ব শুয়ে আছে। অর্ধ উন্মীলিত চক্ষু আকাশের পানে তাকিয়ে। তখনো ডান হাতের দৃঢ় মুষ্ঠিতে রিভলবার ধরা রয়েছে। বাড়ির পেছন দিকে অপূর্ব সেনের মৃতদেহ পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের মনে সন্দেহ হল হয়তো আর যাঁরা পূর্ব রাত্রিতে ওই বাড়িতে ছিলেন তাঁরা রাত্রির অন্ধকারে ওই পথেই বাড়ির বাইরে অন্যত্র চলে গিয়েছেন।

অবশ্যই কাপুরুষ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা এবং দেশদ্রোহী ভারতীয় পুলিশ ও ফৌজি সিপাহীরা এই ঘটনার জন্য এবং নির্মলদার ওই অবিস্মরণীয় বীরত্বের জন্য পরিপূর্ণ এবং তারো কিছু বেশি মাত্রায় প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। বৃদ্ধা সাবিত্রী দেবীকে ও তাঁর পুত্র রামকৃষ্ণকে পুলিশ ও ফৌজের হাতে নিষ্ঠুর ও অবর্ণনীয় দৈহিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। তারপর সাবিত্রী দেবী ও রামকৃষ্ণকে দীর্ঘ কারাদণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী প্রতিহিংসার অবসান এইখানেই হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রিত কারাগারে নিষ্ঠুর, অমানুষিক নির্যাতনে ১৫ বছরের বালক রামকৃষ্ণকে প্রাণ হারাতে হয়। কিন্তু একই কারাগারে আবদ্ধ বন্দিনী মা সাবিত্রী দেবীকে মুমূর্ষু সন্তান রামকৃষ্ণকে একবার শেষ দেখা দেখবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এবং ১৩ জুনের পরদিনই পূর্বাহ্নে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে যে দুই একখানা ছিন্ন বস্ত্র, দুই একখানা ছেঁড়া কাঁথা, দুই একখানা ভাঙা থালা, বাটি প্রভৃতি যৎকিঞ্চিত যা কিছু ছিল সবই পুলিশ ও ফৌজের সিপাহিরা লুঠ করে নিয়ে যায়।

তারপরই জেলার ইংরেজ শাসক এবং ইংরেজ পুলিশ অধিকর্তার তত্ত্বাবধানে সাবিত্রী দেবীর ওই বাড়িটি ভেঙে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়।

এরই পূর্বদিন রাত্রে নিঃশব্দে ফৌজি বেষ্টনী পার হয়ে মাস্টারদা ও প্রীতিলতা গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বহু খানা, ডোবা, জলা-জঙ্গল, মাঠ-প্রান্তর, বাগান, নালা পার হয়ে ভোর হবার কিছু পূর্বেই ৪ মাইল দূরে অবস্থিত জৈষ্ঠপুরা গ্রামের আর একটি নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে ওঠেন।

আর—

আর বিপ্লবী দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করে ধলঘাট গ্রামে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে চিরদিনের জন্য রয়ে গেলেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী নির্মল সেন ও বিদ্রোহীবীর তরুণ অপূর্ব সেন।

ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞ জনসাধারণ আজ তাঁদের উভয়ের স্মরণেই গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

নির্মল সেন, অপূর্ব সেন অমর হোক!

জাতির স্মরণে তাদের স্মৃতি অক্ষয় হোক!!

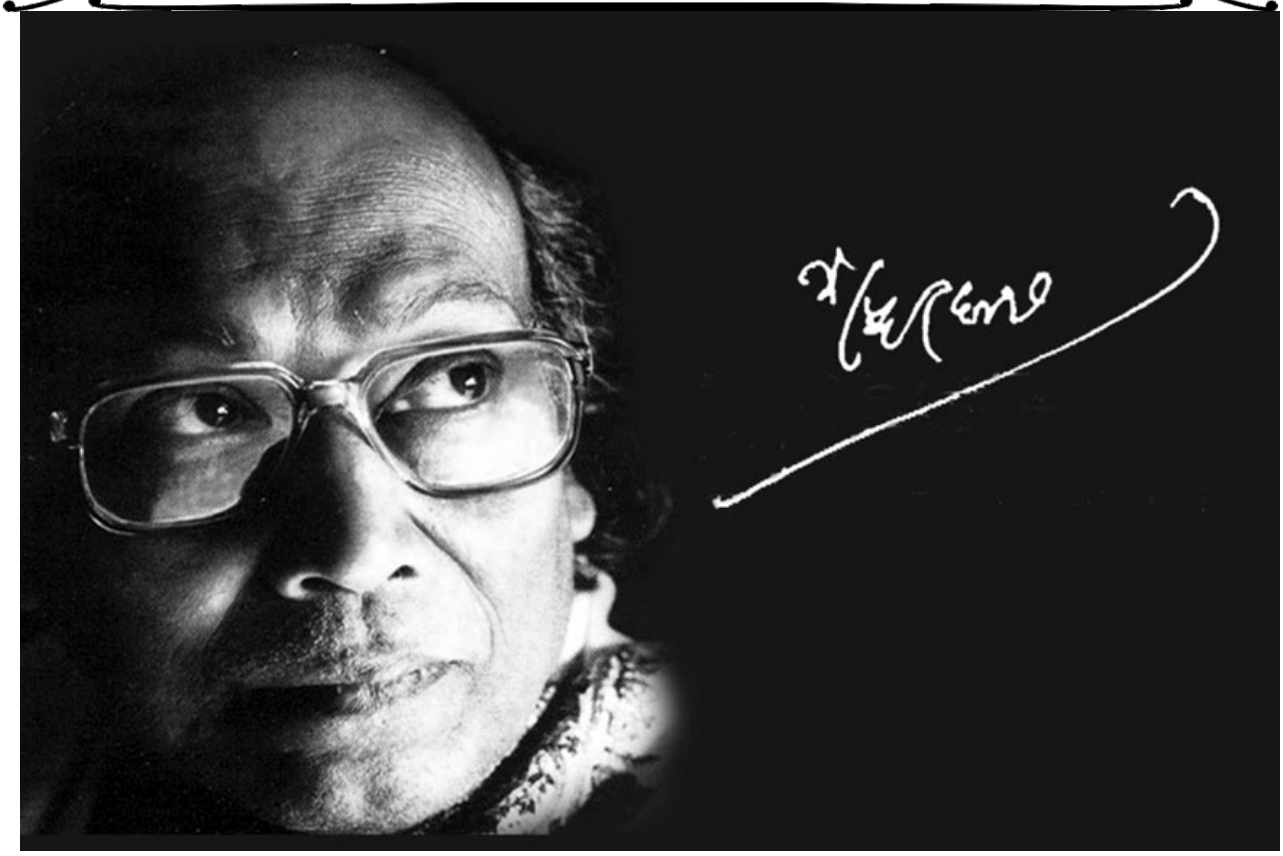

শঙ্খ ঘোষের লেখায় কবিতার উপাদান, ছন্দ ও বোধ

অনুরাধা মহাপাত্র

শঙ্খ ঘোষ জীবনব্যাপী কবিতা ও সাহিত্য সাধনায় কবিতার, সাহিত্যের নির্মাণশিল্প ও কবিতা-সাহিত্যের বোধ নিয়ে দূরযানী এক তীথিকের মনীষায় লিখে গেছেন অসংখ্য লেখা। 'ছন্দের বারান্দা', 'নির্মাণ আর সৃষ্টি', 'শব্দ ও সত্য', 'কবির অভিপ্রায়', 'নিঃশব্দের তর্জনী'-সহ অমেয় আধুনিক লেখা, যে-বইগুলি পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর বছর পেরিয়ে আজও অম্লান ও নতুন নতুন বোধে তাঁর পাঠককে সদা জায়মান রাখছে ভাবে ও নির্মাণের প্রক্রিয়ায়, প্রশ্নে ও দিশায়। আমিও তাঁর কবিতার ও সাহিত্যের

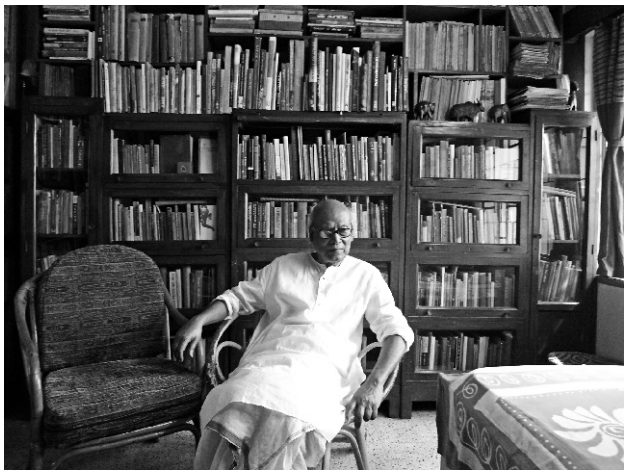

তিতীষু পাঠক, যে খুঁজে চলেছে তাঁর কাব্য-পৃথিবীর অফুরান নবাবিষ্কৃত ঝরনাধারা। বাংলা ১৩৭৮ সালে প্রকাশিত শঙ্খ ঘোষের 'ছন্দের বারান্দা' প্রবন্ধ বইটির ব্যাক কভারে বিশিষ্ট কবিতারসিক ও ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় লিখেছেন, 'আধুনিকতার দৃষ্টি ও কবির দৃষ্টি, এই দুই দৃষ্টির সমন্বয়ে এর প্রত্যেকটি অধ্যায় অসামান্যতায় সমৃদ্ধ। লেখকের দৃষ্টি আধুনিক হলেও নিছক সাম্প্রতিকতার দ্বারা খণ্ডিত বা সংকীর্ণ নয়। সে দৃষ্টিতে ব্যাপকতা আছে। আবার তাঁর দৃষ্টি কবিদৃষ্টি হলেও সে-দৃষ্টি কাল্পনিক ছন্দোনীতির কুহেলিমায়ায় আচ্ছন্ন নয়। বিশুদ্ধ ছন্দব্যাকরণের অর্থাৎ সুশৃঙ্খল ছন্দচিন্তার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। লেখকের গভীর ছন্দোদৃষ্টি, বলিষ্ঠ স্বাধীন চিন্তা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা এই ক্ষুদ্র বইখানিকে একটি মহৎ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।'

বাংলা কবিতার, সাহিত্যের সবকালের সিরিয়াস পাঠক শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেনের এই বক্তব্যের গভীরের তাৎপর্যগুলিকে বোধ করি, এখনও অবধি খণ্ডিত বা অবজ্ঞা করার কোনোরকম এলেবেলে সাহস দেখাবেন না; যদি না তিনি বা তাঁরা কবিতা-সাহিত্যে অন্য কোনো নতুন পথ বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে আনতে পারেন। শঙ্খ এভাবেই অধুনা লেখালিখিতে (যা চলছে তার অধিকাংশই বিস্মৃত ভেজাল কাব্যিয়ানা) নিঃশব্দ তর্জনী তুলছেন—কবি ও কবিতাসমাজকে ভাবতে বলছেন প্রধানত বাংলা কবিতার ক্রমবিস্মৃত মিথ্যা গোলকধাঁধা কাটিয়ে সত্যের কঠিন পথে এগিয়ে আসতে। 'কবি, কবিতা আর তার উপাদান' বিষয়টি কবিতায় অবিচ্ছিন্নভাবে বারবার অনেক প্রশ্ন নিয়ে এসেছে কবিতায় ছন্দমিল এবং দুটি লাইনের অন্তমিলের প্রসঙ্গটি নিয়ে। সমগ্র বাংলা কবিতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে, কবিতা অন্তমিল দিয়ে হবে না মিলের বিরুদ্ধে যাবে? বিদেশি কবিতা এবং বাংলা কবিতায় দুটি লাইনের প্রভূত ব্যবহার এবং ব্যবহারের আবশ্যিক অন্তর্গত কাব্যিক ঐক্যের জন্যে, অন্তঃস্পন্দনে মূল অনুভবটি যে মূর্তায়িত হয় আবার কোনো কোনো কবিতায় শুধু মিল দেবার দুর্বল ঝোঁকে মিল দেওয়া প্রবণতায় কবিতাটি নষ্ট হয়ে যায়। এই মিলনাস্তিকতা বা অতিরিক্ত মিলের প্রবণতার বিরুদ্ধেই বোধহয় একটা প্রতিবাদ এবং কবিতায় গদ্যস্পন্দন এবং মিল ভেঙে নতুন চেহারা দেবার জন্য তরুণ কবিদের জেহাদের প্রমাণ স্বরূপ বাংলা কবিতায় আরেকটি প্রবণতা অতিরিক্ত ও অনাবশ্যকভাবে এসে পড়েছে। এবং সেখানেও সমস্ত অভিনিবেশ এবং স্বচিন্তনপ্রক্রিয়া থেকে আমূল সরে গিয়ে তরুণ কবিরা চোখ রাখছেন বহিরঙ্গের চমকে। মন শুধুই প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার বাজারের দিকে। এবং তরুণরাই যে এই দোষে দুষ্ট হচ্ছেন তা নয়, কেউ কেউ হয়তো কখনো কখনো নিজেকে কিছুটা দূরত্বে সরিয়ে নিয়েও নীরবে ভাবছেন।

আমরা যাঁরা প্রবীণ হচ্ছি তাঁদের আমৃত্যু ভাবতে হবে সাহিত্য এক কঠিনতম পথের সাধনা—এ-পথে বরাবর পেরেকবিদ্ধ হতেই হয়—একলাও হয়ে যেতে হয় নিজের সত্যকে বোঝার জন্য, যার মুখোমুখি হবার জন্যে বাজারের সম্পূর্ণ বিপরীতেও দাঁড়াতে হয়। প্রিয় কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতা ও গদ্য সাহিত্য আমাদের ভেতর বার বার নতুন করে চিন্তার, বোধের প্রবাহকে জাগিয়ে দেয়; আবার সমস্ত অনুভূতি, দৃষ্টি বইতে থাকে নতুন অন্তঃস্পন্দনে। এক-একটি লেখার ভাবনা, কখনো দেখা, কখনো শোনার প্রবাহ আর অবচেতনের অনেক অদেখা ছবি যখন মনে স্পন্দিত হয়, তখন আস্তে আস্তে তার প্রকাশের ভাষা বা ছন্দের চলনও ক্রমে মাথার ভেতর অনুভূত হতে থাকে। কোনো কোনো সময় একে ব্যাখ্যা করা যায়, আমি বুঝেছি কোনো কোনো সময়ে একে ব্যাখ্যা আবার করা যায় না। আবার স্বরবৃত্তের মধ্যে মাত্রাবৃত্ত কেমন করে অনায়াসে এসে যায়। আবার পয়ারের মধ্যে অন্য ছন্দ এসে মেশে, কিন্তু সার্বিক ঐক্যে সে পয়ারই হয়ে ওঠে, একটু নতুনভাবে। এত বহুমাত্রিক কবিতার ছন্দ ও ভাষার ব্যবহার, জন্ম, প্রকাশ ও বিকাশ মানবপ্রকৃতির মতোই বা নিখিল প্রকৃতির মতোই পরিবর্তমান, অনিঃশেষ। একই কবির কলমে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে বিচিত্র আঙ্গিকের কবিতা লেখা হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতেও তা হবে। কবিতায় আধার বড়ো না আধেয় বড়ো—এও এক অতিআবশ্যিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলা কবিতা তথা বিশ্বকবিতায়। কবিতা নষ্ট হয়ে যায়। শঙ্খ যাকে বলেন মিলের বিরুদ্ধে গিয়ে কট্টরভাবে একটা কুসংস্কারকেই খাড়া করা। আর 'মিলিয়ে কেন লেখোনা'র জবরদস্ত উপদেশও মান্যতার প্রয়োজন আছে। আসলে আমার মনে হয়, একজন কবির সারা জীবনব্যাপী লেখার ক্ষেত্রে ছন্দ

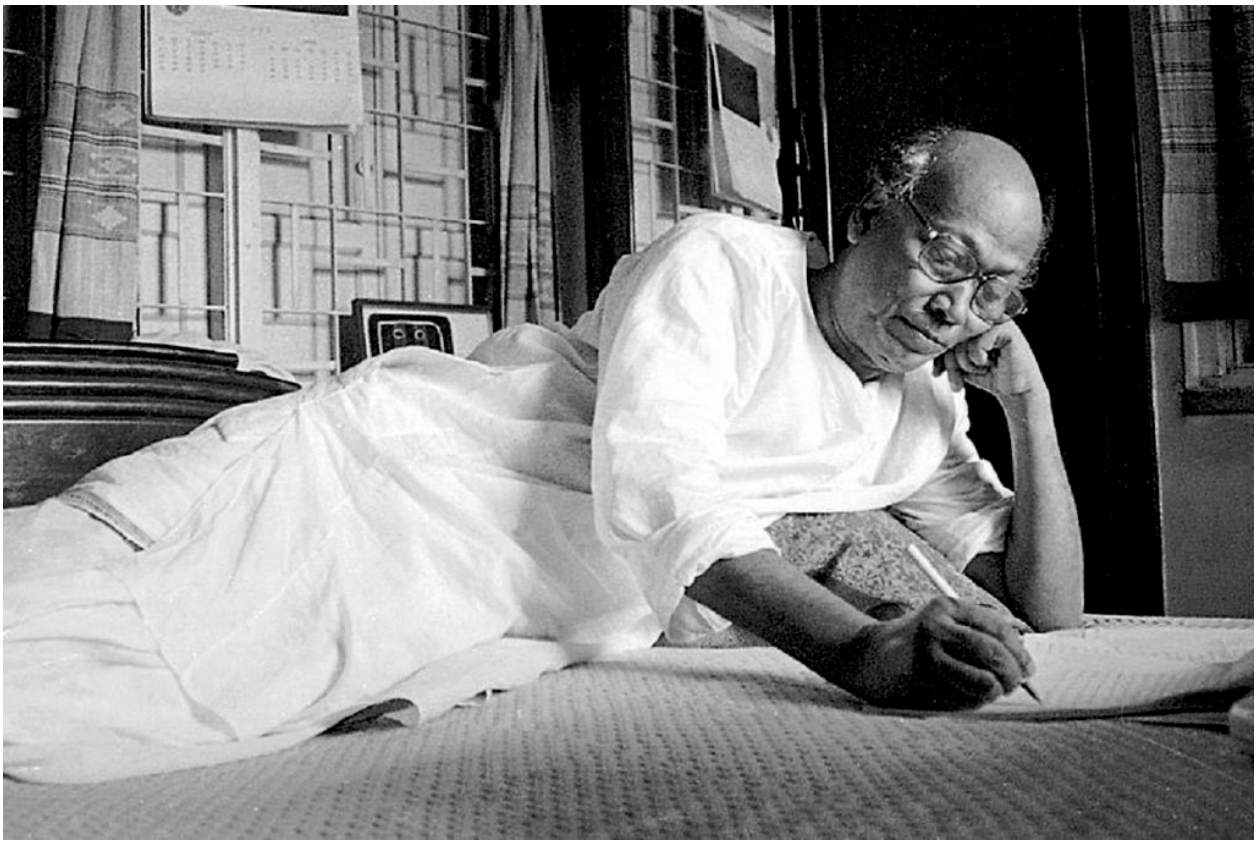

ব্যবহারও এক সাধনা—তা মিলে হবে না অমিলে হবে, একটি কবিতা মিলনান্তক ছন্দে আসতে পারে ভেতর থেকে, আর একটি কবিতার 'অন্তঃসার' মিল ভেঙে দেওয়ার কথাই বলে, তা শেষ অব্দি কবিকেই স্থির করে নিতে হবে। ওই যে বললাম, এও এক কঠিন সাধনার পথ পরিক্রমা এবং অতিক্রমণও বটে। ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য কবিতা তো বটেই, প্রাচ্য ও বাংলা কবিতায়ও ছন্দ এবং ছন্দ ভাঙার প্রভূত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে আসছে এতাবৎকাল। সম্প্রতি তরুণদের কবিতায় আবার মিল এবং মিল ভাঙা দুটি দিকই দেখা যাচ্ছে এবং দুটি দিকেই যতটা না অন্তঃশীলতার প্রয়োজনে তার চেয়ে বেশি 'বাজারের চমক দেবো' এই প্রবণতাও কিছু কিছু চোখে পড়ছে, যা কবিতার নিজস্বতা ও সারবত্তার ক্ষতি করছে। জীবনানন্দ কথিত ঐ 'দৃষ্টি সাধনা'র গভীর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করছি। অমুক প্রতিষ্ঠান পছন্দ করবে, তমুক ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠানের নজরে আসতে হবে, অমুক পুরস্কারের জন্যে তমুক সুপারিশের আনুগত্য রক্ষার উপযোগী কবিতা লিখে একটা বাহ্যিক প্লেজার খোঁজার চেষ্টা করা—বাজার বুঝে কবিতা নিয়ে একটি খবুরে ফতোয়া জারি করা, যাতে প্রকৃতপক্ষে ক্রমে ক্রমে নিরপেক্ষ চিন্তার জায়গাটা শূন্যতে এসে ঠেকছে। এটা ঠিক আমার অহংসিদ্ধ অভিযোগাবলী নয়, অনেকদিন ধরে দেখেছি আর ভেবেছি। এর জন্য কবিরাও খুব দ্রুত খবরের মধ্যমণি হবার চেষ্টা করেন, একটা মনোপলি আক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঘোরেন ফেরেন—শঙ্খ ঘোষ কথিত 'কবিতা যে এটা চায় যে কোনো বাহারের জন্য নয়, সমগ্রের সঙ্গে দূরবর্তী এক লগ্নতারই জন্য।' হায়, 'দূরবর্তী লগ্নতা'! হায়, 'সমগ্র'! কোথাও আজ সেই নিভৃতি নেই। দূরের সাধনা, তার ভেতর যুক্ত হয়ে জীবনের সমগ্রের সাধনা আজ ভুলে গেছে কবি সমাজ! হয়তো মানবসমাজও।

দূরত্বে থেকে, মনের গভীরে নির্জনে জীবনকে বোঝার সাধনা, নিজেকে বোঝার, দেখার, গভীর এক যোগ কবিরা সত্যের পথে যেতে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করেন। দূরে থেকে লগ্ন থাকা, দূরের সঙ্গে লগ্নতা রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার, রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী প্রমুখ কবিরা আজীবনের সাধনা হিসেবে নিয়েছেন। শঙ্খ মানুষের কাছে থেকেও বরাবর এক নিভৃত নিঃসঙ্গ থাকার শিল্প আয়ত্ত করেছেন, যা খুব দুরূহ—সেই কঠিন যাত্রাপথে তিনি কোনো কিছু সহজলভ্যতার সঙ্গে আপোশ করেননি। ভেতরে ভেতরে এবং ভেতরে-বাইরে তাঁকে এর জন্যে অনেক বেদনা পেতে হয়েছে, রক্তাক্ত হতে হয়েছে, অনেক অপমানও সহ্য করতে হয়েছে। মোটেই

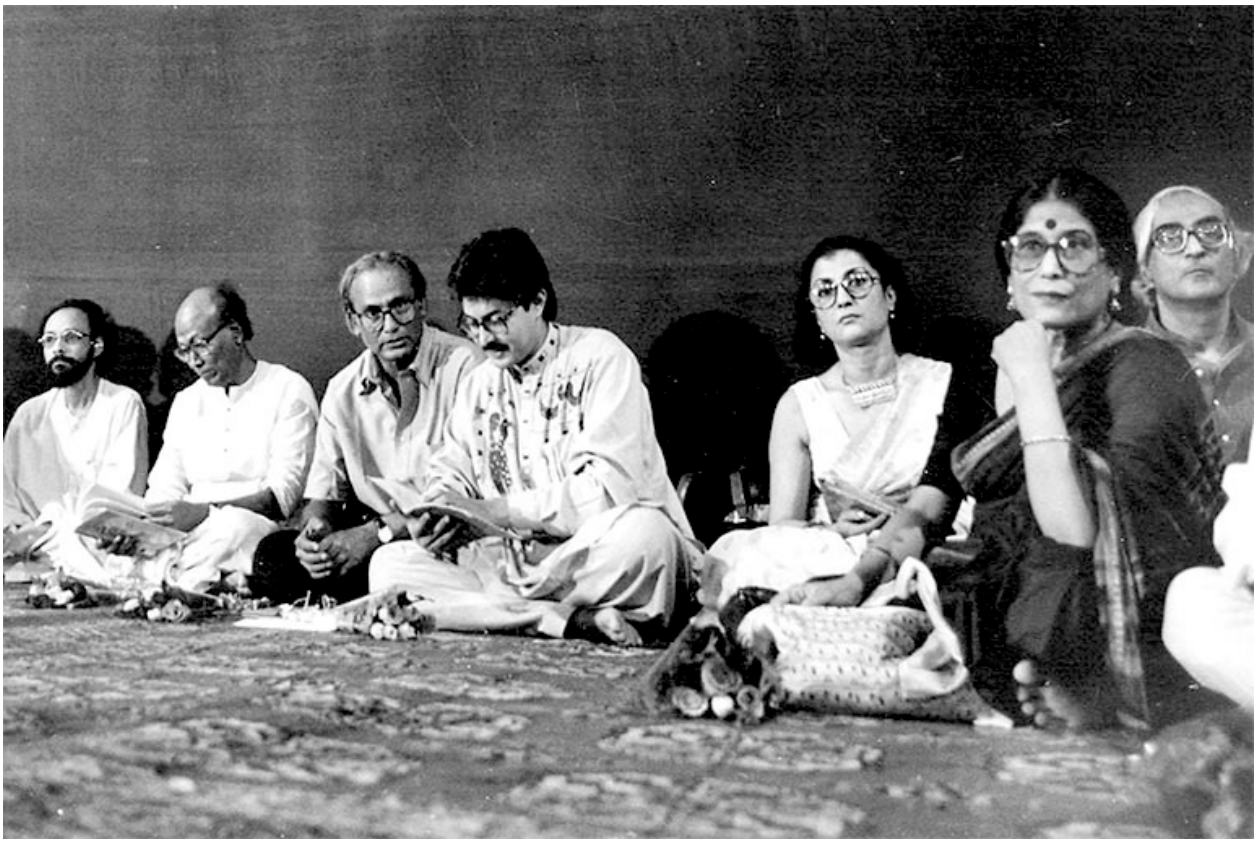

কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে থাকেনি তাঁর এতটা পথ! একথা একালের কবিরা কি ভাববেন? আপাত দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক হলেও আজকে এই কঠিনতম সময়ে জীবনের এই সত্যটি খুবই জরুরি—অনুভব করা এবং স্বীকার করা। পরোক্ষ অর্থে এই নিবন্ধ সম্পর্কেও সত্য, শঙ্খ বন্দনা অর্থে নয়। কারণ, এই কঠিন পথটি প্রত্যেক কবিরই মৌলিক দিক বলে আমার মনে হয়। এর থেকে ক্রমে ক্রমে বিচ্যুতি কবিতারই অপমৃত্যু এবং মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠার দিকে একটা জট এবং অন্ধকারের পরিমণ্ডল তৈরি করে—যেখানে আবার হাজার বছর ধরে পথ হাঁটলেও কবিতার মুক্তি ঘটে না। শঙ্খ অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাষায় এই গভীরতম উপলব্ধির কথাটি লিখেছেন। মনে হবে কথাটি কত সহজ! আসলে তার তাৎপর্য, গভীরতা অসীম। পরে এই নিবন্ধের দ্বিতীয় অংশ 'সময় ও প্রতিমা' নামটিতেই প্রায় এর অর্থবোধকতা অনুভূত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ দিয়েই তিনি শুরু করেছেন। বলাকার কবিতা 'যে কথা বলিতে চাই/বলা হয় নাই/সে কেবল এই—' এই কবিতায় একটি চিত্র, একটি প্রতিমা দেখতে পাই, তবু ভাবতে হয় এই লাইনটিতে এসে 'হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহার প্রকাশ।' প্রতিমা নির্মাণ তো হল, একটি ছবি তার স্পেস, তার স্থান বা অবস্থানও নির্ণিত হল। কিন্তু কবিতা আরো অতিরিক্ত কিছু চায় তা, এই প্রতিমার ভেতর থেকে প্রতিমাকে ছাপিয়ে আরো ভিন্নতর কিছু। আরেক সময় সময়ান্তরে তার অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনার প্রবাহমানতা থাকে। শঙ্খ বলেছেন, ছবি বা প্রতিমা 'স্পেস বা দেশ-সন্নিহিত' আর 'কবিতা হল কাল-বিন্যস্ত'। তবে কবিতার আধুনিক প্রতিমায়ও এর ভিন্ন এক প্রতিমা ও ভিন্ন সময়ের, ভবিষ্যের বার্তা বা ব্যঞ্জনা কবিরই হৃদয়ে অনুভূত হতে থাকে। প্রতিমা আর শুধু প্রতিমাই রইল না—অসীম প্রবাহে তার সঞ্চার অনুভূত হতে থাকে—যেমন জীবনানন্দের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি/তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর'—এশুধু চিত্ররূপময়তা নয়, এ এক অন্য খোঁজ, বাংলার—স্পেস, সমসময় পেরিয়ে। কবি বাংলার মুখ দেখেছেন জানিয়েছেন—'তবু সে জ্যোৎস্নায় দেখিল কোন ভূত/ঘুম কেন ভেঙে গেল তার/অথবা হয়নি ঘুম...। আসলে সব দেখা ছবির শেষেও কবি খোঁজেন। সেই প্রবাহে কবি আবার অন্য এক বেশে অন্য এক বোধে ফিরে আসতে চান বাংলার প্রতিমায়—'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়।' কবিতার নদীপ্রতিমাটির ভেতরেই ঘাই দেয় অন্য এক বোধ। আবার 'ঘাইমৃগী', 'মৃত মৃগদের'—এক কবিতার ভেতর অনেক ছবির ইশারা, একহারা নয়, ভিন্ন ব্যঞ্জনা আর ভিন্ন স্রোত—'আমার বুকের পরে সেই রাতে

জমেছে যে শিশিরের জল/তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই, শুধু তার স্বাদ/তোমারে কি শান্তি দেবে?' একথা অনস্বীকার্য যে কোনো কবিতার 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থানিক রূপের সঙ্গে গূঢ়ভাবে মিশে যায় সময়ের বোধ, দেশ-কালে সম্পৃক্ত হয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায় এক একটি ছবি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় স্মৃতিতে ঘনিয়ে তুলেছেন ভবিষ্যতের, বর্তমানের যুগ্ম এক অভিব্যঞ্জনা, সময়াতিক্রান্ত এক আর্তি, নিভৃত এক বাক্। আর আধুনিক কবি বর্তমান বাস্তবতার ছবি কবিতায় আঁকেন যা সঞ্চরমান, স্মৃতির সঞ্চয় নয়, ভবিষ্যতের দিকে যার স্রোত, আর্টিস্টের ছবির সঙ্গে যার ফারাক। শঙ্খ ঘোষ হোমার, রবীন্দ্রনাথ, ম্যাথু আর্নল্ড-এর প্রসঙ্গ এনেছেন। এনেছেন জীবনানন্দের লেখা কবিতায় 'মৃত্যুর বিকীর্ণ শিল্পে' জীবনের সামনে দাঁড়াচ্ছেন—কিন্তু সেই প্রবাহ যার গতি ভবিষ্যতের দিকে। মৃত্যুর ভাবনার ভেতরে থেকেও—'ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—ধীরে—পউষের রাতে/কোনোদিন জাগব না জেনে।' ইংরেজি কবিতায় এজরা পাউন্ডের ইমেজিজম আন্দোলনের মূল কথা কবিতাশরীরে সংহতির ভাবনার কথা, পঞ্চাশ বছরের বাংলা কবিতায় তার ছায়াপাত অত্যন্ত সদর্থক হয়ে আছে—যার কথা শঙ্খ বলেছেন জীবনানন্দকে উল্লেখ করে। আমি মনে করি, পঞ্চাশ পেরিয়ে আরো অনেক সময় ধরে এই ইমেজিজমের ভাবনা অনেক নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে অর্থাৎ বাংলা কবিতায় প্রতিমা নির্মাণ আর তার বহমানতা, তার বিচিত্র অর্থদ্যোতনা সমানে চলমান হয়ে দেখা যাচ্ছে। এবং সঠিক অর্থেই শঙ্খ বলেছেন, 'কবিতার প্রতিমা আজ তাই কবির কাছে উপকরণমাত্র নয়। এক হিসেবে এটা তাঁর যুদ্ধেরও চিহ্ন।' জীবনকে দেখার, বোঝার এবং তার সঙ্গে নিজের সত্তার প্রতিনিয়ত সংযোগ বিয়োগ সব কিছুর সংহত প্রকাশ এই প্রতিমার বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায়। আর সময় বড়ো বলবান—সময়ের সংঘর্ষের ভেতরও যে সংহত শ্রী যা প্রবল ভাঙচুরের ভেতরও চূড়ান্ত জরুরি—যা কবিতাকে মৃত্যুত্তীর্ণ করে। এই আবশ্যিক শ্রী-র ভাবনাও গতিশীল, পরিবর্তমান, বিবর্তমান। যদিও শেষ অব্দি জীবনের সঙ্গে লগ্নতা, প্রতিমা বা বিষয়ের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষাও কবিতার শেষ কথা নয়। এর সঙ্গে থেকেও বেরিয়ে আসা। আবার নিজের কাছে ফেরা, আবার মুক্তি—এ বড়ো সহজ পথ নয়। প্রতিমাকে বিসর্জন দেওয়ার পরে এক আকাশ এসে দাঁড়ায় সমনে—যার শেষ নেই তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় কবিকে। শঙ্খ ঘোষের বাক্যবন্ধের সামগ্রিকতা মেনে নিয়েই এ আমার এক নতুন অনভূতি। এখনকার শঙ্খও তাঁর কবিতায় এই প্রতিমা থেকে বেরিয়ে আরেক এক অচেনা পথে রয়েছেন। আরেক বাক্সঞ্চারের ভেতর যাতে নতুন এক মুক্তি, এক খোঁজ মেলে 'ভবিতব্য' নামের কবিতায়

আগুন লেগেছে শূন্যে, আমোদে মেতেছে তটভূমি।
হাড়পোড়া শব্দগন্ধ জড়িয়েছে গভীর আশ্লেষে
ঘুমন্ত মনেরও বোধ। মনে হয় একদিন তুমি
জলাধার হয়ে তবু দাঁড়াবে আমারই সামনে এসে।
কতজনে জানতে চায় বেঁচে আছি আজওকি তেমনই—
অথবা কীভাবে আজও তোমাকেই ভেবেছি প্রবাহ!
তোমার সঞ্চয় তবে মিথ্যে থেকে মিথ্যে হয়ে এল?
আমারও প্রতীক্ষা তবে শেষ থেকে হয়ে এল শেষ?
আগুন ছড়ায় আরো, কোথাও কিছুই নেই বাকি
পুড়ে যায় চক্ষুতারা, পুড়ে যায় দূরে বনস্থলী—
তবুও কীভাবে আজও তোমাকেই ভবিতব্য ভাবি।
যে-কথা কারোই কাছে বলা যায় না কীভাবে তা বলি!

—কাব্যগ্রন্থ 'শুনি শুধু নীরব চিৎকার'

'প্রতীকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' শিরোনাম সম্বলিত লেখাটিতে তিনি বলেছেন, কবিতায় 'প্রতীক' হয়ে উঠতে পারে 'প্রতীক-পোশাক', 'প্রতীক-দেয়াল'—যা কবির 'আপন স্বভাব' নয়। হাংরি কবিদের কবিতায় এই প্রতীকের ব্যবহার ক্রমশ ওপর ওপর বর্ম চাপানোর মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীবনানন্দের কবিতায় তাঁর প্রতীক বা প্রতিমার ব্যবহার তাঁরই স্বভাবের অন্তর্গত ছিল। তাই আজও জীবনানন্দের কবিতা আমাদের মনে এত সজীব সত্যরূপে ধরা দেয়। পরবর্তী বাংলা কবিতায়ও এই প্রতীকের ব্যবহার বহু কবির লেখায় হয়েছে, তার অনেকাংশ ভেতরের থেকে উঠে আসা, আবার অনেক অংশ নিষ্ফল এবং বাইরে চাপানো বলে সেই কবিতাগুলি পরে পড়তে গিয়ে এতটা নিষ্প্রাণ লাগে।

কবিতায় মূল বিষয়ের প্রত্যক্ষ সত্য রেখেই তার বিস্তারে প্রতীকের ব্যবহার, বা উপমার ব্যবহারের কথা বলেছেন শঙ্খ ঘোষ—এ বড়ো কঠিন কাজ, কঠিন পথ সমস্ত কবিদের পক্ষেই। গোলাপকে গোলাপ, ঘাসকে ঘাস, নন্দিনীকে নন্দিনী, রঞ্জনকে রঞ্জন হিসেবেই দেখা এবং সেই গোলাপ, সেই ঘাস, সেই নন্দিন, সেই রাজা কবির, নাট্যকারের, সর্বতোভাবে মানুষেরই অন্তর্গত সত্যকে প্রকাশ করা—সেই সত্যের প্রকাশই কবিতা। এর পরে উপমা, প্রতীক যদি এই সত্যের বিকাশের পথে একান্ত আবশ্যিক হয়, তাহলে তাকে কবিতায় আনা, নচেৎ নয়। আত্মউন্মোচনই কবিতা, জীবনই কবিতা। প্রতীকের সাহায্যে জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া কবিতা নয়। সারাজীবন কত না উপমা প্রতীকের সাহায্যে বলে এসেও অতৃপ্ত রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বছর পরে লিখলেন—

যে কথা বলিতে চাই
বলা হয় নাই
সে কেবল এই
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখি-সম্মুখেই
রয়েছে আমার।

যেভাবে জীবনানন্দ লিখেছিলেন সমস্ত খোলস ছেড়ে—'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ/যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি/আজ চোখে দ্যাখে তারা/যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই/পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।'

শঙ্খ লিখছেন বরাবর এই প্রতীক, উপমা ছেড়ে বস্তুর প্রকৃত সত্যকে নিজের সমস্ত অনুভবের চিন্তার কল্পনার গভীর থেকে অনুভব করে তাকে স্বরূপের সত্যে প্রকাশ করতে। আসলে তিনি চান বস্তুর সমগ্রতাকে ছুঁতে। তার আংশিকতাকে নয়, সেখানে কেবলই 'অর্ধসত্যে সমাচ্ছন্ন কালের কিনারায়' জীবনকে দেখতে চান না তিনি, কারণ সত্য এই যে অর্ধসত্য বা খণ্ডসত্য সত্য নয়। তাই শঙ্খের এই অনুভবের শরিক আমরা অন্য কবিরা হতে পারি, যদি আমরাও জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে পারি। দ্বর্থ্যহীন ভাষায় শঙ্খ জানাচ্ছেন তিনি প্রতীকের, অলংকারের বিরুদ্ধে নন। অর্থাৎ মানুষকে কবিকে জানতে হবে আত্মিকতার বিকাশে। কোনো লাবণ্য বা দ্যুতি আনার সত্য অর্থে প্রয়োজনে প্রতিমা, প্রতীকের ব্যবহার। অযথা কোনোভাবে নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই পংক্তি অংশটি কি এই দেড়শো

বছরের অধিক সময়েও আমাদের মস্তিষ্কে সদা অনুরণিত হয় না—'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।' শঙ্খ ঘোষ যথার্থ অর্থেই বলেছেন, 'কিন্তু প্রতীক যদি হয় পালিয়ে যাবার ছল, আত্মগোপন করবার একটা আবরণমাত্র, তাহলে সেই প্রতীকের বিরুদ্ধে আজ সকলের যুদ্ধ।' তবে সফলভাবে প্রতীক, প্রতিমার ব্যবহারও অতি কঠিন এক পরীক্ষা। জীবনানন্দের মতো এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান কবিই পেরেছেন প্রতীকের আন্তরিক সত্যার্থে প্রয়োগ করতে। আমার দীর্ঘ কবিতাচর্চায় অনেক সময় উপমা, প্রতীক ব্যবহার করেছি। আবার আজকাল এর ব্যবহার না করেই সরাসরি

বোধের কথাই লিখছি এবং লিখতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে পাখির শরীর ডানা ছুঁয়ে প্রকৃত স্পর্শ পেতে ইচ্ছে করছে গাছের গায়ে কান পেতে তার হৃদ্‌স্পন্দন, তার অকথিত কথা শুনতে, ভেসে যাওয়া একটুকরো ঘাসজমিকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে ঘাসেরই মর্ম আর স্পর্শ জানতে। মূর্তিকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে তার সমগ্রতায় তার স্বরূপ এবং রূপকে অনুভব করতে। সারদা মায়ের ছবি দেখলে মনে হয় মায়ের হাত স্পর্শ করছি, মা-কেই স্পর্শ করছি, আর কাউকে নয়, কোনো প্রতীক, প্রতিমাকে নয়—সম্প্রতি এই উন্মোচন আমার জীবনে ঘটছে। তবে এও বুঝি আমার জীবনে উপমার প্রয়োজন ফুরোয়নি। আসলে কোন লেখা কীভাবে আসে কীভাবে নির্মিত হয়, তা সবসময় আগে থেকে জানা যায় না। 'শব্দের প্রতিশোধ' এই শিরোনামে শঙ্খ ঘোষ শুরুতেই লিখছেন, 'সে যুদ্ধ, অনেক সময়ে, শব্দেরও সঙ্গে।' এ কথা তো ঠিক যে কবির মাধ্যম শব্দ, হাতিয়ারও কখনো কখনো; কিন্তু শব্দ যদি মূল ভাব বা বার্তা বা আবেগ প্রকাশকে সরিয়ে প্রধান হয়ে ওঠে, তাহলে সমূহ সর্বনাশ। ভাব প্রকাশে শব্দের প্রয়োজন ভাবপ্রকাশের জন্যই, তার অলংকার বাড়ানো এবং ভাব থেকে পালিয়ে একটা ছদ্ম আড়াল তৈরি করতে নয়। কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ প্রমুখ কবিরা শব্দকে প্রায় ভাবপ্রকাশে স্বতঃস্ফূর্ত এবং যথার্থতার সঙ্গে এনেছেন, বাহুল্য হিসেবে নয়। তাঁদের লেখায় প্রতিটি শব্দই কোথাও বাড়তি নয়, অযথার্থ নয়। কিন্তু এখানেও জীবনানন্দ শব্দ প্রয়োগ নিয়ে আমৃত্যু কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন—প্রায় শব্দ-সাধনা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথও তাই। এবং পরবর্তী আরো অনেক প্রতিভাবান কবি এই সাধনার পথেই অগ্রসরমান হয়েছেন, হচ্ছেনও।

শঙ্খ ঘোষ বলছেন শব্দের ভরের কথা, অন্তঃশীলতার কথা, কেবল শব্দ দিয়ে শৈলী নির্মাণই কবির কাজ নয়। দুঃখ, প্রতিবাদ, লাঞ্ছনা, বিদ্রোহকে প্রকাশ করতে হবে এমন শব্দে, যে শব্দ উঠে আসছে মূল আবেগের আধার থেকে, এবং সেই শব্দ প্রকাশ যেন আরেকজনের ভেতরেও তার কথাকে স্পর্শ করে, তার অন্তরের ভাষাকেও জাগিয়ে দেয়। একজনের অনুভূতি যেন আরেকজনের অনুভূতি প্রকাশে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। শব্দ যেন কবিতায় কবির কায়দা প্রকাশের মাধ্যম না হয়ে ওঠে। 'শব্দ' প্রকাশের স্বাধীনতা যেমন কবির বা লেখকের আছে, তার দায়ও থাকা দরকার। না-হলে কবি ক্রমে পারিপাট্যে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন, শব্দের চাতুরিতে—তাঁর দৃষ্টি সাধনাও সরে যায় দূরে, তাঁর অন্তর্গত নিভৃতি আর খোঁজের সাধনাও ব্যাহত হয়, ক্রমে বৃত্তাকার হয় মন, প্রসারিত আর গভীর হয় না। শঙ্খ ঘোষ লিখছেন, 'শব্দ তখন বুঝিয়ে দেয় যে সে হয়ে উঠছে বিচ্ছিন্ন এক সত্তা। বুঝিয়ে দেয় যে সে কোনো সংযোগের বাহন নয় আর, সে কতগুলি আলগা প্রসাধনমাত্র। আমাদের সমস্ত লেখার জগতে এই প্রসাধনের চর্চা আজ বাধাহীন হয়ে উঠছে আবার, আমরা অনেকেই তার শিকার। সাংসারিক জীবনে যেমন সমস্ত লক্ষ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠছে মার্চেন্ট অফিস, নিঃসার এবং নিঃসাড় চালাক-চতুরতাই যেমন হয়ে উঠছে জীবনের মূল ধ্যান, তেমনি আমাদের সাহিত্য জীবনেও ভাবছি কেবল শব্দ-সাজানোর চাতুর্য, দেখতে শুনতে ঝকঝকে হয়ে ওঠাকেই মনে করছি শিল্পের এবং জীবনের চরিতার্থতা।' এখন এই বাস্তবতা তো আরো ভয়ংকর একতান্ত্রিক বাজারকেন্দ্রিক কর্পোরেট হয়ে উঠছে। মন আর ব্যথিত হয় না কিছুতেই, মন আর কারো চোখের ভাষা বুঝতে নিঃসাড়। মনেরও চোখ আজ ক্ষমতা কায়েমের দিকে, ছোটো বাজার, বড়ো বাজার, ছোটো প্রতিষ্ঠান, বড়ো প্রতিষ্ঠান—নানাবিধ ঢক্কানিনাদের দিকে। অন্তঃশীলতার দিকেও নয়, চারপাশে স্পন্দিত জীবনের দিকেও নয়। ইন্দ্রিয়গুলিও আজ মৃত। সব কিছু কিনে আনা, সাজানো গোছানো—কোথাও প্রাণ নেই, কারও প্রতিই ভালোবাসা নেই, নিজের সত্তার প্রতিও কোনো মনোযোগ নেই। তাই 'শব্দ' আজ বড়ো কঠিন পরীক্ষার সামনে—সে পরীক্ষা মিথ্যের রিরুদ্ধে সত্যের। এই আমার উপলব্ধি। সারাপৃথিবী জুড়ে আজ তাই মিথ্যে শব্দ এবং শব্দের তান্ডবের বিরুদ্ধে সরলতা ফিরে পাবার, শিশিরের মতো ঝরে পড়া কবিতা-গন্ধের সন্ধান।

এতগুলি ভাত খাবি

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

‘ও মা, আর কত দূরে যামু। সেই থিকা হাঁটতেই আছি। আমি আর পারতাছি না।’

ছেলের দিকে তাকিয়ে বিন্তি বলল, ‘এই তো আইয়া পড়ছি।’

‘সেই থিকা কইতেই আছো আইয়া পড়ছি, আর আইয়া পড়ছি। আমার তো পা ব্যথা করতাছে।’

তরে নিয়া আমার হইছে মহা জ্বালা। সারাদিন যহন এদিক-ওদিক টইটই কইরা বেড়াস তহন তো কিছু হয় না! কি শত্তুর যে প্যাডে ধরছিলাম।’

বিন্তিরও হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। মাসি যেদিন কথাটা বলেছিল সেই দিনই বাড়িটা চিনিয়ে দিয়ে

বলেছিল,'সক্কাল-সক্কাল যাইস কিন্তু।'

গুটকে রাস্তায় কিছু একটা দেখে তুলতে যাচ্ছিল। বিন্তি বলল, 'তর এহন আদাড় ঘাটার সময়? জামাডা নোংরা হইয়া যাইবে। বাবুগো বাড়ি যাইতাছস। তরে দেইহা অরা কইব কি?'

'আমি যামু না।' গুটকে বলল।

'তা যাবি ক্যান। বাড়িতে বইয়া কি হাওয়া খাবি? বাবুগো বাড়ি আইজ কত রকম খাবার হইবে।'

খাবারের কথা শুনে গুটকে বলল,'অরা ভাত খাইতে দিবে? গরম গরম।'

'খালি খাই খাই। দিবে। এহন তো তাড়াতাড়ি চল।' এই বলে বিন্তি গুটকের হাত ধরতে গেল।

ছিটকে গেল গুটকে। বলল, 'আমারে ধরতে হইব না। আমি নিজেই হাঁটতে পারুম্।'

আজই পোটলা খুলে তার শাড়ি আর গুটকের জামাপ্যান্ট বের করেছে বিন্তি। গুটককে হাঁটতে দেখে হেসে ফেলল, 'হাঁটতাছে কেমন! মনে হয় লাট সাহেবের বেটা।'

সেদিন সাইকেলের টায়ারটা ঠিক মতো চালাতে পারছিল না গুটকে। হাতে পেয়ারা গাছের ডালটা ছিল সেটা ছুঁড়ে ফেলল। রাগে খালি হাতেই চালাবার চেষ্টা করল। পারল না। টায়ারটা পেয়েছিল রাস্তার ধারে আগাছার ভিতর। সেখান থেকে টেনে বের করে পুকুরের জলে ফেলে ধুয়ে নিয়েছিল।

ছেলের হাতে ওটা দেখেই সেদিন রেগে গিয়েছিল বিন্তি। 'ওরে, আমার যে ক্যান মরণ হয় না! কোন আদাড় থিকা তুইলা আনছস এইডা।'

গুটকে বলল, 'পুকুর থিকা ধুইয়া আনছি।'

'আমারে উদ্ধার করছস।' বক বক করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিল বিন্তি।

তাকে পাঁচটা বাড়িতে কাজে যেতে হয় রোজ। ছেলেটা সারাদিন বাড়িতে থাকবে। কী করবে না করবে কে জানে। ভগবানের ভরসায় ছেড়ে যায়।

রোজ সকালে ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয় বিন্তির। সকালে ওকে খাইয়ে দুপুরের খাবার ঢেকে রাখে। সব বাড়িতে এবেলা-ওবেলা কাজ শেষ করে যখন ফেরে তখন দেখে গুটকে ঘুমিয়ে। সকালে স্নান করতে চায় না। ওই সময় কোথায় যে উধাও হয়ে যায়। যেদিন খুঁজে আনার সময় থাকে না সেদিন স্নান হয় না। গা ভর্তি ধুলো।

বিন্তি ফেরার রোজ সময় ভাবে বাড়ি ফিরে দেখতে পাবে তো ছেলেকে? বেঁচে আছে তো! ঘুমিয়ে থাকা গুটকের মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হয় বিন্তির। মাত্র দশ বছর বয়স। কোথায় ছেলেটা মায়ের কাছে থেকে আদরে বড়ো হবে, তা না। এই বয়সেই নিজের মতো করে অবহেলায় দিন কাটছে।

একদিন পুকুরে নেমে স্নান করতে গিয়ে ডুবতে বসেছিল। বিন্তি বলেছিল পাশে বসে থাকতে। বাসন মেজে তারপর স্নান করিয়ে দেবে। কখন গুটকে জলে নেমেছে টের পায়নি বিন্তি। যখন দেখল তখন গুটকে হাবুডুবু খাচ্ছে। লাফ দিয়ে নেমে জল থেকে তুলে এনেছিল ছেলেকে। তার চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে এসেছিল। কপাল ভালো বিন্তির যে, খারাপ কিছু হয়নি। গুটকে একটু সুস্থ হতেই অত লোকজনের সামনেই একটা চড় মেরে নিজেই কেঁদে ফেলেছিল সে। বলেছিল, 'তুই আমারে কথা দে। আমি বাড়িতে না থাকলে তুই পুকুরের ধারে কাছে যাবি না।'

গুটকের মাথায় কথা দেওয়ার বিষয়টা না ঢুকলেও সেদিন খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মায়ের হাতে চড় খেয়ে মাকেই জড়িয়ে ধরে কেঁদে যাচ্ছিল।

সেদিন আর কোনো কাজের বাড়িতে যায়নি বিন্তি। ছেলেকে কাছে রেখে কাটিয়েছিল গোটা দিন।

ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'আমি রোজ সকালে তোরে স্নান করাইয়া দিমু। তুই একা একা পুকুরে নামবি না।' বিন্তি ছেলেকে সকালে স্নান করিয়ে খাইয়ে তারপর বেরুবার কথা ভাবলেও রোজ হাতের কাছে পায় না।

গুটকে এদিক-ওদিক বিন্তির নাগালের বাইরে ছুটতে থাকে। উপায় না দেখে বিন্তি বালতিতে করে জল তুলে রাখে উঠোনে। সারাদিন কী যে করে ছেলেটা। কোন খেয়ালে থাকে। মাঝে মাঝে বালতির জল বালতিতেই থেকে যায়।

খাওয়া নিয়ে অনেক বায়না। খাওয়াতে চাইলে খাবে না। বলে, 'লোকের দেওয়া ওই পচা খাবার আমি খামু না। তুমি রান্না করতে পারো না? লোকের বাড়ি থিকা খাবার আনো ক্যান?'

পাঁচটা কাজের বাড়ি সবাই তো খাবার দেয় না। যে তিনটে বাড়ি থেকে দেয় তাতে মা ব্যাটার খাওয়াটা হয়ে যায়। ওরা খাবার দেয় বলেই তো বিন্তি টাকা জমিয়ে রাখতে পারে একটা ঘর বানাবার স্বপ্নের কৌটোয়।

গুটকেটা হয়েছে ওর বাপের মতো। খারাপ খাবার মুখে রোচে না।

এখানে একে-তাকে ধরেও যখন কাজ জুটল না, তখন লখাইকে যেতে হল ভিন রাজ্যে।

ফোনে কথা হত লখাইয়ের সঙ্গে। বলেছিল, যে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে তাতে মালিক আর কাজে রাখতে চাইছে না। সবাই বাড়ি ফিরে আসবে।

সব শেষ হয়ে গেল তারপর। লখাই ফিরবে বলার পর আর কোনো খবর নেই।

মাসি যে বাড়িতে কাজ করে সেখানে টিভি আছে। মাসি যখন আসত তখন নানা খবর বলত। একদিন বলল, কিছু শ্রমিক যে গাড়িতে করে আসছিল সেই গাড়ি থেকে অনেকেই নেমেছিল চা খাবার জন্য। একটা গাড়ি ছুটে এসে ধাক্কা দিয়ে তিনজনকে মেরে দিয়েছে। কেউ কেউ রেল লাইনে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল একটা মালগাড়ি চলে গেছে লোকগুলির উপর দিয়ে।

এসব শুনত বিন্তি আর অঝোরে কাঁদত। এছাড়া আর কীই বা করার আছে তার। রোগের ভয়ে চারিদিকে সব বন্ধ। বিন্তি ফোন করেও কোনো সাড়া পায় না লখাইয়ের। সে টিভিও দেখতে পায় না। মাসিকে বলতেও পারে না যারা মারা গেছে কেউ কি লখাইয়ের মতো দেখতে! মাসি যদি হ্যাঁ বলে তবে তো বিন্তি আর বাঁচবে না। ওই একরত্তি ছেলে গুটকে তখন যাবে কোথায়!

মাসি বলে, মরেও মানুষগুলির আত্মার কোনো শান্তি নেই। শেয়াল কুকুরের মতো মানুষগুলোকে গাদা করে কোথায় নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে কে জানে! জলেও ভেসে যাচ্ছে অনেকে।

এসব শুনে আছাড়ি পিছাড়ি কান্না ছাড়া আর কিছু করার থাকে না বিন্তির। কোথায় একটা ছোট্টো পোকার মতো হারিয়ে গেল লখাই, সে জানতে পারছে না। বুঝতে পারছে না লখাই কি তাকে ভুলে গেল? ও কি অন্য কারো হয়ে গেল? যাই হোক বিন্তির শরীরের ভিতরে কান্নার স্রোতগুলি কেবল আঁকিবুকি কাটে। ফোন কাজ করছে না। চাল-ডাল কেনার পয়সা ফুরিয়ে আসছে।

একটা ঝড়ের খবর ভেসে আসছিল। সবাই যে যার মতো আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছিল। অনেকে বিন্তিকে বলেছিল স্কুলবাড়িতে যেতে।

কোনো রকমে গড়ে তোলা একটা ছাউনির মতো ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে মন চায়নি। লখাইয়ের একটা জামা, মলিন গামছা, একজোড়া চটি আরো টুকিটাকি কত কিছু ছড়িয়ে। এসব দেখলে মনে হয় লখাই বুঝি কাছাকাছি আছে। এসব ফেলে চলে গেলে লখাই যদি আসে তাকে খোঁজে গুটকেকে আদর করতে চায়, তখন! কোথায় কোথায় ছুটবে বেচারা।

কিন্তু ঝড় আসার দিন যখন হাওয়ায় মাথার উপরে চালাটা মচ মচ করে শব্দ করছিল তখন হাতের কাছে যা পেয়েছে একটা কাপড়ের পোটলায় বেঁধে গুটকের হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছিল। চোখের সামনে ভেঙে পড়েছিল ঘর। ওইটুকু ছেলে গুটকে চিৎকার করে উঠেছিল ভয়ে।

তখন যেমন বাতাস তেমন বৃষ্টি। গুটকেকে ধরে কোনোরকমে ছুটতে ছুটতে হাজির হয়েছিল স্কুল বাড়িতে। ওদের বেঁচে থাকতে দেখে সবাই খুব অবাক হয়েছিল।

একজন বলল, 'তুই বাঁইচা আছস? আমি তো ভাবছি মরছ বুঝি। এইজন্যই তরে কইছিলাম চইলা আয়। তহন কথা হুনলি না।'

পরদিন মাসির বাড়ি এসে উঠেছিল। সব শুনে মাসি বলল,'তুই আমার বাড়িতেই থাইকা যা। তগো এলাকার বাড়ি-ঘর তো জলে ডুইবা আছে। তুই আর যাবি কই!'

মাসির বাড়িতে কেউ নেই। একটি ছেলে বিয়ে করে অন্য গ্রামে থাকে। মায়ের খোঁজও নেয় না। একবার এসেছিল। বলেছিল, জায়গাটা বিক্রি করে টাকা-পয়সা ভাগ করে দিতে। তখন মাসি তাড়িয়ে দিয়েছিল। বিন্তি বলল, 'আবার যদি আইয়া পড়ে?'

রেগে গিয়েছিল মাসি। 'আইলেই হইল। আইলে ঝাঁটা মারুম। অমন পোলার আমার দরকার নাই।'

মাসিও বাড়িতে থাকে না। যে বাড়িতে কাজ করে সেখানেই থাকা-খাওয়া। কপাল ভালো মাসি ঝড়ের পরদিন ঘরদোর গোছাতে এসেছিল।

বিন্তিকে পাঁচ বাড়ির কাজ মাসিই জুটিয়ে দিয়েছে।

কাজের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা খাবার যখন খেতে বসে তখন গুটকে বলে, 'আমাগো বাড়িতে রান্না হয় না ক্যান?'

পাঁচ বাড়ির কাজ করে তার নিজের ঘরের কাজে সময় কোথায়!

মাসি যে বাড়িতে থাকে, কাজ করে সেখানে লোকজন আসবে। দাদাবাবুর বন্ধুরা। তাদের বউ-ছেলেমেয়ে। মাসির একার পক্ষে অত লোকের রান্না করা সম্ভব না। তাই বিন্তির কথা বলে রেখেছে। কিন্তু গুটকেকে একা বাড়িতে রেখে যায় কী করে বলতেই মাসি বলেছে, 'ওমা! ও একা বাড়িতে থাকবে ক্যান? অরেও নিয়া যাবি। তোর লগে যাইবে। ওহানে থাকবে। ভালোমন্দ খাইবে। রাতে না হয় আমার ঘরে আমার লগেই থাকবি তরা। দুইটা তো দিন। অসুবিধা হইব না।'

বিন্তিকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, 'আর কি ভাবতাছিস? তরে ওরা মাগনা খাটাইবে না। টাকা পাবি।'

'আমি টাকার কথা ভাবতাছি না।'

'তাইলে?'

'গুটকেটা যা দুষ্টু, অরে সামলামু কি কইরা? হ্যাসে অর লাইগা তোমার বদনাম হইব।'

'হেইয়া নিয়া ভাবিস না। আমি তো আছি।'

বিন্তি বাড়িটা দেখতে পেয়েই বলল, 'গুটকে রে, ওই দেখ বাবুগো বাড়ি। ওইহানে আমরা যামু। ওই যে গুলাপি রং।

গুটকে খুব অবাক হয়ে গেল। বলল, 'মা আমার ভয় করতাছে।'

বিন্তি বলল, 'ভয় পাস ক্যান? আমি তো আছি।'

'কইলাম তো আমি যামু না। আমার ভয় করে।'

'ওহানে তর দিদা আছে। ওহানে আইজ কত খাবার।'

'ভাত খাইতে দিবে? গরম গরম।'

বিন্তি গুটকেকে কাছে টেনে নিল। বলল, 'লোভা একটা। আগে তো চল।'

বিন্তির নিজেরও কেমন ভয় করছিল। গুটকের হাতটা ধরে রাখার জন্যই মনে সাহস পেল।

মাসি এল। বলল, 'কহন থিকা ভাবতাছি। আয়।'

একা হয়ে গেল গুটকে। অনেকক্ষণ হল মাকে দেখতে পাচ্ছে না। তার একটু একটু খিদে পাচ্ছে। রাতে খাবার সময় যখন সে আরও একটু চাইছিল মা বলছিল, 'এহন আর এগুলান খাইস না। যে বাড়িতে কাইল যামু তর দিদা কইছে ওহানে খাওনের অভাব নাই।'

চারিদিকে যত দেখছে অবাক হয়ে যাচ্ছে গুটকে। কেমন বাড়ি! এখানে লোকেরা থাকে! ঝড়ের সময় নিজেদের বাড়িটা ভেঙে যাওয়ার ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। দিদার বাড়িটা ভালো লাগে গুটকের। তবে এইরকম বাড়ি কখনো দেখেনি সে। তার দশ বছরের ছোট্টো জীবনে এই প্রথম খুব আশ্চর্য হওয়া! কেমন থতমত খেয়ে গেল। মনে হল একটা আশ্রয় প্রয়োজন। এই সময়ে মায়ের কথা মনে হল তার। মা ছাড়া এই ঘোর বিস্ময়ের বিপদে অন্য কেউ তাকে অভয় দিতে পারবে না।

কয়েকজন ছেলেমেয়ে হইচই করতে করতে একটা ঘরে ঢুকল। গুটকে গুটি গুটি পায় ওই ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সবার হাতে মোবাইল। মায়ের মতো না। অন্যরকম। মা তো ওই মোবাইল দিয়ে আর কথা বলতে পারে না। এক-একজন নিজেদের মোবাইল অন্যকে দেখিয়ে কথা বলছিল। হেসে উঠছিল। একজন দরজার দিকে তাকাতেই গুটকে সরে গেল। গুটকেকে কেউ দেখতে পায়নি।

সে অন্য একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল। সেখানে যারা গল্প করছিল, হাসছিল, কেউ তার মায়ের মতো নয়। মাকে ভালো লাগে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর খেতে ইচ্ছা করে।

ঘরে যারা কথা বলছে তারা সবাই যখন হেসে উঠছে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে গুটকের মনে হল, তার মা যদি এরকম করে ওদের মতো হাসতে পারত, তবে কী ভালো হত! মা কতদিন হাসে না।

মায়ের কাছে গুটকে গল্প শুনেছে রাজপ্রাসাদের। রাজপুত্র,রাজকন্যা, রাজা, রানিদের। গল্প শুনতে গিয়ে সে বারবার জানতে চেয়েছে রাজপুত্র রাজকন্যা মানে কী। কেমন দেখতে তারা। কেমন দেখতে রাজাকে। রানিকে। মা যতটুকু বলেছে তাতে সব বুঝতে পারেনি গুটকে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন ঘুমাবার সময় গুটকে মাকে বলেছে, 'সব ভালো কইরা কইতে পার না তুমি।'

'আমি কি আর অত জানি? ছোটোবেলায় মায়ের কাছে গল্প শুনছি যা মনে আছে তাই তরে কইছি।'

'তোমার মা তোমারে গল্প কইতো? তুমি রাজকন্যা রাজপুত্র দেখছ মা?'

'না।'

'রাজকন্যা কেমন হয়?'

'জানি না।'

'রাজা-রানি দেখছ?'

'না। আমি কিছুই দেহি নাই। এহন ঘুমা। খালি বকর বকর।'

গুটকের মনে হল সে আজ দেখল রাজপুত্র-রাজকন্যাদের। রানিদেরও দেখল।

তাদের নিজেদের বাড়ি জলের তলায় ভেঙে পড়ে থাকতে দেখেছে। দিদার বাড়ির এক চিলতে উঠোনটা তার দুনিয়া। পুকুরে ডুবে যাচ্ছিল সে। মাছেরা কী সুন্দর! ওরা তো জলে ডুবেই থাকে। ওদের কিছু হয় না!

মাঝে মাঝে গুটকে ভাবে ও যদি হাঁসের মতো সাঁতার কাটতে পারত, ওদের মতো জলে ভেসে থাকতে পারত তাহলে কত মজা হত। উঠোন ছাড়িয়ে জলেও তার একটু জায়গা হত।

ওই এক চিলতে উঠোনে কুড়িয়ে পাওয়া সাইকেলের টায়ার চলতে চায় না। বার বার নেতিয়ে পড়ে যায়।

আর-একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গুটকে দেখল কয়েকজন বসে কথা বলছে।

একজন বলল, 'শুনলাম তুই নাকি ত্রাণ বিলি করতে গিয়েছিলি?'

'ওই আর কী!'

অন্য একজন বলল, 'ওকে যেতেই হবে। সেই কবে বিপ্লবের টিপ কপালে দিয়েছিল। সেটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়।'

যাকে এই কথা বলল সে হো হো করে হেসে উঠল। বলল,'আসলে কী জানিস, সবাই তো বলছে আবার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা চলছে। ঘুরে যদি একবার দাঁড়িয়ে যায় তখন তো করে-কম্মে খেতে হবে। তাই একটু টাচ রাখা। তবে যা খেলা খেলেছিস তোরা, সত্যি কামাল করে দিয়েছিস। ফক্কিবাজির একটা সীমা থাকে।'

প্রথমজন বলল, 'খেলায় বাইচান্স গোলটা হয়ে গেছে। হওয়ার কথা ছিল না। বার বার আর কোনো ঘুঘু এইভাবে ধান খেতে পারবে না।' একসঙ্গে হেসে উঠল ওরা।

কী বলছে সবাই কিছু বুঝতে পারল না গুটকে। তার মনে হল এসব বোধহয় রাজাদের কথা।

বেলা হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে খিদে পাচ্ছে তার। সে বুঝতে পারছে না মা কোথায়। তার যে খিদে পাচ্ছে একথা মাকে ছাড়া আর কাকে বলবে! সে আবার গেল রানিদের ঘরের সামনে।

এখানে কি মা একবারও আসবে না! ঘরের ভিতর তাকিয়ে দেখল ওখানে সবাই আগের মতোই কথা বলছে। হাসছে। এখানে খিদের কথা বলা যায় না।

গুটকে ভাবল একদিন সে তার মাকে বলবে ওই ভাবে হাসতে।

মা বলেছিল,'ওহানে গেলে কিন্তু ভালো ছেলে হইয়া থাকবি। দুষ্টুমি করবি না।'

গুটকের মনে পড়ল সাইকেলের টায়ারটার কথা। সে একদিন ওটাকে উঠোনে ঠিক সোজা করে চালাবে। তারপর রাস্তায়। সেখান থেকে সে চলে যাবে অনেক দূরে। দূরে কোথায়? আর ভাবতে পারে না গুটকে। দূর মানে কতটা সে কিছু জানে না।

আবার এসে দাঁড়াল রাজপুত্র-রাজকন্যাদের ঘরের সামনে। একজন বলল, 'আমার এই একই রকম খেলা আর ভালো লাগছে না। কবে যে ফাইভ জি আসবে।'

'তুই কোথায় পড়ে আছিস ভাই। টেন জির কথা ভাব। তখন দেখবি ঘরে বসেই মহাকাশে ঘুরে বেড়াতে পারবি।'

কথাটা বলে সে দু-হাত ছড়িয়ে ভেসে বেড়ানোর মতো ঘুরতে ঘুরতে বলল, 'এইভাবে।'

আরেকজন বলল, 'আমি বোর হয়ে গেছি। কোনো একটা নতুন খেলার কথা বলতে পারবি কেউ?'

একজন রাজকন্যা বলল, 'আমি একটা খেলা জানি। তোরা খেলবি?'

সবাই বলল, 'খেলব। বল কেমন খেলা।'

রাজকন্যা একজন রাজপুত্রকে সামনে দাঁড় করাল। বলল,'এই খেলায় চোখ খুলে রাখতে হবে। চোখের পলক ফেললেই কিন্তু আউট।'

সবাই বলল, 'ঠিক আছে।'

রাজকন্যা সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রাজপুত্রকে বলল,'এতগুলি ভাত খাবি?'

রাজপুত্র বলল, 'হ্যাঁ।'

'জঙ্গলে বাঘ মারতে যাবি?'

'হ্যাঁ।'

'বাঘ দেখে ভয় পাবি না তো?'

রাজপুত্র বলল, 'না।'

রাজকন্যা তার হাত নিয়ে রাজপুত্রের চোখের সামনে নাড়াল।

রাজপুত্র চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলক ফেলল সে।

সবাই চিৎকার করে উঠল, 'আউট। হেরে গেছে হেরে গেছে।'

সবাই এই খেলাটা খেলতে চাইল। একজনও জিততে পারল না। এমনকি রাজকন্যাও।

ভাত খাওয়ার কথা একটানা শুনতে শুনতে গুটকের পেট কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। তার মনে হল পেটের ভিতরের খিদেটা যেন তাকে গিলতে আসছে। এ বাড়ির রান্নাঘরটা কোথায়। সেখানে হয়ত মাকে পাওয়া যাবে।

তখনই একজন রাজপুত্র ওকে ধরে ফেলল। ঘরে নিয়ে বলল, 'তুই কে?'

'আমি কেউ না।'

'অদ্ভুত মজার তো! বলছে আমি কেউ না।' হাসতে হাসতে বলল, 'এখানে কী করছিস?'

'তোমাগো খেলা দেখতে আছিলাম।'

একজন হেসে উঠল। বলল, 'কেমন করে কথা বলছে দেখ।'

রাজকন্যা বলল, 'তুমি খেলবে?'

একজন রাজপুত্র বলল, 'ওকে খেলতে নিবি? কোথাকার কোন এলেবেলে একটা।'

অন্য একজন রাজপুত্রর বলল, 'খেলুক না। আমরা বোর হয়ে যাচ্ছি, বরং ওকে নিয়ে সবাই মিলে মজা করি।'

রাজকন্যা গুটককে নিয়ে দাঁড় করাল। বলল, 'এতগুলি ভাত খাবি?'

রাজকন্যার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলেই বলতে লাগল। এতগুলি ভাত খাবি? 'এতগুলি ভাত খাবি?'

ভাতের কথা শুনে কেমন হয়ে গেল গুটকের মাথা। পেটের ভিতরে খিদে কেমন তোলপাড় করছে। কতদিন ধরে ভাত খাওয়ার কথা ভাবে সে। তাকে জিজ্ঞাসা করছে ভাত খাবে কিনা? ভাত তাকে খেতেই হবে। গুটকে বলল, 'হ্যাঁ।'

'জঙ্গলে বাঘ মারতে যাবি?' কথাটা সবাই মিলে বলতে লাগল।

বাঘ মারতে গেলে যদি ভাত খেতে পাওয়া যায় তবে যাবে

না কেন? গুটকে সবার দিকে তাকাল। কেমন জেদ চেপে গেল তার। বলল,'হ্যাঁ।'

'বাঘ দেখে ভয় পাবি না তো?' রাজকন্যা বলল। আবার সবাই মিলে ওই একই কথা বলে যাচ্ছে। গুটকের মনে হল চারিদিকে টিটকিরির মতো ছড়িয়ে পড়ছে ওদের কথাগুলি।

গুটকে বলল,'না।'

রাজকন্যার হাতের আঙুলগুলি ডানা ঝাপটানোর মতো গুটকের চোখের সামনে নড়ছে। চোখের পলক পড়ল না গুটকের।

যারা ওখানে ছিল কেউ মেনে নিতে পারল না। সবাই হেরে যাবে একটা এলেবেলে ছেলের কাছে! সবাই এগিয়ে এসে গুটকের চোখের সামনে হাত নাড়তে লাগল।

বাঘ কেমন জানে না গুটকে। মনে হয় খুব ভয়ের। তা না হলে সবাই ভয় পাবে কেন? গুটকের মনে হল যাকে কখনো দেখেনি তাকে ভয় পাবে কেন? তার খুব খিদে পায়। খিদের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না সে। গুটকের মনে হয় এই খিদেটা যেন তাকেই খেতে চায়। বাঘ কি এই খিদের চাইতেও ভয়ঙ্কর?

খিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে রোজ বেঁচে থাকতে থেকে হয় গুটককে। দরকার হলে সে বাঘের সঙ্গেও যুদ্ধ করবে।

রাজকন্যা ও রাজপুত্ররা সবাই মিলে আঙুল নাড়াচ্ছে গুটকের চোখের সামনে। চাইছে গুটকে চোখের পলক ফেলুক। ওই এলেবেলে ছেলেটা ভয় পাক।

গুটকে ঠিক করেছে সে কিছুতেই বাঘকে ভয় পাবে না। ভয় পেলে সে ভাত খেতে পারবে না।

রাজপুত্র-রাজকন্যারা সবাই মিলে তাকে ভয় দেখাতে দেখাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

সে কিছুতেই হারবে না। ভাত খাওয়ার জন্য সে যে কোনো লড়াই করতে প্রস্তুত।

যদি ভাত না পায় এই ভয়ে গুটকে চোখ টান টান করে রইল।

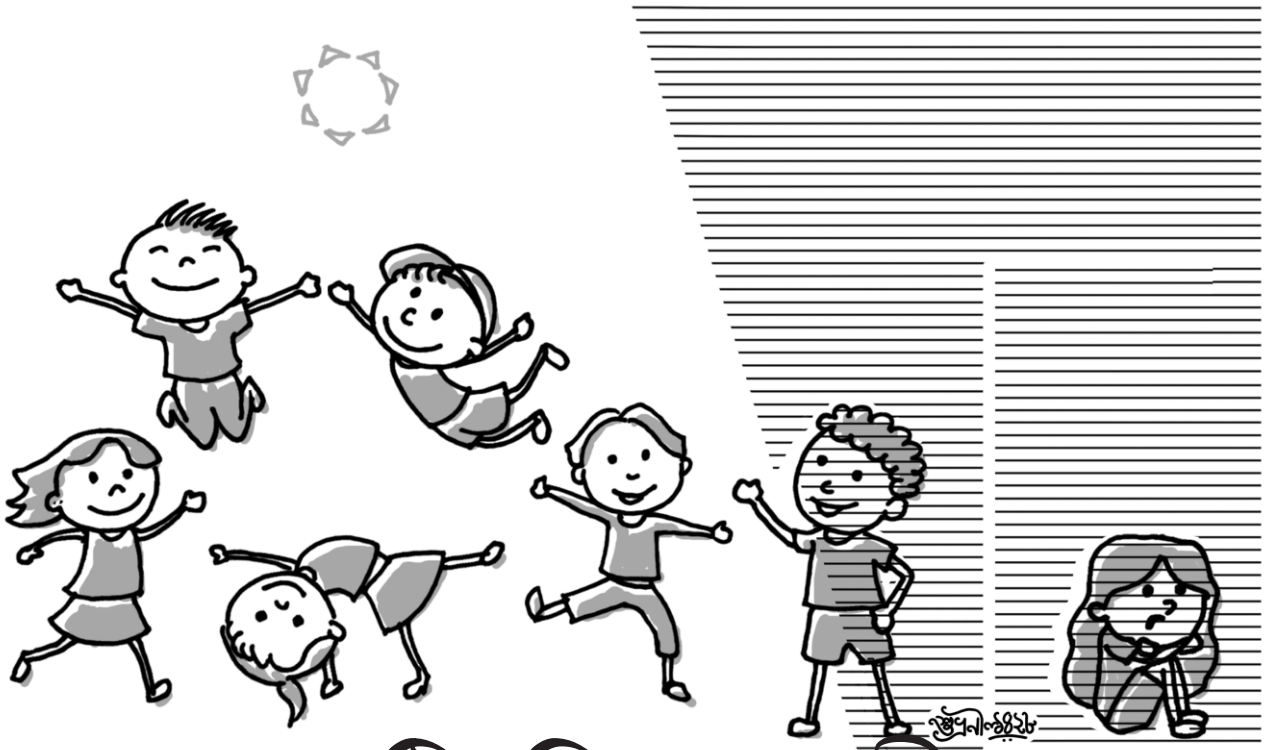

একটি দিনের গ্রীষ্ম

রে ব্র্যাডবুরি

অনুবাদ : ময়ূরাক্ষী দাস

সেই একটি দিনের কথা। সাত বছরে একটি দিন। পুরোটাও নয় শুধু আধ ঘন্টা।

' সবাই আছো তো ?'

'হ্যাঁ আছি ।'

সবকটা শিশু একত্র হয়ে জানলার দিকে গিয়ে আকাশের দিকে উত্তেজনা নিয়ে তাকিয়ে রইল। দেখে মনে হচ্ছিল এক গোছা ফুল যেন একসঙ্গে মিশে আছে ।

সাত বছর ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে । থামার কোনো লক্ষণ নেই, কিন্তু বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বলেছেন যে আজ সূর্য আধ ঘণ্টার জন্য দেখা যেতে পারে ।

এটি হল শুক্রগ্রহ। এখানে সাত বছরে দুঘণ্টার জন্য সূর্যের দর্শন পাওয়া যায়। এখানে যতগুলো শিশু থাকে তাদের বয়স হল নয়। তারা প্রথম সূর্য দেখে যখন তাদের বয়স দুই, তাই তাদের কিচ্ছু মনে নেই।

হঠাৎ করেই কলরব ওঠে , 'থামছে , থামছে... '

- 'হ্যাঁ হ্যাঁ...'

এর মধ্যে একটি মেয়ে ছিল যার নাম হল মার্গট । সে

প্রথমে পৃথিবীতে থাকত, ওহিওতে । যখন তার বয়স চার তখন সে এখানে অসে । তার স্মৃতিতে কিছুটা হলেও সূর্যের ছবি আছে ।
সবাই যখন উত্তেজিত হয়ে জানালার দিকে গেল সূর্য দর্শনের আশায়, তখন সে সবার থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে খুব চুপচাপ প্রকৃতির । কারুর সঙ্গে বেশি কথা বলে না। শুক্রগ্রহের বৃষ্টি তাকে বিরক্ত করে তুলেছে । সে শাওয়ারের জলে স্নান করতেই রীতিমতো আপত্তি করত আর বলত যে, শাওয়ারের জলের আওয়াজ যেন তার কানে না পৌঁছয় আর সে ই জল যেন তার মাথায় না লাগে ।
আগের দিন ওরা সারাক্ষণ সূর্যের ব্যাপারে আলোচনা করেছে । অনেকে কবিতাও লেখে । মার্গটও এরকমই একটা কবিতা লেখে , 'আই থি ঙ্ক দা সান ইজ লাইক আ ফ্লাওয়ার, দ্যাট অনলি ব্লুমস ফর জাস্ট ওয়ান আওয়ার।' অর্থাৎ ,
সূর্য এমন একটি ফুল যে টা কি না ফোটে শুধু এক ঘণ্টার জন্য।
'ওরে বাবা,তুমি এটা লিখতে পারো না...'
একটি ছেলে ওর কবিতায় আপত্তি করল।
'আমি লিখেছি যখন, আমি লিখেছি ব্যাস।'
মার্গট উত্তর দেয়।
- 'ওয়িল্লিয়াম!!'
শিক্ষক ছেলেটির নাম ধরে ডেকে জোর ধমক দিলেন।

এতক্ষণ যা বললাম এগুলো হল সব আগের দিনের ঘটনা। আজ সকাল থেকে বৃষ্টির পরিমাণ অনেক কমেছে । সেই জন্য সবাই জানলার দিকে চেয়ে অপেক্ষায় বসে আছে । কিন্তু মার্গট সবার থেকে আলাদা । তার চোখের উজ্জ্বল ভাব নিভে এসেছে, যেন মনে হয় একটি পুরনো ধুলো পড়া ছবি , যার সমস্ত সৌন্দর্য মুছে গেছে ।
'দিদিমণি কোথায়?'
'উনি কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন।'
'তাই যেন হয় নাহলে আমরা সূর্য দেখতে পাব না।'
এইসময়
'কী করছ মার্গট ?' ওয়িল্লিয়াম তাকে জিজ্ঞেস করল।
মার্গট চুপ করে রইল, কোনো উত্তর দিল না।
- 'জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দাও।' এই বলে ওয়িল্লিয়াম মার্গটকে ধাক্কা দেয়।
মার্গট তা-ও কোনো কথা বলে না।
ও এরমই ছিল। কেউ ওকে ছুঁয়ে পালালে ও কিছুই বলত না বা তাড়া করত না। চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত। এই রকম স্বভাবের জন্য সবাই ওকে আলাদা নজরে দেখত।
ওকে যখন শিক্ষক প্রশ্ন করেছিলেন, 'বলো তো সূর্য কেমন দেখতে ?'
'ওটা একটা পয়সার মতন দেখতে ...' মার্গট বলেছিল।
' না একদম নয়।' বাকি শিশুরা মানতে চায়নি ।
' ... যেন একটা আগুনের গোলা, যেন জ্বলন্ত উনুন।' ও না থেমে বলেই চলেছিল।
' তুমি ভুল বলছ, তোমার কিছু মনে নেই।' সবাই বলে উঠেছিল সমস্বরে !
মার্গট তাদের কথার কোনো প্রতিবাদ করেনি । চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

মাঝে কথা উঠেছিল যে পৃথিবী থেকে ওর বাবা মা এসে ওকে নিয়ে যাবে !
এটাতে ওদের অনেক কোটি টাকা লোকসান হবে । এই ব্যাপারটার জন্য সবাই ওকে নিয়ে ইয়ার্কি ঠাট্টা করত। হঠাৎ, যখন সকলের সঙ্গে মার্গটও অপেক্ষায় আছে বৃষ্টি থামার পর সূর্য দেখবে বলে , ঠিক তখনই একটি ছেলে ওকে ধাক্কা দিয়ে বলল, ' চলে যাও, কিসের অপেক্ষা করছ?'
এই সময় প্রথম সে ফিরে তাকাল।
' দেখো, এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই। তাই, চলে যাও। কিছু হবে না আজ।
সব মিথ্যে । আজ কিছু ঘটবে না। তাই না !!' একটি ছেলে বলল , আর বাকি সবাই চুপ করে থাকল।
' কিন্তু আজই তো সেই দিন যেদিনে বিজ্ঞানীরা বলেছেন সূর্য দেখা যাবে দুঘণ্টার জন্য। এটা...' মার্গট বলছিল, কিন্তু ছেলেটি ওকে থামিয়ে দিল।
' ধুরর... সব মি থ্যে । চল সবাই, এই অদ্ভুত মেয়েটাকে আলমারির পেছনে আটকে দিই !'
' না না !!' মার্গট বাধা দিল, কি ন্তু ওর কথা না শুনে সবাই ওকে আলমারির পেছনে আটকে রেখে পালিয়ে গেল ।
' সবাই তৈরি তো ?'
দিদিম তাঁর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন ।
'হ্যাঁ!'
সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উত্তর দিল।
'আমাদের সবাই এখানে আছি তো ?' দিদিমনি আবার প্রশ্ন করলেন
' হ্যাঁ ' আবার সমস্বরে উত্তর এল ।
' মনে রেখো, তোমাদের কছে শুধু দুঘন্টা সময় আছে

।'

' ঠিক আছে দিদিমনি।'

আস্তে আস্তে বৃষ্টি থামল। সবার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সূর্য উঠল যেন সোনালি রঙের একটি বিশাল বল ! সবাই দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

' বেশি দূর যেও না, মনে রেখো মাত্র দু-ঘন্টা কিন্তু !! ঠিক সময় না ফিরতে পারলে বাইরে আটকে যাবে কিন্তু !!'

দিদিমনি সাবধান করে দেন আবারও।

সবাই খুব মজা করে । নিজেদের কোট খুলে গা-হাতপায়ে রোদ মাখতে লেগে যায় ।

- ' লম্ফের থেকে অনেক ভালো !"

একজন বলল, আর বাকিরাও তার কথায় সম্মতি জানিয়ে বলে উঠল ' অনেক, অনেক ভালো ।"

সবায় দৌড়ে দৌড়ে খেলা করে । কখনো লুকোচুরি , কখনো ছোঁয়াছুঁয়ি ইত্যাদি ।

হঠাৎ

' সবাই দাঁড়াও।' একটি মেয়ে বলল।

তারপর তার হাত বাড়িয়ে দেয় , আর দেখে তার মধ্যে বৃষ্টির একটা ফোঁটা।

সবাই দৌড়ে ফিরতে শুরু করে , বৃষ্টি আবার শুরু হয়ে যাচ্ছে !

' তাহলে কি আবার সাত বছর ?' একজন বলে ।

' হ্যাঁ, আবার সেই সাত বছর পর।'

'কিন্তু মার্গট কোথায় ? ওকে তো দেখছি না ! "

একজনের হঠাৎ খেয়াল হল।

' ওকে তো বন্ধ করে দিয়েছিলাম, ও তো বেরোতেই পারেনি !"

বলল আরেক জন । মাথা নিচু করে ।

সবাই মিলে ওকে দরজা খুলে বের করল। সবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আছে ওর কথা ভেবে ।

' তাহলে ...' একটি মেয়ে বলল , তার খুব খারাপ লাগছিল মার্গটের জন্য ।

মার্গট শুধু একটু হাসল , তারপর ওদের মধ্যে থেকে চলে গেল।

মূল কাহিনি : রে ব্র্যাডবুরি-র 'অল সামার ইন এ ডে'

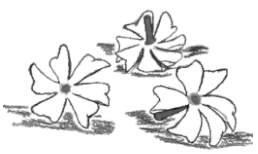

বাতাসপুর

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

লোকটা সরু চোখে বিলুর দিকে তাকাল। বিলু বুঝতে পারল, লোকটা তাকে জরিপ করছে। জরিপ করারই কথা। এরকম ভরদুপুরে কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ একজন অচেনা মানুষ যদি সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলে সন্দেহ তো একটু হবেই। তার ওপর বিলু এই জায়গাটায় আজকেই প্রথম এল। বলতে গেলে, হঠাৎ করেই এসে পড়ল। সরু চোখের লোকটা যেমন বিলুকে দেখছিল, তেমনই বিলুও লোকটার আপাদমস্তক নজর করছিল। লোকটার বয়স কত বোঝা যায় না। তবে, আন্দাজ চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ হবে। দরকচ্চা মারা ফঙ্গবেনে গোছের চেহারা। গালে দু-তিনদিনের না কামানো দাড়ি। পরনে রঙ চটে যাওয়া একটা হলুদ রঙের পাঞ্জাবি আর আধময়লা পাজামা। দেখলেই বোঝা যায় লোকটা কাঠ বেকার। সারা জীবন প্রত্যাখ্যাত হওয়া একটা মানুষ যেন। কিছু কিছু মানুষ হয়ই এরকম। সারা জীবন সব জায়গা থেকে প্রত্যাখ্যাত হতে হতে এক নির্বিকার ভাব এসে যায় তাদের ভিতর। এ পৃথিবীর কোনো কিছুই আর তখন তাদের স্পর্শ করে না। তখন তাদের দেখলে মনে হয়, এ পৃথিবীতে তারা নিছকই কয়েকটা দিন ছুটি কাটাতে এসেছে। আসলে তারা এ পৃথিবীর কেউ নয়ই। লোকটার আপাদমস্তক দেখতে দেখতে সেরকমই মনে হচ্ছিল বিলুর। লোকটা সরু চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে কী ভাবছিল তা বিলু বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ করেই লোকটাকে বিলু নজর করেছিল। আসলে বোলপুর থেকে আমোদপুরে যাওয়ার জন্য বাসে উঠেছিল বিলু। ও যে আমোদপুরে যাচ্ছিল তাও নয়। কোথায় যে যাবে—সেরকম কিছুই ঠিক করা ছিল না বিলুর। নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য ছিল না। বাসে ওঠার সময় বিলু শুনেছিল কন্ডাক্টার চেঁচাচ্ছে—বোলপুর—আমোদপুর, বোলপুর— আমোদপুর। সেই শুনে আমোদপুরের একটা টিকিট কেটে ফেলেছিল বিলু। এখন আশ্বিনের গোড়ার দিক। বর্ষা ধরে এসেছে। মাঠ একেবারে সবুজে সবুজ। নীল আকাশে এক ধরনের উচ্ছলতা এখন। বাসে জানলার ধারে বসার একটা জায়গাও পেয়ে গিয়েছিল বিলু। পাশে একটা কেজো গোছের লোক বসে মোবাইলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছিল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি বিলু। বরং জানলা দিয়ে সে মাঠঘাট দেখছিল। বর্ষা চলে গেলেও কোনো কোনো দীঘিতে এখনো বর্ষার জল টলটল করছে। ছেলে-ছোকরারা সাঁতার কাটছিল সে জলে। বেশ লাগছিল বিলুর এসব দেখতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিলুর আমোদপুর যাওয়া হল না। তার আগেই, মাঝপথে, এই নাম না জানা জায়গাটায় নেমে পড়ল সে। দুটো হাটুরে গোছের লোককে নামতে দেখে বিলুও তড়িঘড়ি নেমে পড়েছিল এ জায়গাটায়। বাস থেকে নেমে হাটুরে গোছের লোকদুটি নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে পিচ রাস্তার পাশে লাল সুড়কির পথ ধরে হাঁটা দিয়েছিল। এ পথ তাদের গাঁয়ের দিকে গেছে বোধকরি। বাস থেকে নেমে

বিলু প্রথমটায় কী করবে বুঝে পাচ্ছিল না। এমনকী কোন জায়গায় নেমেছে, সে জায়গার নাম কী—তাও বিলুর জানা নেই। বাস পিচ রাস্তার ওপর যেখানে তাকে নামিয়ে দিয়ে গেল—সেখানে দু-চারটি দোকানঘর আছে। তবে এই দুপুরবেলা সেগুলি সবই বন্ধ। জনমনিষ্যি নেই চারধারে। আর তখনই এই ফঙ্গবেনে গোছের লোকটাকে নজরে পড়েছিল বিলুর। বন্ধ দোকানগুলির পিছনে একটা মহানিম গাছের তলায় সিমেন্টে বাঁধানো চাতাল। ফঙ্গবেনে গোছের লোকটা ওই চাতালে বসে দূরে মাঠের দিকে উদাস হয়ে তাকিয়েছিল।

সরু চোখে বিলুকে বেশ খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে লোকটা জিগ্যেস করল—কোত্থেকে আসা হচ্ছে? এদিকে আগে দেখিনি তো কখনো। গলায় বেশ একটা গাম্ভীর্য এনে জিগ্যেস করল লোকটা। কিন্তু বিলু বুঝল, এ গাম্ভীর্য আরোপিত। আসলে লোকটা গম্ভীর নয়। এ-ও হচ্ছে মানুষের এক ধরনের স্বভাব। অচেনা মানুষজনের সামনে খামোকা গম্ভীর সাজা।

বিলু হাসি হাসি মুখে লোকটার দিকে তাকাল। বলল—আজ্ঞে না। এদিকে আসিনি কখনো। তা, এই জায়গাটার নাম কী?

লোকটার ভুরু আবার কুঁচকে গেল। গলায় গাম্ভীর্য এনে বলল—অ! জায়গাটার নামই জানেন না, এমনি এমনি চলে এলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ। এমনি এমনিই। বাসে চেপে আমোদপুরের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কী মনে হল এখানে নেমে পড়লাম।

লোকটা চোখ বুজে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবল। হয়তো বুঝতে চেষ্টা করল বিলু কী বলতে চাইছে। তারপর চোখ খুলে বলল—দক্ষিণে বোলপুর, উত্তরে আমোদপুর, মাঝখানে এই বাতাসপুর।

বাতাসপুর! বাহ্ বেশ সুন্দর নাম তো। এরকম নাম আগে কখনো তো শুনিনি।

কত কী-ই তো আপনি শোনেননি। আমিই কি সব কিছু শুনেছি? না, দেখেছি সবকিছু? তা, এখানে কার বাড়ি যাবেন আপনি?

কারো বাড়িতে তো যাব না।

অ, এমনি ঘুরতেও এসেছেন। তা খামোকা এখানে ঘুরতে এলেন কেন?

আসলে ঠিক ঘুরতে নয়...বিলু একটু ইতস্তত করে। তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে গলাটা যথাসম্ভব নরম করে বলে—একটু বসব এখানে?

ফঙ্গবেনে গোছের লোকটা শশব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে—বসুন, বসুন। বসবেন না কেন? বলতে বলতেই হাত দিয়ে চাতালের ধুলো ঝাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বিলু বসে। লোকটার পাশেই বসে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে কিছুক্ষণ। সামনে ধু-ধু পিচ রাস্তা আমোদপুরের দিকে চলে গেছে। দু-পাশে বিস্তীর্ণ ধান খেত। তার মাঝখান দিয়ে লাল সুরকির রাস্তা চলে গেছে গ্রামের দিকে। কিছু দূরে কয়েকটি তালগাছের আড়ালে গ্রামের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে দুটো ঘুঘু একটানা ডেকে যাচ্ছে। ঘুঘুর এই ডাক দুপুরের নিস্তব্ধতাকে আরো প্রগাঢ় করেছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট লোকটার দিকে এগিয়ে ধরল বিলু। এবার বিলুর দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা। বিলু লক্ষ করল, লোকটার দাঁতের পাটিতে বাদামি ছোপ। সিগারেটটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর বলল—অনেকদিন সিগারেট খাইনি। আমি তো এমনিতে বিড়িই খাই। তা-ও রোজ না। যেদিন দু-চারটে পয়সা জোটে।

এবার বিলুর একটু মায়া হল। সিগারেটের প্যাকেটটা লোকটার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—আপনি রাখুন এটা। আমার কাছে আরো দুটো প্যাকেট আছে।

নিমেষে সিগারেটের প্যাকেটা নিজের রঙ চটা পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল লোকটা। তারপর বিলুর দিকে ফিরে, এবার কিছুটা আদুরে গলাতেই জিগ্যেস করল—ও মশাই, আপনার নামটা কী?

বিলু।

বিলু? বাহ্ বেশ বেশ। ছোটো নাম। ডাকতে সুবিধে।

আর আপনার নামটা কী?

ধুর মশাই, নামে কি যায় আসে কিছু। আপনি চড়ুই পাখিকে শালিখ বলে ডাকুন না, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে? এই আমাকে আপনি ধনঞ্জয় বা পরাশর বা রামপ্রসাদ নামে ডাকুন না। যে কোনো একটা নামে ডাকলেই তো হল।

বিলুর বেশ মজা লাগল লোকটার কথা শুনে। লোকটা একটু পাগল গোছের মনে হচ্ছে। তবে কথাগুলো বেশ রসিয়ে বলে। কেমন বলল—দক্ষিণে বোলপুর, উত্তরে আমোদপুর, আর এই মাঝখানে বাতাসপুর। বিলু গলাটা একটু নরম করে বলল—আপনি কি এখানেই থাকেন?

হ্যাঁ। তা যদি বলেন তাহলে এখানেই থাকি। আসলে কোথাও একটা থাকতে হবে তো। সেইরকম আর কী। আপনি?

আমি কলকাতায়।

কলকাতা? সে তো অনেক দূর। আমি যাইনি কখনো। তবে একদিন যাব। মোটরগাড়ি চেপে যাব।

মোটরগাড়ি চেপে যাবেন? কার মোটরগাড়ি?

লোকটা এবার হেঁ হেঁ করে হাসে। বলে—মোটরগাড়ি চড়া এমন কী কঠিন কাজ বলুন। চোখ বুজে শুয়ে পড়ুন না এই

চাতালের ওপর। তারপর মনে মনে ভাবুন না আপনি মোটরগাড়ি চেপেছেন। দেখবেন, মনে হবে, সত্যি সত্যি আপনি মোটরগাড়িতেই চেপে ঘুরছেন। আমার তো যখন যা করতে ইচ্ছে হয়, তখন চোখ বুঝে চাতালের ওপর শুয়ে পড়ি। আর, কী আশ্চর্য, মনে হয় ঠিক তাই করছি। এই দেখুন না, কাল সাঁঝের ঝোঁকে হঠাৎ ইচ্ছে হচ্ছিল পদ্মকে একটু চুমু খাই। যেই না ভেবেছি...থাক সে কথা আর আপনাকে বলব না।

লোকটা সত্যিই পাগল। পাগল না হলেও আধপাগল তো বটেই। কী বলছে, না বলছে, কোনো খেয়াল নেই লোকটার। বিলুর বেশ মজাই লাগতে থাকে। কিছুটা প্রশ্রয়ের সুরেই জিগ্যেস করে—ওই যাকে চুমু খাবেন ভেবেছিলেন, পদ্ম—সে কে?

কে আবার? আমার বউ। আমি কি আর পরস্ত্রীকে চুমু খেতে পারি।

নিজের বউকে চুমু খাবেন সেটা এই চাতালে শুয়ে ভাবছিলেন কেন? ঘরে গিয়ে বউকে চুমু খেয়ে নিলেই তো পারতেন।

আহ্। বউ কি আর ঘরে আছে?

ঘরে নেই? তো কোথায় গেছে বউ?

সে জেনে আপনার কাজ নেই। তা এখন বলুন দিকি, আপনার কোন কাজে এখানে আসা?

বিলু একটা সিগারেট ধরায় ধীরে সুস্থে। ধোঁয়া ছাড়ে একমুখ। তারপর আস্তে আস্তে বলে—আসলে আমি ভ্রমণ কাহিনি লিখি, জানেন তো। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। তারপর সেসব দেশের কথা লিখি। লোকে পড়ে। এরকম লিখতে লিখতে সব জায়গার কথা আমার লেখা হয়ে গেছে। এবার আমি এমন একটা জায়গার কথা লিখতে চাই, যা আগে কেউ কখনো লেখেনি। এক অত্যাশ্চর্য জায়গার কথা লিখতে চাই আমি। সেই জায়গার খোঁজেই আমি বেরিয়ে পড়েছি।

বিলুর কথা শেষ হতে না হতেই লোকটা উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে। বিলুর হাত দুটো খপ করে চেপে ধরে। বলে—ও মশাই, আপনি তো একদম ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছেন। এই বাতাসপুর হচ্ছে সেই জায়গা। এই জায়গার কথা কেউ কখনো লেখেনি। মশাই, এই বাতাসপুরের আনাচে-কানাচে রোমাঞ্চ। আমি এই বাতাসপুরের গল্প আপনাকে শোনাব।

ব ব ব

হরিহর দারোগা লোকটি বড়ো দুঃখী। ঠিক কিসে যে তার দুঃখ হরিহর নিজেও তা জানে না। শুধু মাঝে মধ্যে থেকে থেকেই তার বুকের ভিতর দুঃখ উথলে ওঠে। আর তখনই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে হরিহর। কখন, কোথায়, কীভাবে যে দুঃখ উথলে উঠবে—তা হরিহর নিজেও জানে না। একবার তো ডাকাত ধরতে গিয়ে হরিহরের দুঃখ উথলে উঠল। ডাকাত ধরবে কী, হরিহর তো কেঁদেই আকুল। তবে, কেলেঙ্কারী হয়েছিল বছর দুয়েক আগে। সেবার এস পি সাহেব এসেছিলেন থানা পরিদর্শন করতে। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। থানা পরিদর্শন করে এস পি সাহেব বেশ খুশিও হয়েছিলেন। হঠাৎ, আচমকাই, এস পি সাহেবের সামনে কান্না উথলে উঠেছিল হরিহরের। এস পি সাহেবের সামনে হাপুস নয়নে সে কী কান্না হরিহরের। চেষ্টা হরিহর অনেক করেছিল। কিন্তু কান্না থামাতে পারেনি। শেষমেষ এস পি সাহেব বিরক্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। শোনা যায়, এস পি সাহেব নাকি ওপরতলায় রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, এরকম ছিঁচকাঁদুনে লোককে যেন কোনো থানায় দারোগার চেয়ারে বসানো না হয়। এরকম দুঃখ সেই ছেলেবেলা থেকেই মাঝেমাঝে হরিহরের বুকে উথলে ওঠে। কেন এরকম হয়, তা হরিহর নিজেও জানে না। হরিহর অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু বুকের ভিতর হঠাৎ-হঠাৎ এরকম উথলে ওঠা দুঃখ দূর করতে পারেনি। এমনকী, বাসর রাতেও আচমকাই হরিহরের দুঃখ উথলে উঠেছিল। কেঁদেও ফেলেছিল নতুন বিয়ে করা বউয়ের সামনে। অবশ্য তাতে একটাই লাভ হয়েছে। হরিহরের বউ, এই আজ পর্যন্ত, হরিহরের মনে দুঃখ দিয়ে কোনো কথা বলেনি। আসলে হরিহরের বউ চায় না, হরিহর এরকম যখন-তখন কাঁদুক। দারোগাকে এরকম ছিঁচকাঁদুনে হলে কি মানায়? হরিহরের শ্বশুরমশাইও তো দারোগা ছিল। কী দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল তার। লোকের বাড়ি থেকে কলাটা, মূলোটা, ছাগলটা, মুরগিটা তুলে নিয়ে আসত। কারোর একটু বেয়াদপি দেখলেই ডাণ্ডা মেরে ঠান্ডা করত। রেল লাইনের ধারে খারাপ পাড়ায় যে কোনো মেয়ের ঘরে বিনা পয়সায় ঢুকতে পারত। দারোগা হো তো অ্যায়সা।

তা হরিহর যে দুঃখী মানুষ সেটা বাতাসপুরের সবাই জানে। জানে বলেই হরিহরকে কেউ দুঃখ দিতে চায় না। হরিহরকে দেখলেই সবাই গলা নামিয়ে নরম সুরে কথা বলে। হরিহরের যখন পাঁচবছর বয়স তখন হরিহরের মা মারা গিয়েছিল। বাবার একটি মুদির দোকান ছিল। সন্ধেবেলা দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে বাবা কীর্তনের আসর বসাত। ওই ছেলেবেলায় কীর্তন শুনে খুব দুঃখ হত হরিহরের। বাবার কোলে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ত। মা মরা ছেলে। একটু কান্নাকাটি করলে হরিহরের বাবার মনও নরম হয়ে পড়ত। আজ পাঁচবছর হয়ে গেল বাতাসপুরে থানার বড়বাবুর দায়িত্ব নিয়ে এসেছে হরিহর। হরিহর কারো বাড়ির কলাটা, মূলোটা বা ছাগলটা, মুরগিটা তুলে এনেছে—একথা কেউ বলতে পারবে না। হরিহর কাউকে রুলের গুঁতোও কোনোদিন মারেনি। বরং থানার সামনে এক চিলতে

জমিতে হরিহর কাঠচাঁপা, শিউলি আর রঙ্গন ফুলের গাছ লাগিয়েছে। থানার ভিতর এখন সবসময় রবীন্দ্র সংগীত বাজে। গেল বছর থানার কনস্টেবলরা রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করেছে। সেখানে হরিহর একটা গানও গেয়েছিল। ওই যে—'আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান।' বাতাসপুরের মানুষের বিপদে আপদে হরিহর সবসময়ই পাশে থেকেছে। এই তো চার বছর আগে রামশরণের বউ পোয়াতি হয়ে পড়ল। রামশরণ রেলের লেভেল ক্রসিংয়ে গেট নামায় ওঠায়। সারা বছর খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই রামশরণ এই কাজটা করে। তা রামশরণের বউয়ের যন্ত্রণাটা উঠেছিল মাঝরাত্তিরে। হাসপাতালে নিতে হবে। রামশরণ কোনো উপায় না দেখে ছুটে গিয়েছিল হরিহরের কাছে। পুলিশের জিপে হরিহর রামশরণের বউকে পৌঁছে দিয়েছিল আমোদপুরের হাসপাতালে। তা রামশরণের বউয়ের ব্যথা উঠেছে শুনে হরিহরের বুকেও একটু দুঃখ উথলে উঠেছিল। ফিক করে একটু কেঁদেও নিয়েছিল হরিহর।

আসলে বিষয়টা হচ্ছে, হরিহর এখানকার দারোগা হয়ে আসার পর, বাতাসপুরের লোকগুলোও পালটে গেছে। এখানে এখন কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়া করে না। গলা উঁচু করে কথাও বলে না কেউ। মাতাল নীলমণি আগে রোজ রাতে বউ ঠ্যাঙাত। এখন মদ খায় বটে, কিন্তু বউ ঠেঙায় না। বাতাসপুরের চোরেরাও এখন আর চুরি করে না। বরং বাতাসপুরের চোরেরা এখন বাজারে ওলকপি বিক্রি করে। এসব হওয়ার একটা কারণ, বাতাসপুরের দুঃখী দারোগা হরিহরকে বাতাসপুরের লোকজন দুঃখ দিতে চায় না।

তবে, গেল বছর, বোলপুর থেকে একটা চোর এসে পড়েছিল বাতাসপরে। গাঁয়ের লোকজন অবশ্য ধরে ফেলেছিল তাকে। তবে, সে চোর যে-সে চোর ছিল না। সে ছিল ওস্তাদ চোর। সে নাকি এমন সিঁদ কাটত যেরকম সিঁদ আর কেউ কাটতে পারত না। লোকের নাকের ডগায় চুরি করে পালিয়ে যেতে সে ছিল ওস্তাদ। তো, সেই ওস্তাদ চোর একটাই ভুল করে ফেলেছিল। সে জানত না যে, বাতাসপুরের লোকজন এখন পালটে গেছে। বাতাসপুরের যে দুটো চোর এখন বাজারে ওলকপি বেচে, ওরাই ধরে ফেলেছিল বোলপুরের এই ওস্তাদ চোরকে। আসলে চোর চোরকে সবথেকে ভালো চেনে। ওস্তাদ চোর ধরা পড়ার পর পঞ্চায়েতের বিচারসভা বসল। সব শোনার পর পঞ্চায়েতের প্রধান বলল—এমন গুণী মানুষের গুণের কদরও তো করতে হয়। আহা, এমন পাকা হাতে সিঁদ আর কজনই বা কাটতে পারে, বল? প্রধানের কথা তো অমান্য করা যায় না। তাই গ্রামের লোক ওস্তাদ চোরের গলায় রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে, সানাই আর ঢোল বাজিয়ে তাকে থানায় নিয়ে এসেছিল। হাজির করেছিল হরিহর দারোগার সামনে। চোর তো দারোগার পা জড়িয়ে নিজের দুঃখের সাতকাহন ফেঁদে বসেছিল। তা শুনে হরিহরের বুকে আবার দুঃখ উথলে উঠেছিল। সামলে রাখতে পারেনি হরিহর নিজেকে। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। কাঁদছিল আর বলছিল—'হায়, হায়, আমি কেন দারোগা হলাম গো, আমি কেন দারোগা হলাম।' যারা চোরকে নিয়ে এসেছিল তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল দারোগাকে সামলাতে। অনেক কষ্টে যখন হরিহরের কান্না থামানো গেল, তখন দেখা গেল, টেবিলের ওপর রাখা হরিহরের সাধের কলমটা নিয়ে ওস্তাদ চোর কেটে পড়েছে!

এই অবধি বলে ফঙ্গবেনে গোছের লোকটা বিলুর দিকে তাকিয়ে একটা ফিচেল গোছের হাসি হাসল। বলল—কেমন শুনলেন আমাদের হরিহর দারোগার গল্প!

ভালোই তো। এরকম ছিঁচকাঁদুনে দারোগার কথা আমি কখনো শুনিনি।

শুধু ছিঁচকাঁদুনে বললে হবে। লোকটা বড্ড ভালো তাই কিনা বলুন। না হলে, থানার সামনে কেউ শিউলি গাছ লাগায়!

ঠিক বলছেন। আসলে শিউলি ফুলের সঙ্গে ভালোলাগার কোথাও যেন একটা সম্পর্ক আছে।

হ্যাঁ। এই একই কথা কালকে পদ্মও আমাকে বলেছিল।

কী বলছিল শুনি একটু।

ওই আর কি। বলছিল, হরিহর দারোগা যতদিন আছে, ততদিন বাতাসপুরের মানুষ ভালোমানুষ হয়ে থাকবে। থানার সামনে শিউলি গাছে ফুল ফুটবে। আর যেদিন হরিহর দারোগা বাতাসপুর ছেড়ে চলে যাবে, সেদিন বাতাসপুরের লোকজন আবার খারাপ হয়ে যাবে। থানার সামনে শিউলি গাছেও আর ফুল ফুটবে না।

আপনার বউ, মানে ওই পদ্ম, সে এসব বলছিল বুঝি?

পদ্ম এসব মাঝে মাঝেই বলে। আসলে পদ্ম খুব ভালো মেয়ে, জানেন তো। কাল রাতে আমি আর পদ্ম জড়াজড়ি করে এই চাতালে শুয়েছিলাম। তখন পদ্ম বলছিল এসব কথা।

রাতে বউকে নিয়ে চাতালে শুয়ে ছিলেন? কেন? ঘরে শুতে পারেন না? লোকে দেখলে কী বলবে?

ফঙ্গবেনে লোকটা এবার খিকখিক করে হাসতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ দুলে দুলে হাসার পর বলে—ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। গাঁয়ের মানুষ আমাদের দেখতে পাবে না।

গাঁয়ের লোক দেখতে পাবে না বলে আপনি সারারাত বউকে নিয়ে চাতালে শুয়ে রইলেন!

আহ্। কী করে আপনাকে বোঝাই! পদ্ম তো এখানেই আসে। ঘরে যেতে চায় না। তার ওপর কাল ছিল হাওয়ার রাত। গভীর হাওয়ার রাত। কী এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছিল চতুর্দিকে। এরকম রাতে পদ্ম আরো বেশি করে আসে আমার কাছে।

আশ্চর্য! আপনার বউ ঘরে যেতে চায় না।

না। ঘরে যেতে ওর বড় ভয়। এখানেই আসে। কত আদর করে আমাকে। কত রকমের আদর করে। ও যখন আদর করে আমার শরীর বিবশ হয়ে যায়। এই দেখুন না কাল রাতে... নাহ্ থাক। বলব না আপনাকে। আমার খুব লজ্জা করে। তাছাড়া সব কথা তো পাঁচ কান করা ভালোও নয়।

আমার কিন্তু আপনার বউ, ওই মানে পদ্ম, ওর কথা শুনতে খুব ইচ্ছে করছে।

সে আপনাকে পরে বলব একসময়। এখন একখানা কিচ্ছা শুনবেন নাকি?

বিলুর মুখের দিকে উৎসুকভাবে তাকায় লোকটা।

কিচ্ছা? আপনি কিচ্ছাও শোনান নাকি।

আমি সব শোনাই। আপনি শুনতে চাইলে আমি কিচ্ছাও শোনাব।

বেশ, তাহলে শোনান একটা।

কিচ্ছা মিচ্ছা নাইরকেলের চোঁচ, বাপ না হইতে পুতের আড়াই হাত মোচ। বেশ তাহলে শুনুন একখান কিচ্ছা।

ঁ ঁ ঁ

রামশরণ যখন খুব ছোটো, তখন বাবার সঙ্গে এই বাতাসপুরের দিকে চলে এসেছিল। কেউ কেউ বলে ওরা গয়া থেকে এসেছিল। কেউ কেউ বলে ভাগলপুর। তা সে যেখান থেকেই আসুক, খুব ছেলেবেলায় রামশরণ বাবা-মা-র সঙ্গে এখানে চলে এসেছিল। স্টেশনের কাছে একটা খাপরা ঘরে রামশরণরা থাকত। রামশরণের মা ছিল বেঁটে, মোটা এবং কালো। কপালে বড়ো করে মেটে সিঁদুরের টিপ পরত। স্টেশনে জমাদারনির কাজ করত রামশরণের মা। সকালবেলাই একটা বড়ো বালতি আর ঝাঁটা হাতে নিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ত। রামশরণদের খাপরার ঘরের দেওয়ালে হনুমানজির একটা রঙচঙে ছবি টাঙানো ছিল। বিকেল বিকেল কাজ থেকে ফিরে, স্নান সেরে, পরিষ্কার শাড়ি পরে রামশরণের মা ওই ছবির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করত। এছাড়া রামশরণের মা-র ভিতর আর বিশেষ ভক্তির প্রকাশ দেখেনি কেউ। যখন সন্ধে নামত, তখন ওদের খাপরার ঘরের সামনে একটা কয়লার তোলা উনুনে রামশরণের মা রুটি সেঁকত। কোনো-কোনোদিন ওই তোলা উনুনে মেটে আলু বা বেগুন পোড়াত। বেগুন পোড়ার গন্ধে ম'ম' করত চারদিক। রামশরণদের বাড়িতে কোনো অশান্তি ছিল না। রামশরণের বাবা ছিল নির্বিরোধী মানুষ। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা ছিল। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। ঠোঁটের ওপর একজোড়া পুরুষ্টু গোঁফ। হাসিমুখে কথা বলত সবার সঙ্গে। রামশরণের বাবাকে কেউ কখনো রাগতে দেখেনি। রামশরণের বাবা লোকটা খারাপ ছিল না। কোনো খারাপ দোষও ছিল না তার। তবে মাসে দু-একদিন রেল লাইনের ওপাড়ে যে খারাপ পাড়া আছে সেখানে যেত। আর যেদিন যেত সেদিন একটু আধটু মদও খেত। তবে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে কখনো বউকে পেটায়নি রামশরণের বাবা। বরং সেদিনগুলিতে খাপড়ার ঘরের সামনে বসে ভোজপুরী গান গাইত। এ নিয়ে রামশরণের মা-র একটু গর্বই ছিল। যাদের স্বামীরা মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে বউ পেটায়, সেসব মেয়েদের ডেকে ডেকে রামশরণের মা বলত—মরদকে কী করে বশে রাখতে হয়, সেটা আমার কাছ থেকে শেখ।

স্টেশনের পাশেই একটা ছোট্ট দোকান ছিল রামশরণের বাবার। খাবার দোকান। সকালে পুরি আর তরকারি হত। দুপুরে ভাত, ডাল, রুটি, তরকারি। বেশ চালু ছিল দোকানটা। স্টেশনের লোকেরা সবাই খেত রামশরণের বাবার দোকানে। তবে, স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে খাবারের দাম রামশরণের বাবা কোনোদিন নেয়নি। এই দোকান থেকে যা আয় হত—তাতে খুব একটা খারাপ চলত না ওদের। রামশরণের বাবার খুব ইচ্ছে ছিল রামশরণ রেলের চাকরি করবে। বড়ো অফিসার হবে। অফিসে আসতে যেতে দুবেলা সেলাম ঠুকবে রেলের পুলিশরা। সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে রামশরণের দিকে। এই আশা নিয়ে রামশরণের বাবা বাতাসপুরের একমাত্র প্রাইমারি স্কুলে ভরতি করিয়ে দিয়েছিল রামশরণকে। কিন্তু কয়েকবছর যাবার পরই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল—রামশরণকে দিয়ে পড়াশোনা খুব একটা হবে না। রামশরণের মেধা অত সতেজ নয়। কোনোমতে টেনেটুনে স্কুলে ফাইনালটা পাশ করেছিল রামশরণ। তারপর বাবার দোকানে বসে রুটি বেচত। তবে রামশরণের বাবা হাল ছাড়েনি। রেলের বাবুদের অনেক বলে কয়ে রামশরণকে রেলের একট চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। লেভেল ক্রসিংয়ে গেট বন্ধ করা আর খোলার কাজ। একুশ বছর বয়সে রামশরণ এই কাজে ঢুকেছিল। এখন তার বয়স চৌত্রিশ। এই তেরো বছর ধরে রামশরণ খুব নিষ্ঠা সহকারে লেভেল ক্রসিংয়ে গেট খোলা আর বন্ধ করার কাজ করে যাচ্ছে। আসলে এই কাজটা করতে রামশরণের বেশ ভালো লাগে। যখন গেট বন্ধ করে আর খোলে, তখন নিজেকে বেশ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মনে হয়। তার এই গেট খোলা আর বন্ধ করার ওপর নির্ভর করে এই পৃথিবীটা সচল থাকবে, কি, অচল হয়ে যাবে।

রামশরণের বয়স যখন ছাব্বিশ, তখন রামশরণের বাবা দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিল রামশরণের। গয়া না ভাগলপুর, যেখানে রামশরণদের গ্রাম, ওই গ্রামের মেয়েকেই পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছিল। নতুন টেরিকটের পাঞ্জাবি পরে বিয়ে করতে গিয়েছিল রামশরণ। তারপর একদিন বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে

এসে বাতাসপুর স্টেশনে নামল। তখন রামশরণের ডানহাতে চকচকে নতুন ঘড়ি, বাঁহাতে ফুল লতাপাতা আঁকা নীলরঙা টিনের তোরঙ্গ আর চোখে রোদচশমা। পিছনে কাপড়ের পুটলির মতো জড়োসড়ো লজ্জাবতী বউ। রামশরণের বউয়ের নাম লছমী। প্রথমদিন দেখে লছমীকে যেমন লজ্জাবতী মনে হয়েছিল, লছমী ততটা লজ্জাবতী ছিল না মোটেই। বিয়ের সময় লছমীর বয়স ছিল কুড়ি। এখন আটাশ। লছমীর বউয়ের গায়ের রঙ কালো। কিন্তু সুন্দরী বললে কিছু কম বলা হয়। সুন্দরী তো বটেই, তার ওপর সারা শরীরে লাস্য উছলিয়ে উঠছে। লছমী যখন কোনো পুরুষের দিকে ঠোঁট টিপে তাকায়, তখন সে পুরুষের বুকে ঝড় উঠতে বাধ্য। বিয়ের পর প্রথম ক-দিন লছমী লজ্জাবতী হয়েই ছিল। গলা অবধি ঘোমটায় আড়াল করে রাখত নিজেকে। তবে এত যার লাস্য সে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে কী করে। ধীরে ধীরে লছমী তার লাস্য প্রকাশ করতে শুরু করল। তখন শুধু লছমীকে একবার চোখে দেখার জন্য রামশরণদের খাপড়ার ঘরের সামনে দিয়ে নানা বয়সের পুরুষের হাঁটাচলা বেড়ে গিয়েছিল। লছমী অবশ্য কাউকে নিরাশ করত না। তার এ লাস্য, তার এ সৌন্দর্য—এসবই তো পুরুষের জন্য। তাহলে পুরুষকে নিরাশ করবে কেন সে? তাই লছমী সবার দিকে তাকিয়ে গালে টোল ফেলে মুখ টিপে হাসত। কখনো কখনো হাওয়া না থাকলেও লছমীর বুকের আঁচল হাওয়ায় খসে যেত। কার জন্য কোনটা প্রয়োজন—লছমী জানত ঠিকই।

এমন একজন লাস্যময়ী এবং সুন্দরী বউ পেয়ে রামশরণও বেজায় খুশি হয়েছিল। তার মতো একজন তেমন লেখাপড়া না জানা গ্রাম্য লোকেরও যে এমন বউ জুটতে পারে—এটাই ভাবেনি কখনো রামশরণ। বিয়ের রাতে লছমী যখন ঠোঁট টিপে রামশরণের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল—তখনই রামশরণ বুঝে গিয়েছিল, এই আগুনের আঁচে সে বাকি জীবন দগ্ধ হবে। তবে, লছমী রামশরণকে সুখেই রেখেছিল। তৃপ্ত করেছিল রামশরণকে।

রামশরণের বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ওর বাবা-মা, গয়া না ভাগলপুর, কোথায় যেন, ওদের গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল। বাবা-মা চলে যাওয়ার পর আর একমাস যেতে না যেতেই বাজারের পিছনে টালির চালের একতলা ছোট্ট ঘরে লছমীকে নিয়ে এসে উঠেছিল রামশরণ। আসলে খাপরার ঘরে থাকলে লছমীর রূপের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়—এটা বুঝেছিল রামশরণ। আর টালির চালের ঘরে উঠে এসে লছমীও রামশরণকে আরো বেশি ভালোবেসেছিল। আরো বেশি তৃপ্ত করেছিল রামশরণকে। গভীর রাতে, লছমীর নিত্যনতুন ছলাকলায় তখন এক ধরনের ঘোর লেগে যেত রামশরণের। তবে, লছমী জানত, তার সামনে জয় করার জন্য শুধু রামশরণ নেই, এই বাতাসপুরের তাবৎ পুরুষ মানুষ রয়ে গিয়েছে।

বাতাসপুরে সব থেকে বড় মুদি দোকান চালায় নিমাই পাড়ুই। গলায় কণ্ঠির মালা। থেকে থেকে গেয়ে ওঠে—'যাদবায় মাধবায় যাদবায় নমো।' নিমাই পাড়ুইয়ের চেহারাটা বেশ নাদুস নুদুস, গোলগাল। দাড়ি গোঁফ কামানো মুখ। ঘরে বেশ মোটাসোটা একটা বউ আছে। এছাড়া তিনটে মেয়ে। মেয়ে তিনটেও মায়ের মতোই মোটা। তদুপরি মুখরা। নিমাই জানে এ তিন মেয়ের বিয়ে দেওয়া বেশ ঝঞ্ঝাটের। এ জন্য নিমাই মনে মনে চায় তার মেয়ে তিনটে নিজেরাই পাত্র পছন্দ করে কেটে পড়ুক। কিন্তু চাইলেই তো আর সব হয় না। মোটা এবং মুখরা মেয়েদের পছন্দ করবে এমন ছেলে বাতাসপুরে নেই। নিমাই সব খদ্দেরকেই ওজনে কিছুটা কম মাল দেয়। এটা বহুদিন থেকেই দিয়ে আসছে নিমাই। এখন চেষ্টা করলেও ওজনে ঠিক জিনিস দিতে পারবে না। এছাড়াও নিমাই আর-একটা কারবার করে। বন্ধকী কারবার। এই বাতাসপুর আর তার আশপাশে অভাবী মানুষের তো কমতি নেই। তারা গয়না বন্ধক রেখে নিমাইয়ের কাছ থেকে টাকা নেয়। সে গয়না আর কোনাদিন ছাড়াতে পারে না তারা। নিমাইয়ের সিন্দুক গয়নায় ভরে ওঠে। রোজ রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে নিমাই দেখে কত গয়না জমল তার কাছে। যত দেখে, তত নিমাইয়ের মুখ হাসিতে ভরে ওঠে।

তো, সেবার একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। তার জন্য নিমাই যে খুব প্রস্তুত ছিল এমনও নয়। কিন্তু ঘটে যখন গেলই, নিমাই তাকে বাধা দিতে পারল না। সেদিনটা ছিল ভরা বর্ষার দিন। সকাল থেকেই আকাশ কালো করে কখনো ঝমঝম, কখনো ছিপছিপ বৃষ্টি পড়ছিল বাতাসপুরে। রাস্তায় লোকজনও বেশ কম। দুপুরের দিকে নিমাই যখন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যাবে ভাবছে, ঠিক সেই সময়ই লছমী এসে দাঁড়াল নিমাইয়ের দোকানে। লছমীর চুলে, চিবুকে, গলায়, উন্মুক্ত দুই বাহুতে বৃষ্টির জলকণা লেগে ছিল। ঈষৎ ভেজা শাড়ি শরীরে এঁটে বসেছিল লছমীর। ঘোর লাগা চোখে নিমাই তাকিয়েছিল লছমীর দিকে। এরকম ঘোর লাগা চোখে বাতাসপুরের অনেক পুরুষই লছমীকে দেখে। কিন্তু এরপর যা ঘটল, তা অতীব আশ্চর্যের। হাওয়ায় লছমীর বুকের আঁচল খসে পড়ল। আর তখন নিমাই পাড়ুই এক মুহূর্ত দেরি করল না। লছমীর হাত ধরে দোকানের ভিতর টেনে এনে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর, আকাশে মেঘ যখন গাঢ় হয়ে এসেছে আরো, তখন নিমাইয়ের মুদির দোকান থেকে বেরল লছমী। তার ঠোঁটে এক চিলতে ভুবনমোহিনী হাসি আর দু-হাত ভরতি মুদি দোকানের পশরা। এরপর থেকে মাঝে মাঝেই দুপুরের দিকে, যখন বাতাসপুর নিঝুম, নিস্তব্ধ, একমাত্র ঘুঘু পাখিরা একটানা

ডেকে চলেছে, সেই সময় লছমী এসে হাজির হত নিমাই পাড়ুয়ের দোকানে। আর প্রতিবারই নিমাই হাত ধরে লছমীকে দোকানের ভিতর ঢুকিয়ে নিয়ে ঝাঁপ বন্ধ করে দিত। আর প্রতিবারই লছমী দোকান থেকে বাড়ি ফিরত দু-হাত ভরতি পশরা নিয়ে। সিন্দুক থেকে দুটো সোনার সরু হারও লছমীকে এনে দিয়েছিল নিমাই।

লছমী যখন পোয়াতি হল—রামশরণের সে কি আনন্দ। বোলপুর থেকে লাড্ডু আর পেঁড়া নিয়ে এসেছিল। বাতাসপুরের সবাইকেই পেঁড়া আর লাড্ডু খাইয়েছিল রামশরণ। নিমাই পাড়ুইও বাদ যায়নি। খুশির খবরটা তাকেও শুনিয়েছিল রামশরণ। পোয়াতি হয়ে যাওয়ার পর দুবার লছমী এসেছিল নিমাইয়ের দোকানে। কিন্তু নিমাই আর কখনো লছমীর হাত ধরে টেনে এনে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়নি। বরং, লছমী এসে দাঁড়াতেই নিমাই চোখ বন্ধ করে 'যাদবায় মাধবায় যাদবায় নমো' গেয়েছিল সুর করে।

লছমী আর কখনো যায়নি নিমাইয়ের দোকানে। কিন্তু একদিন সকালে, যখন ভরাভরতি খদ্দের দোকানে, তখন রামশরণ এসে হাজির হয়েছিল। একটিও কথা বলেনি রামশরণ। শুধু অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়েছিল নিমাইয়ের মুখের দিকে। শশব্যস্ত হয়ে পড়েছিল নিমাই। রামশরণের দুহাত ভরতি করে পশরা তুলে দিয়েছিল। এর জন্য কোনো পয়সা নেয়নি নিমাই। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই রামশরণ এসে দাঁড়াত নিমাইয়ের দোকানে। কোনো কথা বলত না। নিমাইও কোনো কথা জিজ্ঞাসা করত না রামশরণকে। শুধু নিঃশব্দে রামশরণের দু-হাত ভরতি করে পশরা তুলে দিত। পয়সা নিত না।

একরাতে লছমীর প্রসব যন্ত্রণা উঠল। আমোদপুরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। রামশরণ গিয়ে ধরল হরিহর দারোগাকে। দারোগা ছিঁচকাঁদুনে হলেও বাতাসপুরের সব মানুষের ভরসা। অত রাতে হরিহর দারোগা তখন লুঙ্গি পরে শুতে যাচ্ছিলেন। তবে, রামশরণের ডাক শুনে আর দেরি করেননি। ওই লুঙ্গি পরে জিপ চালিয়ে লছমীকে আমোদপুরের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু মাঝে মাঝে যখন প্রসব যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছিল লছমী তখন হরিহর দারোগাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। কাঁদছিলেন আর বলছিলেন—এরকম যন্ত্রণা আমারও হয় না কেন...

হাসপাতাল থেকে ফুটফুটে বাচ্চা নিয়ে লছমী বাড়ি ফিরেছিল। কী আনন্দ সেদিন রামশরণের। ওদের ওই টালির চালের ঘরটা টুনি লাইট দিয়ে সাজিয়েছিল। বোলপুর থেকে আবার লাড্ডু আর প্যাঁড়া নিয়ে এসেছিল। বাতাসপুরের ঘরে ঘরে বিলি করেছিল লাড্ডু আর প্যাঁড়া। নিমাইও বাদ যায়নি।

তা এসবই হল গিয়ে চার বছর আগেকার কথা। রামশরণের বাচ্চাটার এখন চার বছর বয়স। হাসিখুশি, ফুটফুটে বাচ্চা। ছুটির দিন রামশরণ ওকে কাঁধে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। পিছন পিছন লছমী। একদম সুখী সংসার। বাচ্চা হওয়ার পর লছমী একটু মোটা হয়েছে। কোমরের খাঁজে অল্প মেদ জমেছে। গালে সামান্য মেছেতার ছোপ। তবে, লাস্য পুরোপুরি বিদায় নেয়নি লছমীর শরীর থেকে। এখনও রামশরণ মাঝে মধ্যে গিয়ে নিমাই পাড়ুইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়ায়। একটাও কথা বলে না। এখনো নিমাই নিঃশব্দে রামশরণের দু-হাত ভরতি করে পশরা তুলে দেয়। পয়সা নেয় না।

এই কিচ্ছাটা কেমন লাগল বলুন—বিলুর দিকে ফিরে কান এঁটো করা হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করল লোকটা।

বিলু একটা সিগারেট ধরাল। অল্প কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—আসলে আমি বুঝে উঠতে পারছি না, কে কাকে ব্যবহার করল। লছমী নিমাইকে, নিমাই লছমীকে, নাকি রামশরণ ওদের দুজনকেই।

লোকটা গলা ফাটিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। বলল—ধাঁধা মশাই। ধাঁধা। তবে এটা তো মানবেন, এত কিছুর পরেও এখানে সবাই ভালো আছে। সুখী আছে। কেউ কারো সঙ্গে বিবাদ করছে না। কেন জানেন?

কেন?

হরিহর দারোগার জন্য। হরিহর দারোগা থানার সামনে শিউলি গাছ লাগিয়েছে না। ওই শিউলিগাছ থেকে ভালোবাসার গন্ধ বেরয়। পদ্ম সেদিন রাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলছিল।

তাহলে এবার পদ্মর গল্পই বলুন আমাকে।

সে আপনাকে পরে বলব'খন। আসলে পদ্ম আমাকে বলেছে ওর কথা কাউকে না বলতে। তাই তো আমি পদ্মর কথা কাউকে বলি না। নিজের বুকের ভিতর চেপে রাখি। সন্ধে হয়ে গেলে, যখন চারদিকটা ফাঁকা আর নিঝুম হয়ে যায়, তখন আমি পদ্মর সঙ্গে কথা বলি। বুঝলেন, আমি স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি, রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া...

এবার সচকিত হয় বিলু। এরকম ফঙ্গবেনে মার্কা লোকের মুখে এরকম কথা শুনবে ভাবেনি ও। লোকটাকে এখন আর ঠিক পাগল বলে মনে হচ্ছে না। লোকটার দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দেয় বিলু। বলে—এ তো রজনীকান্তর গান। আপনি জানেন? গান গাইতে জানেন।

নাহ্, জানি না। রাংতা বউদি এই গানটা গাইত। ভালোবাসার গান।

গন্ধরাজ লোকটাকে বরাবরই অন্যরকম লাগত আমাদের। সে যেন আর পাঁচটা লোকের মতো নয়। এই সংসারে সে ছিল একটা বেমানান লোক। এরকম একটা অদ্ভুত নাম তার কে রেখেছিল কে

জানে। তার তিনকুলেও কেউ কোনোদিন ছিল বলে জানা যায় না। তার কোনো আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধব—কাউকেই আমরা কোনোদিন দেখিনি। আমাদের উত্তর কলকাতার অতি প্রাচীন গলির ভিতর জীর্ণ নোনাধরা একটি বাড়ির একতলার একটি প্রায়ান্ধকার ঘরে গন্ধরাজ একাই থাকত। পাড়ায় গন্ধরাজের কোনো বন্ধু ছিল না। গন্ধরাজ কোনোদিন কারো বন্ধু হতে, বা, কেউ গন্ধরাজের বন্ধু হতে চেয়েছে বলে শোনা যায়নি। সকাল ন-টার সময় গন্ধরাজ তার একতলার ঘরটিতে তালা মেরে বেরিয়ে যেত। কোথায় যেত কেউ জানত না। হয়তো চাকরি করতেই যেত। কিন্তু কোথায় চাকরি করত কেউ জানত না। আসলে গন্ধরাজ তো নিজের সম্পর্কে কখনো কিছু বলেইনি কাউকে। গন্ধরাজ যে কোথা থেকে এসেছিল—তাও কারো জানা ছিল না। হঠাৎই একদিন এই পাড়ায় এসে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেছিল সে। গন্ধরাজ সম্পর্কে পাড়ায় নানা মানুষের নানারকম কৌতূহল ছিল। কেউ বলত, গন্ধরাজের বউ পালিয়ে গেছে। তাই মনের দুঃখে সে এখানে এসে বাসা বেঁধেছে। কেউ বলত, গন্ধরাজ আসলে পুলিশের গোয়েন্দা। ছদ্মবেশে এখানে এসে রয়েছে। আবার কারো কারো ধারণা ছিল, গন্ধরাজ একদিন সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করবে। এখন এখানে একাকী বসে তারই সাধনা করছে। তবে গন্ধরাজের ঘরে ঢুকে কেউ কোনোদিন দেখতে যায়নি, সে কেমনভাবে থাকে। পাড়ায় কয়েকজন কখনো কখনো অতি উৎসাহের বশে রাস্তায় গন্ধরাজের মুখোমুখি হয়ে গেলে হেসে জিজ্ঞাসা করেছে—'কী খবর, ভালো?' গন্ধরাজ কোনো উত্তর দেয়নি। শুধু মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। গন্ধরাজ লোকটা হয় দাম্ভিক, নয়তো অসামাজিক, এইরকম একটা সিদ্ধান্তে পাড়ার মানুষজন পৌঁছেছিল। তবে, এটাও ঠিক, পাড়ার কারো ব্যাপারে গন্ধরাজ কখনো কোনো উৎসাহ দেখায়নি। উত্তর কলকাতার এই প্রাচীন গলিটির গা ঘেঁষাঘেষি করে থাকা বাসিন্দারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হাঁড়ির খবর রাখত। এক বাড়িতে পাঁঠার মাংস রান্না হলে অন্য বাড়ির বাসিন্দারা নাক টেনে মাংসের সুঘ্রাণ নিত। কোন বাড়ির মেয়ে কার সঙ্গে পালিয়ে গেল, কোন বাড়িতে শাশুড়ি বউকে ধরে পেটাল—সে জানাজানি হতে দেরি হত না। পাড়ার ডাগর ডোগর মেয়ে-বউরা ছাদে উঠলে, আশপাশের বাড়ির নানা বয়সের পুরুষদের ভিতরেও ছাদে ওঠার হিড়িক পড়ে যেত। তবে গন্ধরাজ যে ক-দিন এই পাড়ায় ছিল, কেউ তাকে এরকম কিছু করতে দেখেনি। বরং, গন্ধরাজ যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত, তখন মাথা নীচু করে দ্রুত হাঁটত। আশপাশের কোনোদিকেই সে দৃষ্টি ফেলত না কখনো। গন্ধরাজের হাঁটা দেখে মনে হত, সে যেন সবার কাছ থেকে পালিয়ে যেতেই চাইছে।

গন্ধরাজ দেখতে যে খুব সুন্দর ছিল এমন নয়। রোগা, লম্বা, কালোমতোন। চোয়ালের হাড় দুটো একটু উঁচু। মাথায় এক ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। ভিড়ের ভিতর হারিয়ে যাওয়ার মতোই চেহারা। তবে, আসল গন্ধরাজকে চেনা যেত গভীর রাতে। যখন, এই প্রাচীন গলিটির প্রতিটি মানুষ ঘুমিয়ে পড়ত, সব বাড়িগুলিতে আলো নিভে যেত, তখন গন্ধরাজের একতলার ঘরে অল্প পাওয়ারের হলুদ রঙের আলো জ্বলে উঠত। আর তখন, ওই নিঝুম রাতে, গন্ধরাজের ঘর থেকে এস্রাজের মূর্ছনা ভেসে আসত। এস্রাজ বাজাতে বসত গন্ধরাজ। প্রথম যেদিন গন্ধরাজের ঘর থেকে এস্রাজের মূর্ছনা ভেসে এল—সেদিন কেউ বিশ্বাসই করেনি গন্ধরাজ এস্রাজ বাজাতে বসেছে। কয়েকদিন পর পাড়ার মানুষজন বুঝল, গভীর রাতের ওই এস্রাজ বাদক গন্ধরাজই। আর কেউ নয়। গন্ধরাজের এস্রাজের সুর এমনই ছিল যে, ক্রমে ক্রমে পাড়ার মানুষজনদের ভিতরও একটা নেশা ধরে গিয়ছিল। রাত যত গভীর হত, সবাই ঘরের আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করত, কখন গন্ধরাজ এস্রাজ বাজানো শুরু করবে। এমনকী, যে লোকটা বাড়ি ফিরে বউ পিটিয়েছে, বা, যে লোকটা অফিসে অবলীলায় ঘুষ নিয়েছে—তারাও অপেক্ষা করত কখন গন্ধরাজ এস্রাজ বাজানো শুরু করবে। আসলে গন্ধরাজ এস্রাজে অদ্ভুত একটা সুর তুলত। এক মোহময় সুর। শুনলে মনে হত, কেউ যেন খুব আকুলভাবে কাউকে আহ্বান করছে। এরকম সুর এর আগে বা পরে কেউ কখনো শোনেনি। অনেকে বলত—নিজের পালিয়ে যাওয়া বউয়ের কথা ভেবে গন্ধরাজ এই সুরটা বাজায়। তবে, কেন যে গন্ধরাজ এস্রাজে এমন একটি সুর বাজাত—তা অবশ্য তাকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি।

গন্ধরাজ এ পাড়ায় কবে এসেছিল—তার দিন তারিখ ঠিকঠাক মনে নেই কারো। তবে এটুকু সবার মনে আছে, সুধাময় যেবছর বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে এল—তার কয়েক মাস পরেই গন্ধরাজ এ পাড়ায় ঘর ভাড়া নিল। প্রায় ছ ফুটের মতো লম্বা ছিল সুধাময়। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। পালোয়ান গোছের লোক। খুব কম কথা বলত। কিন্তু যখন কথা বলত, তখন বেশ রাশভারী চালেই কথা বলত। আবগারি ইন্সপেক্টর ছিল সুধাময়। বাঁ-হাতের কামাই তার মন্দ ছিল না। তবে, এ নিয়ে খুব একটা রাখঢাকও ছিল না সুধাময়ের। খাঁকি প্যান্টের ভিতর শার্ট গুঁজে পরত সুধাময়। কোমরে চকচকে কালো চামড়ার চওড়া বেল্ট। এই বেল্ট দিয়ে পিটিয়ে কতজনকে শায়েস্তা করেছে, মাঝে মাঝেই বাড়ির রোয়াকে বসে সে গল্প সবাইকে শোনাত সুধাময়। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে এসে খালি গায়ে গামছা পরে রোয়াকে বসত সুধাময়।

এক বৈশাখ মাসে রাংতা বৌদিকে বিয়ে করে সুধাময় এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। আমাদের বয়স তখন তেরো কি চোদ্দ। বউ হয়ে যখন রাংতা বৌদি এ পাড়ায় এল তখন আমরা বুঝলাম, আমাদের এই গলির ভিতর রাংতা বৌদির থেকে সুন্দর আর কোনো নারী নেই। এই গলির বেঢপ, বিসদৃশ, কুচুটে মহিলাদের ভিতর রাংতা বৌদি ছিল ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম ছিল বলেই আমাদের মা-কাকিমারা রাংতা বৌদিকে পছন্দ করত না। আমরা রাংতা বৌদির কাছে গেলে মা-কাকিমারা রাগ করত। আমরা তবু বেশি বেশি করেই রাংতা বৌদির কাছে যেতাম। পাড়ার গলিতে ফুটবল খেলতে খেলতে, জল তেষ্টা না পেলেও, আমরা রাংতা বৌদির কাছে ছুটে যেতাম। জল খাওয়ার বায়না করতাম। রাংতা বৌদি রাগ করত না। হাসিমুখে দরজা খুলত। কোনোদিন শুধু জল দিত না আমাদের। জলের সঙ্গে কোনো কোনোদিন একটা সন্দেশ, কি একটা প্রজাপতি বিস্কুট—কিছু না কিছু দিতই। রাংতা বৌদির হাত থেকে সন্দেশ কি জলের গ্লাস নিতে গিয়ে আমরা ইচ্ছে করে রাংতা বৌদির আঙুল ছুঁয়ে দিতাম। রাগ করত না রাংতা বৌদি। কী নরম আঙুল ছিল রাংতা বৌদির। আমরা লক্ষ করতাম রাংতা বৌদির হাতের তালুর রঙ ছিল গোলাপী। রাংতা বৌদির ঠোঁটও ছিল পাতলা এবং গোলাপী রঙের। রাংতা বৌদির মাথায় ছিল একরাশ কোঁকড়া চুল। রাস্তায় খেলতে খেলতে পড়ে গেলে যখন আমাদের হাত-পা ছড়ে যেত, আমরা রাংতা বৌদির কাছে ছুটে যেতাম। রাংতা বৌদি যত্ন করে তার নরম হাত দিয়ে ডেটল লাগিয়ে দিত আমাদের। রাংতা বৌদির শরীর থেকে তখন চন্দনের গন্ধ ভেসে আসত। সেরকম গন্ধ এ গলির আর কোনো নারীর শরীর থেকে কখনো ভেসে আসেনি।

রাংতা বৌদি ছাদে টবে জুঁই ফুলের চারা লাগিয়েছিল। রোজ সকাল-সন্ধে সে গাছের পরিচর্যা করত। তখন, আমাদের সেই কিশোর বয়সে আমাদের দু-চোখ জুড়ে রাংতা বৌদির ঘোর। পড়তে বসলেও রাংতা বৌদির মুখ ভেসে উঠত পড়ার টেবিলে। যাওয়া আসার পথে আমাদের অভ্যাসই হয়ে গিয়েছিল মুখ তুলে রাংতা বৌদিদের দোতলার দিকে তাকানোর। কখনো কখনো দেখেছি, রাংতা বৌদি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আনমনে দূরের আকাশ দেখছে।

একবার আমাদের পাড়ার বিজয়া সম্মিলনীতে রাংতা বৌদি গান গেয়ে শোনালে। 'আমি স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি, রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া'... রজনীকান্তর গান। ভালোবাসার গান। পাড়ার সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল সে গান। ধন্য ধন্য করেছিল সবাই। তারপর পাড়ায় বেশ ক-দিন রাংতা বৌদির গান নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। মোট কথা, তখন রাংতা বৌদি আমাদের এই বিবর্ণ, ধূসর প্রাচীন গলিটি আলো করে ছিল। তবে, কেউ কেউ এও লক্ষ করেছিল, গভীর রাতে যখন গন্ধরাজ তার এস্রাজের মূর্ছনা ছড়িয়ে দেয়, তখন রাংতা বৌদি দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। যতক্ষণ গন্ধরাজ এস্রাজ বাজায়, ততক্ষণ রাংতা বৌদি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। একসময় গন্ধরাজের এস্রাজও থেমে যায়। তখন গভীর নিস্তব্ধতা নেমে আসে চতুর্দিকে। সেই নিস্তব্ধতায় রাংতা বৌদি, একা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারাদের দিকে চেয়ে থাকে।

আমাদের ওই কিশোর বয়সে, তখন সারা শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো' এবং 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' লেখা হয়ে গেছে। খবর এসেছে কাশীপুরের ওদিকে পুলিশ আর কংগ্রেসিরা অনেক ছেলেকে খুন করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। রাত-বিরেতে পাড়ায় পাড়ায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়াচ্ছে পুলিশের কালো ভ্যান। সি আর পির বুটের শব্দে কেঁপে উঠছে পাড়া। কত ছেলে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে তখন বাড়ি থেকে। আর ফিরে আসছে না তারা কোনোদিন। শোনা যাচ্ছে, শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ার জন্য পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূমের জঙ্গলে তারা অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়াই চালাচ্ছে। স্কুল-কলেজে তখন পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে। কারা যেন কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্তির গলা কেটে নিল। দিনদুপুরে মানিকতলার মোড়ে ডিউটি করতে গিয়ে এক গোবেচারা ধরনের ট্রাফিক পুলিশ খুন হয়ে গেল। তখন সন্ধের পর রাস্তাঘাট শুনসান হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করে দিচ্ছে সবাই। ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। এক অজানা ভয় তখন সবার হৃদয়ে ঢুকে পড়েছে। আমাদের ওই কৈশোর তখন বড়ো বেশি বারুদ আর রক্তের গন্ধে মাখামাখি।

ওই সময় এক ভোরবেলা, তখন সবেমাত্র কাক ডাকতে শুরু করেছে, অল্প আবছা আলো ফুটছে, সেই সময় আমাদের গলিটা ঘিরে ফেলল পুলিশ আর সি আর পি। সি আর পির ভারী বুটের শব্দে পাড়ার সবার ঘুম ভেঙে গেল। সব বাড়ির বারান্দায় আর জানালায় ভিড় করে দাঁড়াল ভয়ার্ত মুখগুলি। সবাইকে অবাক করে ঘরের দরজা ভেঙে সি আর পি বের করে আনল গন্ধরাজকে। তার হাত পিছমোড়া করে বাঁধল। কিন্তু গন্ধরাজকে তখনো বড় নির্বিকারে মনে হচ্ছিল। যেন কোনো কিছুই ঘটেনি। এক উদাস দৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়েছিল সে। পুলিশ চেঁচিয়ে, সদর্পে, পাড়ার সবাইকে জানিয়ে দিল—এই গন্ধরাজ আসলে একজন ভয়ংকর খুনি। মেদিনীপুরে তিনজন জোতদারকে খুন করে পালিয়ে এসে সে এখানে গা ঢাকা দিয়েছে। পুলিশ আরো জানিয়ে দিল, গন্ধরাজের ঘরে, তার এস্রাজের বাক্সের ভিতর থেকে দুটো পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে।

আর তখনই বিদ্যুৎ চমকের মতো সেই ঘটনাটি ঘটে গেল। বাড়ির দরজা খুলে একছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল আমাদের রাংতা বৌদি। আলুথালু বেশ, মাথার একরাশ চুল পিঠের ওপর

লুটোচ্ছে, কী এক বিষাদ যেন ভর করে বসেছে আমাদের রাংতা বৌদির ওপর। উন্মাদিনীর মতো চেঁচাতে চেঁচাতে রাংতা বৌদি ছুটে এসে দাঁড়াল গন্ধরাজের সামনে। তারপর বিলাপের মতো চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'হিমাংশু, তুমি যেও না ওদের সঙ্গে। যেও না। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যেও না।' দুটো মুষকো ধরনের সি আর পি জওয়ান রাংতা বৌদিকে ধাক্কা মেরে রাস্তার ওপর ফেলে দিল। গন্ধরাজও রাংতা বৌদির দিকে ফিরে তাকাল না। ধীর পদক্ষেপে সে গিয়ে উঠল পুলিশ ভ্যানে। শুধু রাংতা বৌদি রাস্তার ওপর আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে বিলাপ করতে লাগল—হিমাংশু, তুমি যেও না ওদের সঙ্গে। ওরা তোমাকে ফেরে ফেলবে। তোমার পায়ে পড়ি তুমি ওদের সঙ্গে যেও না। গলির সমস্ত বাড়ির জানালা এবং ছাদে ভিড় করে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে এবং একই সঙ্গে অবাক বিস্ময়ে সবাই প্রত্যক্ষ করল ভোরবেলার এই দৃশ্যটি। একটু পরে, রাংতাবৌদির স্বামী, এক্সাইজ ইন্সপেক্টর সুধাময় এসে গম্ভীর মুখে রাংতা বৌদির চুলের মুঠি ধরে বাড়ির ভিতর টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ বলে, ওইদিন রাতে, রাংতা বৌদির মুখে রুমাল গুঁজে দিয়ে সুধাময় তাকে কালো চওড়া চামড়ার বেল্ট দিয়ে পিটিয়েছিল। আর সেদিনই আমরা জেনে গিয়েছিলাম, গন্ধরাজের আসল নাম হিমাংশু।

কিন্তু ওইদিনের পর থেকে রাংতাবৌদিকে আর দেখতে পেলাম না আমরা। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কতবার রাংতাবৌদির বারান্দার দিকে মুখ তুলে তাকাতাম। কিন্তু রাংতা বৌদি আর বারান্দায় এসে দাঁড়াত না কখনো। ছাদে টবে যে জুঁই ফুলের চারাটা পুঁতেছিল রাংতাবৌদি, জল না পেয়ে সেটাও শুকিয়ে গেল। তখন রাংতা বৌদির জন্য ভীষণ মন খারাপ হত আমাদের। গলার কাছে কান্না আটকে আসত। মনে মনে বলতাম, এমন কেন করলে রাংতা বৌদি! আমরা চাইতাম রাংতা বৌদি আবার ফিরে আসুক আমাদের কাছে। আবার দোতলার ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরের আকাশ দেখুক।

কিন্তু রাংতা বৌদি আর কোনোদিনই ফিরল না। এর কয়েকমাস পরেই রাংতা বৌদিদের বাড়ির সামনে একটা ঠেলাগাড়ি এসে দাঁড়াল। ঠেলাগাড়িতে গেরস্থালির জিনিসপত্র বোঝাই করে সুধাময় রাংতা বৌদিকে নিয়ে পাড়া ছেড়ে চলে গেল। কোথায় গেল কাউকে বলে গেল না। কেউ জানতেও চায়নি অবশ্য।

ধীরে ধীরে রোদের তেজ এখন কমে আসছে। দুপুর চলে গিয়ে এখন বিকেলের নরম কমলা একটা আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। মহানিম গাছের ডালে এখন অসংখ্য পাখির কিচির মিচির। হাইওয়ের দুপাশে ধান খেতে আলো আর ছায়ারা খেলা করছে। সেদিকে তাকিয়ে বিলু একটা সিগারেট ধরাল। তারপর ফঙ্গবেনে লোকটার দিকে ফিরে বলল—শুনলেন তো আমার রাংতা বৌদির গল্প। কেমন লাগল?

লোকটা চোখ বুজে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আর কোনোদিন রাংতা বৌদির দেখা পাননি?

নাহ, পাইনি।

রাংতা বৌদিকে খোঁজেননি কোথাও?

নাহ্। আসলে রাংতা বৌদির কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। এই এতদিন পর, এই এখানে বসে, আপনার পাশে, আবার কী জানি কেন রাংতা বৌদির কথা মনে পড়ল।

বিলুর কথা শুনে লোকটা কিছুক্ষণ বুকের কাছে মুখ ঝুলিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে রইল। তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল, ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি, দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়, বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি একশো আটটি নীলপদ্ম!

বিলু কৌতুকপূর্ণ চোখে তাকায় লোকটার দিকে। বলে—এ তো সুনীল গাঙ্গুলির কবিতা। আপনি কবিতাও পড়েন নাকি।

দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই লোকটা উদাস কণ্ঠে উত্তর দেয়—না, আমি পড়িনি। রাংতা বৌদি পড়ত। ভালোবাসার কবিতা। আসলে, আপনি যেখানে শেষ করলেন, রাংতা বৌদির গল্পটা সেখানে শেষ হয়নি।

ব ব ব

সে এক আশ্চর্য হাওয়ার রাত ছিল সেদিন। অমন এলোমেলো মাতাল করা হাওয়া আমি এ জীবনে কখনো দেখিনি। সেদিনের আগে নয়, সেদিনের পরেও নয়। বিকেল থেকেই হাওয়ার কী দাপট! গাছগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। ওই যে অতবড়ো শিরিষ গাছটা—তার ডালপালা অবধি মড়মড় শব্দ করে দোল খেতে লেগেছে। চারদিকে সাঁই সাঁই করে খড়কুটো ডালপাতা সঙ্গে নিয়ে ধুলো উড়ে আসছে। আকাশে মেঘের রঙ লাল। যে গোরুগুলো মাঠে চড়ছিল, তারা ছোটাছুটি শুরু করে দিল। কে একজন ছুটে এসে খবর দিল—কোপাইয়ের জল ফুলে ফেঁপে উঠছে। এক ভয়ংকর প্রলয় আসছে—এ আশঙ্কায় ঘরে ঘরে কান্নাকাটি পড়ে গেল। জানেন তো, এই অঞ্চলে প্রলয় এলে সব ধ্বংস করে দিয়ে যায়। জমি-জিরেত ঘরবাড়ি কিছুই থাকে না আর। ঘরে ঘরে মেয়ে বউরা দেবতাকে তুষ্ট করতে শাঁখ বাজাতে শুরু করল। আমি সেদিন ঘোষদের বাড়িতে কামলা খাটছিলাম। এমনিতে আমার তো কোনো কাজ নেই। আর কে-ই বা কাজ দেবে আমাকে বলুন! আসলে আমার একটা অসুখ আছে তো। অসুখটা হল, আমার ভিতরে কোনো স্মৃতি নেই। সবার যেমন স্মৃতি থাকে, আমার সেরকম কোনো স্মৃতি নেই। এ মানুষকে কে তেমন কাজ দেবে বলুন! তবু, এই বাতাসপুরে আমার টুকটাক কোনো না কোনো কাজ ঠিক জুটে যায়। এই ধরুন কারো বাড়িতে কামলা খাটার কাজ, মাঠে গোরু চরানোর কাজ, মুদির দোকানে

মোট বওয়ার কাজ, বিয়ে বাড়িতে এঁটো পরিষ্কার করার কাজ। এইরকম সব কাজ আর কি!

যাক গে, যা বলছিলাম। ওই রাংতা বউদির কথা আর কী! আপনি রাংতা বউদির গল্পটা যেখানে শেষ করেছিলেন, ওখানে ওটা শেষ হয়ে যায়নি। আসলে এই গল্পটা কখনো শেষ হয় না। চলতেই থাকে, চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। তো হ্যাঁ, কী বলছিলাম যেন। আমি সেদিন ঘোষ বাড়িতে কামলা খাটছিলাম। ঘোষ বাড়িতে কামলা খাটতে ভালোই লাগে আমার। কামলা খাটলে ঘোষ গিন্নি একথালা পান্তাভাত খেতে দেয় আমাকে। আমি গবগব করে খাই। আসলে ভীষণ খিদে তো আমার! সর্বগ্রাসী খিদে। তো, সেদিনও যখন পান্তাভাত খেয়ে ঘোষদের উঠোনে বসে একটু জিরোচ্ছি, তখনই আমার মনে হল, আজ কিছু একটা ঘটবে। ঘটবেই। এটা মনে হতেই আমি এখানে ছুটে এলাম; এখানে, এই চাতালে, এই মহানিমগাছের তলায়। এখানে এই চাতালের ওপর শুয়েই অপেক্ষা করতে থাকলাম, অজানা কিছু ঘটার জন্য।

ধীরে ধীরে সন্ধে নামল। আকাশের রঙ লাল থেকে কালো হয়ে গেল। দু-তিনটে করে তারাও উঁকি মারতে শুরু করল আকাশে। অল্প অল্প শীতল হাওয়া দিচ্ছিল তখন। ওই হাওয়ায় আমার ঘুম এসে যাচ্ছিল। আসলে ভরপেট পান্তা ভাত খেয়েছিলাম তো দুপুরে। তো, সে যাক গে। চাতালের ওপরে মহানিমগাছের তলায় টানটান হয়ে শুয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। হ্যাঁ, আর একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি। আমার না থেকে থেকে খুব ঘুম পায়। বড্ড ঘুম পায়। যখন তখন ঘুমিয়ে পড়ি আমি। রাস্তায় চলতে চলতে ঘুম পেয়ে গেল তো, গাছের ছায়া দেখে তার তলায় ঘুমিয়ে পড়ি। আমার যেমন খিদে, তেমনি ঘুম—বুঝলেন কিনা।

এসব কথা বাদ দিন। হ্যাঁ, ওই যে রাংতা বৌদির গল্প আপনি বলছিলেন, তার পুরোটা আপনি জানেন না। তো, সেদিন হল কি, মহানিমগাছের তলায় শুয়ে তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম, আমার ঠিক খেয়াল নেই; অনেক রাতের দিকে, যখন হাওয়াটা আরো ঠান্ডা হয়ে এসেছে—তখন হঠাৎ আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে যেতে দেখি, চারদিকে কেমন একটা জোছনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ সেদিন কিন্তু জোছনা ছিল না মোটেই। আসলে সেদিন যা-তা সব ব্যাপার ঘটে যাচ্ছিল। যা-তা, যা-তা। এরপর শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন, আমার মাথার কাছে কে একজন যেন বসে আছে। তার নরম আঙুল, গোলাপি হাতের পাতা, একরাশ কালো চুল। খুব চেনা চেনা লাগছিল তাকে। কিন্তু আমি কিছুতেই চিনতে পারছিলাম না।

মনে করতে চেষ্টা করছিলাম, কোথায় দেখেছি একে। আর যতবার মনে করতে চেষ্টা করছিলাম, ততবার আমার মাথার মধ্যে অসম্ভব এক যন্ত্রণা দানা পাকিয়ে উঠছিল। এটাও আমার একটা অসুখ, জানেন তো। আমি বেশি কিছু ভাবতে গেলেই আমার মাথার ভিতরে অসম্ভব যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। আসলে আমার মাথার মধ্যে কোনো স্মৃতি নেই তো। সেজন্য আমি আর কিছু ভাবি না। আমি ওই নরম আঙুল আর কালো চুলের নারীকে জিগ্যেস করলাম—কে তুমি, কোথা থেকে আসছ? রহস্যময়ীর মতো ঠোঁট টিপে হাসল সে। সে হাসিতে কী ছিল কে জানে। এরকম হাসি আমার দিকে তাকিয়ে আর তো কেউ হাসেনি কখনো। সেই রহস্যময়ী নারী বলল—আমাকে চিনতে পারলে না? আমি পদ্ম।

পদ্ম! এ নামে তো আমি কাউকে চিনিই না। আমার তো মনেই পড়ছে না এ নাম।

ভুলে গেছ তুমি। আমি পদ্ম, তোমার বউ, বিয়ে করা বউ গো।

বিয়ে করা বউ? সত্যি বলছ? আমার বিয়ে করা বউ?

সত্যি নয় তো কি মিথ্যে বলব? মিথ্যে কেউ বলে বুঝি?

ও বউ, বউ, তাহলে তুমি আমার কাছে আসো না কেন?

কে বলে আসি না? এই তো এলাম। তোমার কাছেই তো এলাম। ছুঁয়ে দেখ আমাকে।

আমি ছুঁয়ে দেখলাম পদ্মকে। আর সেদিন পদ্ম আমাকে খুব আদর করল। খুব। আদরে আদরে ভরিয়ে দিল আমাকে। যাবার সময় বলে গেল, রোজ আসবে। এই মাঝ রাত্তিরে। এই মহানিমগাছের তলায়। আপনি জিগ্যেস করছিলেন না, আমি আমার বউকে ঘরে নিয়ে যাই না কেন? ঘরে নিয়ে যাব কি মশাই? আসলে আমার তো ঘরই নেই কোনো।

পদ্ম আমাকে খুব ভালোবাসে জানেন তো। কত যে ভালোবাসে আপনাকে কী বলব! মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। রান্না করে খাওয়ায়। আহা, কী স্বাদ সে সব রান্নার! গ্রাস করে আমার মুখে ভাত তুলে দেয় পদ্ম। যেন ও মা, আমি ওর ছোট্ট সন্তানটি। এই বেশ আছি আমি, এই বেশ আছি। বুঝলেন মশাই, পদ্মকে নিয়ে বেশ সুখে সংসার করছি আমি।

তবে, জানেন তো, মাঝে মাঝে, কোনো কোনো রাতে, যখন পদ্ম আমাকে আদরে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে, তখন হঠাৎ করে আমার ভয় করে ওঠে। ভয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠি। পদ্ম অবাক হয়ে যায়। বলে, এত ভয় কিসের তোমার? আমি পদ্মর বুকের ভিতর মুখ গুঁজে রাখি। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকি। বলি, পদ্ম, ও পদ্ম, ওরা আবার আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। আবার সেই অন্ধকার হিমঠান্ডা ঘরের ভিতর ওরা আমাকে নিয়ে যাবে। আমার মুখের ওপর জোরালো আলো ফেলবে। ঝাপসা হয়ে আসবে আমার চোখের মণি। হায়েনার মতো চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াবে ওরা আমাকে। সাঁড়াশি দিয়ে একটা একটা করে হাত-পায়ের নখ

উপড়ে ফেলবে। সিগারেটের আগুন দিয়ে ফোস্কা দেগে দেবে সারা শরীরে। ইলেকট্রিকের তার ঠেসে ধরবে আমার গোপনাঙ্গে। আমি জন্তুর মতো চিৎকার করব। আমাকে ঘিরে উল্লাস শুরু করে দেবে ওরা। ওরা আমাকে আবার ধরে নিয়ে যাবে পদ্ম। আমি ওদের কাছ থেকে পালাতে চাই। ওদের কাছে থেকে আমি রোজ পালাচ্ছি পদ্ম, রোজ পালাচ্ছি।

পদ্ম আমার মাথা ওর বুকের ভিতর চেপে ধরে। আমার কপালে, যেখানে সিগারেটের ছ্যাঁকার কালো দাগ এখনো রয়ে গিয়েছে, ওখানে খুব যত্ন করে চুমু খায়। আমার নখ উঠে যাওয়া থলথলে হলুদ মাংসপিণ্ড বেরিয়ে পড়া আঙুলগুলো নিজের গোলাপি করতলে তুলে নেয়। আর ঠিক তখন কোথাও, অনেক দূর থেকে কী এক অপরূপ সুর ভেসে আসে, জানেন তো। মনে হয়, দূরে কোথাও, নিরালায় বসে কেউ এস্রাজ বাজাচ্ছে।

পদ্ম আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। বলে, বাকি জীবন আমি তোমাকে আমার কাছে রেখে দেব হিমাংশু। এইভাবে, এই মহানিমগাছের তলায়।

এই অবধি বলে ফঙ্গবেনে লোকটা এবার থামে। চরাচর জুড়ে এখন সন্ধ্যা নেমেছে। কালো আকাশে অজস্র তারা ফুটে রয়েছে। অন্ধকারে, ধান খেতের ওপর মৃদু বাতাস খেলে যাচ্ছে। দূরে কোথাও গাঁয়ের কোনো মন্দির থেকে আরতির ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। একটু আগে হাইওয়ে ধরে বোলপুরের দিক থেকে আসা একটা ভিড়ে ঠাসা বাস আমোদপুরের দিকে চলে গেল।

ফঙ্গবেনে লোকটাকে এখন বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছে বিলুর। লোকটাকে আরো ভালোভাবে নিরীক্ষণ করল বিলু। তোবড়ানো গাল, মুখে ক-দিনের না কামানো দাড়ি। কেমন এক উদাস দৃষ্টিতে লোকটা তাকিয়ে আছে সন্ধের আকাশের দিকে। খুব মৃদু কণ্ঠে বিলু জিগ্যেস করল, এবার ঠিক করে বলুন তো আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন আপনি। কী নাম আপনার?

লোকটার গলায় কোনো উত্তাপ নেই। খ্যাসখ্যাসে স্বরে উত্তর দিল, নামে কি আসে যায় মশাই? পরিচয়েই বা কি যায় আসে? আপনার নাম যদি সিদ্ধার্থ রায় বা চারু মজুমদার হত—তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত পৃথিবীর?

তাহলে বাতাসপুর? বাতাসপুরের যেসব গল্প বললেন আমাকে?

এবার লোকটা গলা খুলে হো হো করে হেসে ওঠে। বলে—ধুর মশাই! বাতাসপুর বলে কোথাও কিছু আছে নাকি! ছিলও তো না কোনোদিন!

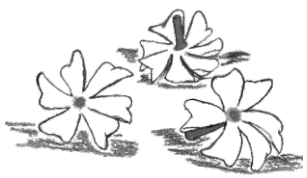

শেষে কৃত্রিম মেধার কাছে হার মানতে হবে?

অর্ধেন্দু সেন

কম্পিউটার কি ভাবতে পারে? বুঝে কাজ করতে পারে? না মুখস্থ বিদ্যা? অঙ্ক করায় ওরা আমাদের তুলনায় অনেক এগিয়ে। একশ বিট-এর একটা নম্বরকে আরেকটা একশ বিট-এর নম্বর দিয়ে গুণ করতে ওদের এক সেকেন্ডও লাগে না। যত খুশি অঙ্ক দাও একটাও ভুল করে না। ছোটোবেলা থেকে শুনছি ইতিহাস হল মুখস্থ করার জিনিস। ভাষা, সাহিত্য? কিছুটা বোঝা। বেশিটা মুখস্থ। অঙ্ক কিন্তু না বুঝে করা যাবে না। তাহলে তো স্বীকার করতেই হয় যে কম্পিউটার বুঝে কাজ করে।

কিন্তু না। নোবেলজয়ী গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ এবং দার্শনিক পেনরোজের মত হল, কম্পিউটার ভাবতে পারে না। ওরা যেভাবে তৈরি, কোনোদিন পারবে বলেও তিনি মনে করেন না। আমরা ভাবতে পারি আমাদের ব্রেন আছে বলে। কম্পিউটারের কি ব্রেন আছে? ল্যাপটপের পা নেই বলে সে হাঁটতে পারে না। ব্রেন না থাকলে ভাববে কী করে? মানুষ কম্পিউটার তৈরি করেছে তার নিজের আদলে। ভগবান যেমন আমাদের তৈরি করেছিলেন তাঁর নিজের মতো করে। তাই কম্পিউটারের একটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (সিপিইউ) আছে। দেখলে মনে হতে পারে সেটাই কম্পিউটারের ব্রেন।

কম্পিউটার যখন দুটো নম্বর যোগ করে তখন নম্বর দুটোকে সিপিইউতে ঢোকাতে হয়। যোগটা হয় সেখানেই। যোগফল বেরিয়ে আসে সিপিইউ থেকেই। যোগ করার বদলে গুণ করতে হলে? পরিবর্তিত ইন্সট্রাকশন পাঠাতে হয় সেই সিপিইউতেই।

আমাদের বেলায় এই কাজটা যে ব্রেনে হয় তাতে আর সন্দেহ নেই। বছর কুড়ি আগে আমরা শুধু জানতাম ব্রেনের একটা বিশেষ অঞ্চল কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে অঙ্ক করার ক্ষমতা কমে যায়। এখন পরিষ্কার দেখা যায় অঙ্ক করার সময় ব্রেনের সেই অঞ্চলে 'লাইট জ্বলে উঠছে'।

তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সিপিইউ হল ব্রেনের মতো। কিন্তু ব্রেনের কর্মক্ষমতা নিহিত আছে তার গঠনের অকল্পনীয় জটিলতায়। ব্রেনে দশ হাজার কোটি কোষ রয়েছে যাদের নাম 'নিউরন'। এদের মধ্যে যোগাযোগ করে তারের মতো 'সাইন্যাপ্স'। এক-একটা নিউরন কয়েক হাজার অন্য নিউরনের সঙ্গে যুক্ত। 'সেরিবেলাম' অঞ্চলের প্রত্যেক নিউরন যুক্ত আশি হাজার নিউরনের সঙ্গে। তাহলে সাইন্যাপ্স-এর সংখ্যা কত হবে? কম্পিউটারের সিপিইউতে ট্রান্সিস্টরের সংখ্যা মাত্র (!) কয়েক কোটি। গঠনে এবং কাজে দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

তফাৎ আরো আছে। কম্পিউটারের গঠনে কাজের সঙ্গে বা সময়ের সঙ্গে কোনো পরিবর্তন হয় না। হবার কথাও না। যারা মেনটেন করার দায়িত্বে তারা কোথাও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখলে সঙ্গে সঙ্গে সেই কম্পোনেন্ট পালটে দেবে। ব্রেন কিন্তু মুহুর্মুহু বদলাচ্ছে। সাইন্যাপ্সের বিন্যাস বা ব্রেনের 'সার্কিট' বদলে যাচ্ছে মুহূর্তে। মনে করা হয় এই বদলে যাওয়া হল আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারার মূলে। কম্পিউটারে আমরা একটা 'অপারেটিং সিস্টেম' ঢুকিয়ে দিই। সেই চালায় কম্পিউটারকে, যতক্ষণ না সেটা বদলে অন্য সিস্টেম ঢোকাই। মনুষ্যশিশু সেরকম নয়। সে নিজে শিখতে পারে। তাই একই সময়ে জন্ম এমন দুই শিশুর মধ্যে এক বছর পরে যত পার্থক্য দেখা যায় এক মডেলের দুই ল্যাপটপের মধ্যে তা দেখবেন না।

কিন্তু গঠন না দেখে আমি যদি আউটপুট দেখি? কয়েক কোটি ট্রান্সিস্টরে যদি কাজ হয় তাহলে হাজার কোটি নিউরন নিয়ে আমি কী করব? কৃত্রিম মেধা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে গত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে যে বিরাট অগ্রগতি হয়েছে তা দেখলে এ প্রশ্ন উঠবেই। ১৯৯৭ সালে আমরা দেখলাম আইবিএমের কম্পিউটার 'ডিপ ব্লু' বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গ্যারি ক্যাস্পারভকে দাবা খেলায় হারিয়ে দিল। 'খেলা হবে'র রণহুংকার ছাড়াই যারা এত বড়ো অঘটন ঘটাতে পারে ভবিষ্যতে কি তারাই সব খেলায় হারিয়ে দিয়ে আমাদের উপর প্রভুত্ব করবে না? প্রমাদ গুনেছেন অনেকেই। কৃত্রিম মেধা (এআই) সম্পর্কে এলন মাস্ক বলেছেন আমরা বোধ হয় শয়তানকে ডেকে আনছি। স্টিফেন হকিং বলেছেন রোবটের হাতেই আমাদের মৃত্যু লেখা আছে। বিল গেটসও বলেন একই কথা। এঁরা কেউ কিন্তু প্রযুক্তি বিরোধী 'লাডাইট' নন। বরঞ্চ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রথম সারির লোক। যে প্রযুক্তি মানুষের ব্রেন পর্যন্ত পৌঁছতে চায় তাকে নিয়ে আমাদের ভীতি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সময় থেকে।

রোবট কথাটা প্রথম ব্যবহার হয় চেকোস্লোভাকিয়ায়। একশ বছর পুরনো একটা নাটকে। এই নাটকেও দেখা যায় বিরাট শক্তিশালী এবং ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু রোবট মানুষের উপর ছড়ি ঘোরাতে চাইছে। এই ধারার গল্পের আধুনিক সংস্করণ হল 'টারমিনেটর'। সে এক 'সাইবর্গ'। সাইবার জগতের অরগানিজম। ঘুরে বেড়ায় মানুষের ছদ্মবেশে। ঘড়ির কাঁটা উল্টো ঘুরিয়ে সে ২০২৯ থেকে চলে এসেছে ১৯৮০-র দশকে। উদ্দেশ্য এক মহিলাকে খুন করা, যাতে তার সন্তান না জন্মায়। এই সন্তান বড়ো হয়ে ওদের গ্যাঙটাকে কচুকাটা করবে। মহিলাকে বাঁচানো না গেলে কিন্তু মানব জাতি শেষ।

অন্যরা আশঙ্কা করলেন প্রাণে না মারলেও রোবট আমাদের ভাতে মারবে। কৃত্রিম মেধা দ্বারা পরিচালিত রোবট আমাদের ছেলেমেয়েদের চাকরি খাবে না তো? যে কোনো নতুন প্রযুক্তির বেলায় এ প্রশ্ন ওঠে। যাঁরা নতুন প্রযুক্তির পক্ষে তাঁরা বলেন কিছু লোক চাকরি খোয়ালেও শেষে দেখা যাবে মোট চাকরির সংখ্যা বেড়েছে। আমাদের দেশে আমরা রেলওয়ে রিজার্ভেশনের কাজ পুরোপুরি কম্পিউটারের হাতে তুলে দিয়েছি। আজকের দিনে বোধহয় কেউই বলবেন না এই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। এআই বা কৃত্রিম মেধা আর রোবটের কাছেও আমরা অনেক কাজ খুইয়েছি। আবার নতুন চাকরিও হয়েছে অন্যত্র। গাড়ি তৈরির মতো কাজে, যেখানে ওয়েল্ডিং-এর গুরুত্ব বেশি, সেখানেও রোবট ঢুকে

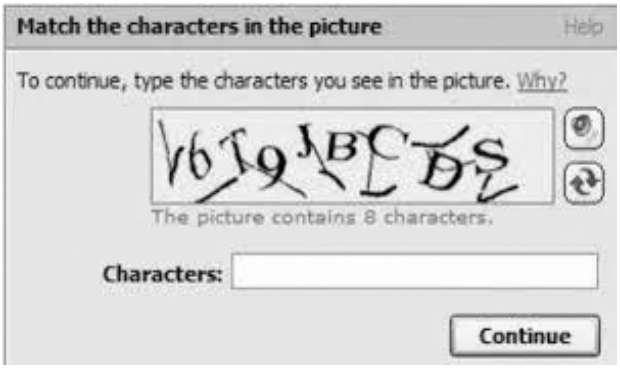

পড়েছে হাজারে হাজারে। হার্ডওয়ার এবং সফটওয়ারে ক্রমাগত উন্নতি হবার ফলে মেশিনের আড়ষ্টতাও কমেছে। তাকে নতুন নতুন কাজ শেখানো সম্ভব হচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে রোবটের সংখ্যা বাড়বেই।

কৃত্রিম মেধা যে শুধু রোবট চালাচ্ছে তা নয়। অনেক 'হোয়াইটকলার জব'-ই চলে গেছে তার কব্জায়। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখা যায় সেগুলো সবই তৈরি করে এআই। কিন্তু একাজে তো প্রচুর তথ্য দেখে পরীক্ষা করে তার পর সিদ্ধান্তে আসতে হয়! আর্টিফিশিয়াল মাথারা এখন একাজে পটু। তেমনই স্টক মার্কেটে আগামী সপ্তাহে কোন স্টকের মূল্য বাড়বে, কোনটার কমবে সে হিসেবও নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এআই-এর হাতে; যদিও তার উপর কোটি কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট নির্ভর করে। ডাক্তারখানায় আগে আমরা দেখতাম একদল অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাদের জেরা করে নোট তৈরি করত। সেই নোট দেখে ডাক্তারবাবু বুঝতেন কী করণীয়। এখন নোট নেওয়া পর্যন্ত কাজ এআই করে। ডাক্তারের কাজ করে না তাই ভাগ্যি।

ধরুন আপনি পাইলট। লন্ডন থেকে উড়ে এসেছেন দিল্লি। এবার ল্যান্ড করতে হবে। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল আপনাকে ইন্সট্রাকশন দিয়ে যাচ্ছে। সে ইন্সট্রাকশন এতই বিশদ যে আপনি ইচ্ছে করলে চোখ বুজে প্লেন নামাতেই পারেন। কোনো পাইলট কিন্তু তা করবেন না। একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় এসে এক ঝলক দেখে নেবেন সব ঠিক আছে কিনা। তার পর নামাবেন প্লেন। ঘন কুয়াশা থাকলে কিন্তু দেখার কাজটা হবে না। প্লেন নিয়ে যেতে হবে লখনউ কিম্বা জয়পুর। আমরা যে আলোয় দেখি সেই ফ্রিকোয়েন্সির আলো কুয়াশা ভেদ করতে পারে না। বোঝাই যায় যে মানুষের জন্মলগ্নে কুয়াশা ছিল না। অবশ্য প্লেনও ছিল না। এআই-এর জন্য এটা কোনো সমস্যা নয়। সে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে দেখে নেবে। দেখে তো নেবে, কিন্তু বুঝে নিতে পারবে কি ল্যান্ডিং তাই নিরাপদ হবে কিনা? দেখছি তো পারছে। আজকাল ল্যান্ডিং মানেই এআই। শ'য়ে শ'য়ে ফ্লাইট যদি শেষ মুহূর্তে ডাইভার্ট করতে হয় সে আরেক বিপদ। এক সেকেন্ডের জন্য কোনো প্লেনই না থামিয়ে সবার জন্য নতুন রুট, নতুন টাইমিং ঠিক করে দিতে হবে। একাজ এআই ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু এই যে কইলেন রোবট বুঝতে পারে না?

দাবা খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারানো অবশ্যই একটা বড় মাইলফলক। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন রোবটের খেলায় সেই সূক্ষ্ম কাজ দেখা যায় না, যা আমরা গ্র্যান্ডমাস্টারদের খেলায় দেখি। দাবার চাল দেবার আগে আমাদের বুঝতে হয় পাল্টা চাল কী হতে পারে। তার পাল্টা আমি কী দিতে পারি। তার পাল্টা কী আসতে পারে। চ্যাম্পিয়ন এভাবে ২০-২৫টা চাল ভেবে ঠিক করেন কোনটা নিরাপদ। ডিপ ব্লু সে জায়গায় ভেবেছিল ২৫ লক্ষ চালের কথা। এই বেগার খাটা বন্ধ না হলে কি আমরা মেনে নেব, যে, রোবট মানুষ হচ্ছে?

জ্ঞান টনটনে হলেই বা কি? রোবটের তো অনুভূতি নেই। সেখানে তো তারা মানুষের পিছনেই থাকবে। সে অপবাদ দেওয়াও এখন কঠিন। রোবট এখন ছবি আঁকে, বেহালা বাজায় সবই করে। দেখে বা শুনে আমরা বুঝব না মানুষ না এআই। কিছুদিন আগেই দেখা গেছে পিগম্যালিয়নের মতো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তার নিজের তৈরি সফটওয়ারের সঙ্গে প্রেমে হাবুডুবু। তাই সাবধান থাকতেই হচ্ছে।

যে জায়গায় আমরা সবচেয়ে বেশি এগিয়ে ছিলাম তা হল 'প্যাটার্ন রেকগনিশন'। একটা আলপনা যে চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি তা রোবট আমাদের আগেই বলে দেবে, কিন্তু সেটাকে আলপনা হিসেবে চিনবে কি? শিশুরা সবচেয়ে আগে শেখে মায়ের মুখ চিনতে। যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে কম আলোয়, বেশি আলোয় তারা মাকে ঠিক চিনে নেয়। ফেস রেকগনিশন সফটওয়ারও এতদিন পরে বাজারে এসেছে; তবে তার গুণগত মান সন্দেহাতীত নয়। এই প্যাটার্ন রেকগনিশন আমরা এখন কাজে লাগাচ্ছি সফটওয়ারের চালাকি ধরতে।

আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ইমেল অ্যাকাউন্ট সবেতেই নিশ্চয়ই পাসওয়ার্ডের সুরক্ষা আছে। কিন্তু কোনো দুরভিসন্ধিমূলক এআই এই প্রাচীর অতিক্রম করতেই পারে। আবার অনেক পাবলিক পোর্টাল আছে যেখানে পাসওয়ার্ড চলবে না। তাই সর্বত্র এখন দেখবেন 'ক্যাপচা'র ব্যবহার। কয়েকটি বাঁকাচোরা অক্ষর, কয়েকটি নম্বর এলোমেলো করে দেওয়া থাকবে। দুই অক্ষরের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকবে না। আর পশ্চাৎপট থাকবে অপরিচ্ছন্ন। আপনার কাজ হবে অক্ষর আর নম্বরগুলি চেনা। সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ—ওডহাউসের হিরো হলে চলবে না—সহজেই পারবেন এই পরীক্ষায় পাশ করতে। কিন্তু সফটওয়ার পারবে না। যেকোনো ছবি তার কাছে অগুন্তি

সাদা কালো স্পটের সমষ্টি। তার মধ্যে কোনটা মন দিয়ে দেখতে হবে কোনটা দেখেও না দেখা করতে হবে তা ওর সমঝের বাইরে।

'ক্যাপচা' কথার মানে হল—Completely Automated Public Turing Test to tell Computers and Humans Apart। অ্যালান টিউরিং ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত এক ব্রিটিশ গণিতবিদ, যাঁকে মনে করা হয় এআই-এর জনক। ১৯৫০ সালে তিনি একটি পেপারে বলেছিলেন ২০০০ সালের মধ্যেই কম্পিউটার ভাবতে পারবে। তার প্রমাণ হিসেবে সে 'টিউরিং টেস্ট'-এ পাশ করবে। কথাবার্তা শুনে বোঝার উপায় থাকবে না মানুষ না কম্পিউটার।

ধরুন আপনি আপনার মনিটারের সামনে বসে। যোগাযোগ হয়েছে ব্যাঙ্কের কর্মচারী অথবা চ্যাটবটের সঙ্গে।

'হ্যালো, ভালো আছেন তো?'

'ভালো তো আছি, কিন্তু স্প্যানিশ বোঝে এমন কেউ আছেন?'

'আমি বুঝি। বলুন কী সমস্যা?'

আপনার সমস্যার সমাধান হল। তার পর খোশ গল্প। কথায় কথায় আপনি হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা, সত্যি বলুন তো মেসি ভালো না রোনাল্ডো?'

ভাবছেন চ্যাটবট এবার কুপোকাত? মোটেই না। মানুষের চেয়ে ভালো জবাব দেবে। কিন্তু এ আইকে বিপদে ফেলার এত উপায় আছে যে আজ পর্যন্ত কোনো এ আই টিউরিং টেস্টে পাশ করেনি। পাশ করলেই লেবনার প্রাইজ ১০০,০০০ ডলার।

১৭ শতকের ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্ত বলেছিলেন I think therefore I am। মানুষ চিতার মতো ছুটতে পারে না সিংহের মতো গর্জন করতে পারে না, বাঁদরের মতো গাছে উঠতে পারে না, কিন্তু বিমূর্ত চিন্তায় আমাদের ধারে কাছে কেউ নেই। এই হল মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরিচয়। চিন্তা ছাড়া আরো কাজ করতে পারি আমরা, কিন্তু চিন্তার গুরুত্ব আলাদা। আমি হোমওয়ার্ক না করেও ভাবতে পারি করেছি। বিছানায় শুয়ে ভাবতে পারি আমি মর্নিং ওয়াক করছি। কিন্তু না ভেবে ভাবতে পারি না যে আমি ভাবছি। স্বভাবতই আমরা চাইব না অন্যরাও আমাদের মতো ভাবতে শিখুক। এখনো আমরা একম অদ্বিতীয়ম। কিন্তু আশঙ্কা আছে ২০৪৫ নাগাদ হয়তো এই অ্যাডভান্টেজ আমরা হারাব। তারপর?

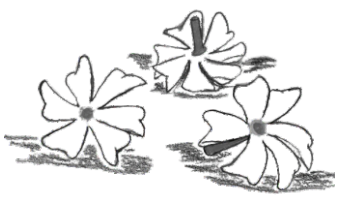

নিজেকে লেখা চিঠি

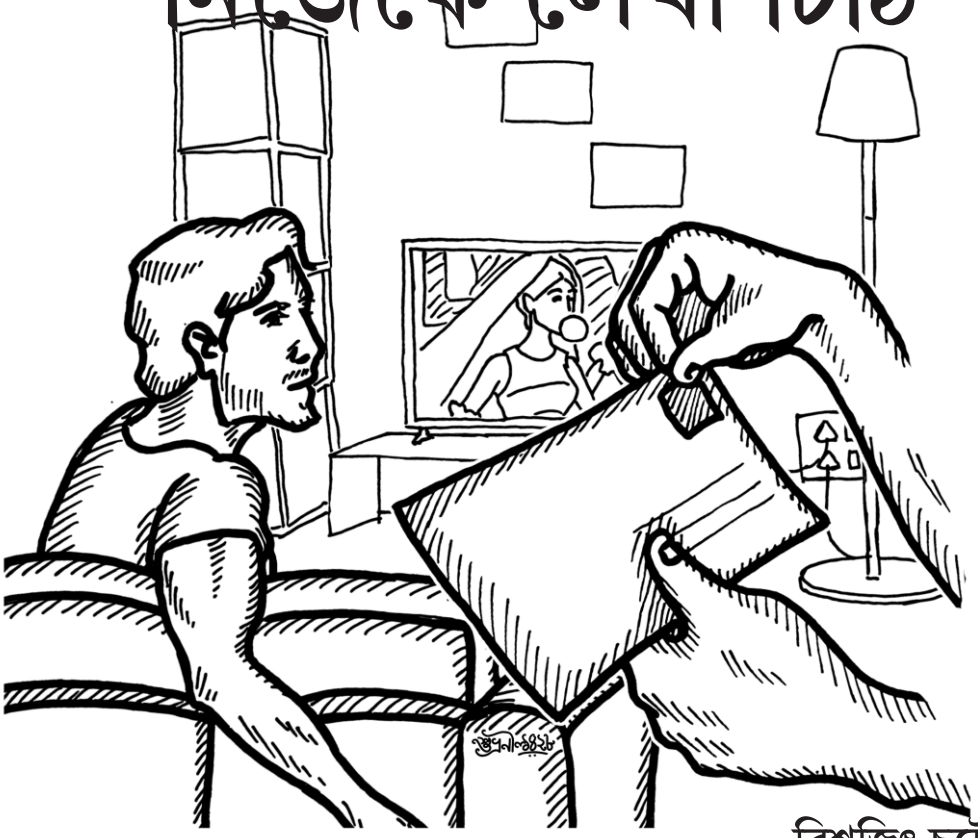

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

একটা সময় মাঝে মাঝে, কিছু দিন অন্তর চিঠি লিখত কুমার। চিঠি লিখত, এ আর নতুন কথা কী! কিন্তু আছে। কারণ, সে চিঠি লিখত নিজের ঠিকানায়, নিজেকে উদ্দেশ্য করে। চিঠি লিখে খামে ভরে বাড়ির সামনে পোস্ট অফিসের ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসত।

সেই চিঠি ফেরত আসতে ২, ৩ দিন লাগত। খাম ছিঁড়ে মন দিয়ে সেই চিঠি পড়ত কুমার,২বার, ৩ বার। তারপর ছেঁড়া খামে ভরে একটা হাতবাক্সে খুব যত্ন করে জমিয়ে রাখত।

সম্বোধন করা হত এই ভাবে... প্রিয় কুমার, প্রেরকের নাম লেখা থাকত চিঠিতে। শুধু চিঠি,পদবি নেই, ঠিকানা নেই।

সেই চিঠির উত্তর দিত কুমার। বেশ বড়োসড়ো উত্তর। কিন্তু যেহেতু ঠিকানা নেই, তাই সেই চিঠি ও হাতবাক্সে জমা পড়ত।

সেটা ছিল হাতচিঠির যুগ। তখনও মোবাইল ফোন আসেনি। বাড়ির ঠিকানায় চিঠি লেখাও বেশ বিপজ্জনক। সুতরাং হাতচিঠি খুব কাজে আসত। সরাসরি চিঠি দেওয়া-নেওয়া ছিল অসমসাহসীদের কাজ। সাধারণত এক নির্ভরযোগ্য পরিচিত মাধ্যমের সাহায্যে চিঠিপত্র বিনিময় চলত। কুমার এর কোনো গোত্রেই পড়ে না। তার কোনো বন্ধু নেই। পরিচিত মাধ্যম নেই। চিঠি লেখার সাবজেক্ট নেই। তবু তার ইচ্ছে হত, দিলীপের মতো, রবিশঙ্করের মতো,নিবেদিতার মতো, কুহুর মতো চিঠি লিখবে।

অনেক ভেবে সে ঠিক করল একটা নতুন নাম, চিঠি। সে চিঠিকে চিঠি লিখবে। চিঠি লিখবে তাকে, অর্থাৎ কুমারকে। এই কথাগুলো আর কেউ জানবে না। অ

কুমারের কল্পনার চিঠি ডানাকাটা সুন্দরী নয়। ৫ ফুট ৩, একটু চওড়া কপাল, চশমা নেই, নাকছাবি নেই, গলার আওয়াজ

জুলিয়া রবার্টসের মতো, হাসলে সামনের ঝকঝকে সাদা দাঁত স্পষ্ট দেখা যায়। কুমার চিঠিকে স্বপ্নেও কয়েকবার দেখেছে। কিন্তু চিঠি কী বলতে চায় ঠিক বোঝা যায়নি।

কুমার বড়ো হয়ে যাচ্ছে। চিঠি লেখা কমতে কমতে এখন প্রায় শূন্য।

স্বপ্নে দেখছে একটা বাঘ ওকে তাড়া করছে আর ও ইস্কুলের একতলার বাথরুমে লুকিয়ে আছে। বাঘটা হতাশ হয়ে বিদ্যামন্দিরের বিশাল মাঠে গোলপোস্টের নিচে ঝিমোচ্ছে।

এই স্বপ্নটা ঘুরে ফিরে আসছে। কুমার এখন দাবা খেলে একা একা। গান শোনে।

কুমার ৫ ফুট ৮, চশমা পরে না, গালে অল্প দাড়ি আছে। কয়েকটা নতুন বন্ধু হয়েছে ইদানীং। আর হ্যাঁ,ও কবিতা লেখে না, পড়েও না।

কুমারের কাহিনি এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত যদি না কিছুদিন পর...

বেশ কয়েক বছর পরের কথা। কুমার এখন চাকরি করে। বাবা-মা বুড়ো হয়েছেন। ওদের বাড়িটাও বুড়ো হয়েছে। বাড়ির সামনে পূর্বদিকে আমগাছে এবার আম ওঠেনি। বাড়ির দক্ষিণ দিকে নারকেল গাছটা পুকুরের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। ওটা কুমারের ঠাকুর্দার নিজ হাতে পোঁতা।

কুমার বিয়ে করেছে, কয়েক বছর আগে। বউ শ্বেতা মেনন, একটা ব্যাঙ্কের পি আর ও। বিয়েটা কিছুটা সম্বন্ধ করেই বলা যায়। শ্বেতা ফর্সা নয়, দীর্ঘদিন কলকাতায় থাকায় বাংলা জানে, চশমা পরে এবং ঠোঁটে, গালে,নখে রং লাগায় না। উচ্চতা কুমারের সঙ্গে মানানসই, ছুটির দিন নিজের ইচ্ছায় রান্না করে আর রোজ কুমারের বাবাকে সাউথ ইন্ডিয়ান কফি বানিয়ে খাওয়ায়। মাঝে মাঝে মুড হলে একটু ভুল সুরে এবং সামান্য ভুল উচ্চারণে রবি ঠাকুরের গান শোনায় কুমারকে। কুমারের ভালো লাগে শ্বেতার গান। শ্বেতারও ভালো লাগে কুমারের সরলতা, ওর হালকা দাড়ি, এবং কানের দুটো লতি। সব মিলিয়ে ভালোই তো আছিস, বলে রবি, মানে সেই ইস্কুলের রবিশঙ্কর। কেমন আছেন কুমারদা, বলে পিউ, ইয়ং ল-ইয়ার, মানে শ্বেতার ব্যাঙ্কের ক্লায়েন্ট।

এরকমই চলছিল, হঠাৎ করেই একদিন, বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় কুমারের মোবাইল ফোনে অচেনা নম্বর থেকে একটা কল এল। প্রথম বার ধরেনি, দ্বিতীয় বার ধরে হ্যালো বলল কুমার। বাইরে তখন বৃষ্টি, ভেজা হাওয়া, স্পষ্ট উত্তর এল না। শুধু হাওয়ার শব্দ। তারপর লাইনটা কেটে গেল। সাধারণত অচেনা নম্বর থেকে মিসড কল এলে কল ব্যাক করে না কুমার। এ ক্ষেত্রে ও করার প্রশ্ন নেই, তবু কেন জানি কী মনে করে ফোন ব্যাক করল কুমার।

হ্যালো ! কে বলছেন ?

অনেকক্ষণ পর যেন বহু যুগের ওপার থেকে গলা ভেসে এল।

কুমার, কেমন আছ কুমার ? আমাকে চিনতে পারছ ?

অচেনা নারী কণ্ঠ, কোথায় যেন শোনা,কার সঙ্গে মিল কিছুই বুঝতে পারল না কুমার। অথচ গলায় অন্তরঙ্গতার ছোঁয়া, তার তো আগে কোনো নারী-বন্ধুই ছিল না-মনে মনে ভাবছিল সে।

আমাকেই ভুলে গেলে ? এত চিঠি লিখতে, এত এত... আমিও লিখতাম। তুমি সব যত্ন করে রেখে দিতে হাতবাক্সে। ওগুলো আছে না বিয়ে করে ফেলে দিয়েছ ?

কুমার হতভম্ব, নিরুত্তর।

কণ্ঠ বলল, আমি চিঠি। তোমার একমাত্র চিঠি। ওগুলোর আর কোনো মূল্য নেই তোমার কাছে, কিন্তু আমার কাছে আছে। প্লিজ, চিঠিগুলো ফিরিয়ে দাও কুমার। প্লিজ।

ফোন কেটে গেল।

কুমার বাড়ি ফেরার পর থেকে চুপচাপ। বাবা বললেন, কফি খাবি ? কুমার ঘাড় নাড়ল, খাবে না। মা বললেন, ওকে চা দাও বৌমা। কেমন যেন দেখাচ্ছে ! শ্বেতা কড়া করে আদা চা আর ঝাল বড়া দিয়ে বলল, ঠান্ডা লেগেছে ?

কুমার অবাক চোখে তাকিয়ে আছে দেখে সবাই অবাক।

টিভিতে একটা ইংরেজি ছবি চলছে...

রানওয়ে ব্রাইড, বিয়ের আসর থেকে বারবার বউ পালিয়ে যায়। জুলিয়ার গলা শুনে কেঁপে উঠল কুমার...

সেই গলা, যেন গ্রহান্তর থেকে ভেসে আসছে...

বাথরুমে গিয়ে বমি করল কুমার, তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়।

রাত্তিরে ফল ছাড়া কিছুই খেল না।

স্বপ্ন টা এল ভোর রাতে। বাঘটা ওকে তাড়া করেছে,আর ও ছুটছে, সেই ইস্কুলের সিঁড়ি, দোতলা-তিনতলা। সব ঘর বন্ধ, তালাচাবি। একটা কাচের ঘরে চিঠি বসে আছে উল্টোদিকে মুখ করে। দরজা খোলো চিঠি, প্লিজ। জুলিয়ার গলায় চিঠি বলে, আগে আমার চিঠি ফেরত দাও। সিঁড়িতে বাঘের গর্জন। ও তিনতলা থেকে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল।

সারা শরীর ঘামে ভেজা, দেখল শ্বেতা উদ্বিগ্ন চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

কী ব্যাপার বলোতো ? মনে হচ্ছে ডাক্তার দেখাতে হবে, ইসিজি করা দরকার।

কুমার বলল, দুঃস্বপ্ন। মনে নেই, কিন্তু ভয়ের। বাঘ তাড়া করেছে। আগেও দেখেছি এরকম স্বপ্ন। ও কিছু না। একটু ঠাণ্ডা লেবু চা দেবে ?

কুমার অফিস গেল না। অনেক সি এল পাওনা আছে। আজ ভালো করে ঘুমোবে। শ্বেতার জরুরি মিটিং ছিল, কিন্তু সময় করে পিউকে ফোন করে সব বলল। এও বলল, কুমারদা বাড়ি আছে। একটু কথা বলে দেখতে পারো। তোমার তো অনেক কন্ট্যাক্ট একজন ভালো ডাক্তার দেখে দাও না ভাই।

পিউ-এর সঙ্গে ওদের বেশ কিছুদিন ধরেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক...

পিউ বললো ডোন্ট ওরি, আমি দেখছি।

শুক্রবার সন্ধে ৬টা ৩৮, সেরোলজিক্যালের একতলায় বসে আছে শ্বেতা মেনন আর পিউ।

দোতলায় কুমার গেছে ডাক্তারের চেম্বারে।

ডাক্তার বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছে মেঘা, পিউয়ের বন্ধু। সে নিজেও স্কিনের এম ডি। আবার পি এইচ ডি করছে ইম্যুনোলজি নিয়ে। নানা বিষয়ে পড়াশোনা ও জানার আগ্রহ। অনেকে বলে, মেঘা ও রাত্রির গল্প নাকি ওকে নিয়ে লেখা।

যাই হোক, ইসিজি ও চেক আপ হয়ে গেছে। খারাপ কিছু নেই। পুরো কাহিনি মন দিয়ে শুনলেন ডাক্তার। তারপর বললেন, একদিন চিঠিগুলো নিয়ে আসবেন।

কেন? এটা কি সত্যি সম্ভব? ঐ সব চিঠির কথা আপনি ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না। সেই কাল্পনিক চিঠি সত্যি হতে পারে? এটা কি ডিল্যুশন, স্যর?

এক কথায় এর উত্তর হয় না কুমারবাবু। আপনি কি কুমারের চিঠি আর চিঠির লেখাগুলো দুটো আলাদা হাতের লেখায় লিখতেন?

কী করে ধরলেন? একদম তাই। দুটো আলাদা লেখা। কিন্তু আমি তো বহুকাল এসব চিঠি লেখা ছেড়ে দিয়েছি স্যর।

ঠিক আছে। কিন্তু চিঠি নেই এটা এখনো জোর দিয়ে বলা যায় না। ঐ চিঠি আপনার রাখা ঠিক হবে না। এটা আমার অনুমান।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। কুমার ভালো আছে। চিঠির ফোন আসেনি। বাঘের স্বপ্ন দেখেনি কুমার, কিন্তু শ্বেতা সাপের স্বপ্ন দেখেছে দু-বার। কুমারের মা নিশ্চিত পরিবারে নতুন সদস্য আসতে চলেছে। অতিথি যে আসছে তার লক্ষণ স্পষ্ট শ্বেতার শরীরে।

চিঠিগুলো এখন বিশ্বজিতের কাছে। আবেগঘন সব চিঠির ভাষায় উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি। কিন্তু তাতে কি! একটু ঘষে মেজে নিয়ে, মেটাফর বসিয়ে দিব্যি প্রেমের কবিতা বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। দু-একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছেন ভালোই খাচ্ছে। আবেগ তো খাঁটি। তার একটা জেনুইন মার্কেট ভ্যালু আছে। ফরম্যাট পাল্টে দিলে এটা যে পত্র কবিতা নয় তা বোঝার সাধ্য কি সাধারণ লোকের! এক প্রকাশক বই করতে চাইছেন।

বাড়ি ফেরার সময় গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ডাঃ চট্টোপাধ্যায়। ঘুম ভাঙল ফোনের রিংটোনে। অচেনা নম্বর।

কে বলছেন?

আমায় চিনবেন না। আমি পেশেন্ট নই। আমি চিঠি। হাঁ, সেই চিঠি, কুমারের চিঠি...

আপনার প্রেমের কবিতার সাবজেক্ট।

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় জেগে উঠেছেন। যাক চিঠি আছে তাহলে।

বললেন, কুমার এখন ভালো আছে। ওর কোনো চিঠির দরকার নেই। কিন্তু আমি ভালো নেই চিঠি, বিশ্বাস করো আমি ভালো নেই।

ফোন নিস্তব্ধ। সাড়া নেই বা কেটে গেছে।

বাড়ি ফিরে চিঠিকে চিঠি লিখতে বসলেন বিশ্বজিৎ। কিন্তু চিঠির উত্তর নেই। তাঁর হাতে চিঠির উত্তর আসছে না।

'চিঠিকে চাই' নামে নতুন সনেট শুরু করেছেন।

কুমারের আবেগ আসছে না। না আসুক ক্ষতি নেই, চিঠির জন্য অন্তত একশো প্রেমের কবিতা না লিখে তাঁর মুক্তি নেই।

কনকম্বরম

সুদেষ্ণা মজুমদার

চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় দাঁড়াবার জন্য আজকের সকালটা খুব সুন্দর। বেশ মোলায়েম আলো। গরমের তেজ খুব হালকা। আর সেই তেজপূর্ণ গরমকে ফাঁকি দিয়ে খুব সুস্বাদু, ঠিক এই চায়ের মতো হাওয়ার ঝাঁক মাঝেমধ্যে ঢুকে পড়ছে এই বারান্দায়। বারান্দাটা বারো ফিটের মতো লম্বা। আর চওড়ায় ফিট চারেক। কল্যাণী বারান্দার চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে ভাবল গাছগুলো বসালেই পারত। তাহলে এতদিনে বেশ ডাগর হয়ে উঠত। আর আজকেই বন্ধুরা সব এসে পড়বে। বারান্দার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারলে ওদের চোখে একটু হলেও ঈর্ষা ফুটে উঠতে দেখতে পেত কল্যাণী। ঈর্ষা— বেশ ভালো জিনিস। ভাবল কল্যাণী। আর সেই ঈর্ষাই যদি ছোটোবেলার বন্ধুদের চোখে-মুখে ফুটে উঠতে দেখা যায়, মন্দ নয়!

হাতে কাপ ধরে চায়ে চুমুক দিতে দিতে পায়চারি করছিল কল্যাণী। বারান্দার পশ্চিম কোণে গিয়ে ভাবল, এখানে একটা

সূর্যমুখী লাগালে সূর্য ওঠামাত্রই বেশ আলো পাবে। কল্পনায় একটা-দুটো ফুটন্ত, চনমনে সূর্যমুখীকে দেখে কল্যাণী ভাবল, বন্ধুরা চলে গেলেই গাছটা কিনে আনবে। এখন শরৎকাল। সামনের গরমে গাছটা বেশ বড় হয়ে যাবে। আর পুবদিকে একটা গোলাপ লাগাবে। সেটাও হলুদ। ঠিক আছে, ওরা চলে গেলেই গাছগুলো কিনে আনবে। সব হলুদ ফুলের গাছ। ফেসবুক তো আছেই। পরে পোস্ট করে দিলেই হবে। কোন কোন ফুলের রং হলুদ? ভাবল কল্যাণী। বারান্দাটার একটা নামও দেবে সে। 'হলুদ মহল'। না, মহলটা কেমন যেন বেখাপ্পা শোনাচ্ছে। রাজেশ্বরী এলে জিজ্ঞেস করতে হবে। ও তো আবার বইয়ের জগতের মানুষ।

বসার জায়গায় তুতানের ছবিটার দিকে নজর গেল কল্যাণীর। তুতানের চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। গত মাসে তুতানকে দুদিনের জন্য হোস্টেল থেকে নিয়ে এসেছিল কল্যাণী। জন্মদিন ছিল তুতানের। দুদিনের বেশি এক মুহূর্তও থাকতে চায়নি। পড়ার ক্ষতির কথা বলে ভোর হতেই বেরিয়ে গেছে। কল্যাণীকে শুধু বাস স্ট্যান্ডে গাড়ি করে পৌঁছে দেবার অনুমতি দিয়েছিল তুতান। অনুমতি! হ্যাঁ, তাই। বলেছিল, 'আমি একাই যেতে পারব মা। তোমার অফিসে দেরি হয়ে যাক, এটা আমার পছন্দ নয়। আমার জন্য স্যাক্রিফাইস করতে হবে না।' স্যাক্রিফাইস? নিজের ছেলের জন্য আলাদা করে কোন মা স্যাক্রিফাইস করে? পেটে ধরা থেকেই তো স্যাক্রিফাইসের শুরু। শিলাজিৎ, শিলাজিৎ কি কিছু করত? পারলে চব্বিশ ঘণ্টাই অফিস করত। ছেলে হওয়াতে কি নিজের রুটিনে একটুও বদল ঘটিয়েছিল? ঘটায়নি। তিন মাসের মেটারনিটি লিভের পরে ছেলেকে সঙ্গে করে অফিস যেত। অফিসের ক্রেশে তুতানকে রেখে কাজ করতে হত। শিলাজিৎ একদিনও ছেলের জন্য অফিসের কাজে কামাই করেনি। তবে হ্যাঁ, সকাল সকাল ওর জন্য ব্রেকফাস্ট বানানোর হাত থেকে রেহাই দিয়েছিল, কারণ, সারাদিনের খাওয়াটা সে অফিসেই করত। আবার ভাবল কল্যাণী— একটা দিনও ছুটি নেয়নি শিলাজিৎ। নট ইভেন দোজ ডেজ। সেবার, তুতানের তখন মাত্র আড়াই বছর বয়স; টাইফয়েডে একশো-পাঁচ জ্বর উঠে গিয়েছিল। একবার শুধু ছেলের কপালে হাত রেখেছিল। অফিস ছুটি করে, রাত জেগে, ছেলের মাথায় বরফজল ঢেলেছিল এই কল্যাণীই। আর এখন ছেলে বলছে স্যাক্রিফাইস করতে হবে না। না, চোখে জল আসে না কল্যাণীর। কাঁদে না কল্যাণী।

ফোনটা বেজে উঠতেই কল্যাণী ফোন ধরার আগেই বেশ জোরেই কাউকে বলার মতো করে বলে উঠল, 'এসে গেল!' ফোনের দিকে তাকিয়ে দেখল রাজেশ্বরী ফোন করছে। ফোনটা ধরে বলল, 'কোথায়? এসে গেছিস?' ওপারে রাজেশ্বরী কিছু বলল। কল্যাণী চুপ করে শুনে বলল, 'ও আচ্ছা। চারটেয় মিটিং শেষ হবে মানে তো এখানে আসতে আসতে ছ-টা বেজে যাবে। ঠিক আছে আয়।' আবার বোধহয় ওপারে রাজেশ্বরী কিছু বলল। কল্যাণী উত্তর দিলো, 'না, যাব না। ওয়ার্ক ফ্রম হোম করব। ঠিক আছে চল, রাখি।'

রাজেশ্বরীকে বলল বটে আজ অফিস যাবে না, কিন্তু কাজটা বোধহয় ভালো করল না কল্যাণী। ছ-টা সাড়ে ছ-টার আগে কেউই আসবে না। আর কলকাতা থেকে যে সব বন্ধুরা আসছে, তারা আটটা-সাড়ে আটটার আগে কেউ ঢুকবে না। ওদের প্লেন নামবেই ছ-টা পঁয়ত্রিশে। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গাড়ি ধরে এই বাহান্ন কিলোমিটার আসতে কমপক্ষে দেড় ঘণ্টা তো লাগবেই। তার ওপর আজ শুক্রবার। রাস্তায় মারাত্মক জ্যাম পাবে ওরা। সাড়ে আটটা কি, ন-টাই বেজে যাবে। কাজের মেয়েটাকে সন্ধেবেলায় আসতে বলেছে কল্যাণী। একটু কেটে-কুটে দেবে। ঘরগুলো আর একবার পরিষ্কার করিয়ে নেবে। কল্যাণীর ফ্ল্যাটে শোবার ঘর দুটো। একটা ঘরে তুতান এসে থাকে। এখন তো ও নেই, ফলে মনে হয় হয়ে যাবে। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চোখটা একবার ঘড়ির দিকে গেল কল্যাণীর। সাতটা দশ। আজ কোনো তাড়া নেই। ন-টার আগে লগ-ইন করতে হবে না। ভালোই হল। অফিসের কাজ করতে করতে ঘরের টুকটাক কাজগুলো সেরে ফেলতে পারবে। তিরিশ বছর বাদে বন্ধুরা এক জায়গায় হবে। কল্যাণী ভাবতে শুরু করল, স্কুলে এদের সঙ্গে বন্ধুত্বটা কেমন ছিল। কে বেশি বন্ধু ছিল। এক নম্বরে তো রাজেশ্বরীকেই রাখতে হয়। সুপর্ণার সঙ্গে ঠিক পটত না। ও এখানে না এলেই ভালো হত। সংযুক্তার জেদাজেদিতেই সুপর্ণাকে দলে ঢোকাতে হল। আবার সবাই ফেসবুকের দৌলতেই কাছাকাছি এসেছে। রাজেশ্বরী ব্যাঙ্গালোরে প্রায়ই আসে। দেখা কখনো হয়নি। ও-ই প্রধান উদ্যোক্তা। কল্যাণীও রাজি হয়ে গেল। শিলাজিতের সঙ্গে ডিভোর্স হওয়া, তুতানের হোস্টেলে চলে যাওয়া, অফিসের চাপ— সব মিলিয়ে কেমন একটা যেন জীবন কাটায় কল্যাণী। গতানুগতিক। সংযুক্তা যদিও বলে, 'তুই তো ঝাড়া হাত-পা।' ওরা আসছে, বাতাসে তো একটু আলোড়ন উঠবেই। দেখাই যাক না, কে কতটা বদলেছে। স্কুলে কে কীরকম ছিল, স্পষ্ট মনে আছে কল্যাণীর।

স্নান করার জন্য বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে মনে হল, আজ তো অফিসে যাবে না কল্যাণী। আজ বলা যেতে পারে আধা-ছুটি। ধীরে সুস্থেই লগ-ইন করার কথা ভাবল সে। তার আগে সিডি-টা বন্ধ করতে হবে। সেতার শুনছিল কল্যাণী। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। রাগ সোহিনী। এটা প্রায়ই শোনে কল্যাণী। ভোর-ভোর বেজে উঠলে মনের, দেহের গ্লানি সব কেমন দূর হয়ে যায়। সিডি বন্ধ করে কল্যাণী রান্নাঘরে গেল। ভাবল, শুরু করা যাক।

দমদম এয়ারপোর্টে সংযুক্তা যখন পৌঁছোলো, ঘড়িতে দেখল দুপুর দুটো বাজতে দশ। সবার টিকিট একসাথেই কাটা হয়েছিল। মৃন্ময়ী কেটে সবাইকে মেল করে দিয়েছিল। সংযুক্তা একটা প্রিন্ট আউট নিয়ে নিয়েছে। বাকি তিনজন না এলে বোর্ডিং পাস নেওয়ার কোনো মানে হয় না। সংযুক্তার বিশ্বাস এখনো কেউ আসেনি। অস্থির লাগছে। দু-ঘণ্টা আগে রিপোর্টিং করতে হবে। চারটে-দশে ফ্লাইট। একটু আগে আসতে কী হয় এদের কে জানে! বারবার ফোন করে সবাইকে বলে দিয়েছিল সময়মতো

আসার কথা। অদ্ভুত! সংযুক্তা ভাবল ভেতরে ঢুকে আবার এক-এক করে সবাইকে ফোন করবে। গেটে টিকিট আর আধার কার্ড দেখিয়ে ভেতরে ঢুকল সংযুক্তা। সিকিওরিটির পুলিশটা এতক্ষণ ধরে কী মেলাচ্ছিল কে জানে বাবা! মুখের সঙ্গে কার্ডের ছবির মিল পেতে এত সময় লাগালে চলবে? তাড়া দেবে ভেবেছিল সংযুক্তা। কিন্তু কী গম্ভীর মুখের ছেলে রে বাবা লাল সিং রাঠোর! ওই নামটাই বুকের ওপর সাঁটা ছিল। সংযুক্তার মন সায় দেয়নি কথা বাড়াতে। খামোখা ঝামেলায় জড়ানোর কী দরকার ভেবে চুপ করেই ছিল। অথচ সামান্য প্রতিবাদ করতে না পারলে সংযুক্তার ভাত হজম হয় না। সহজে মেনে নেওয়ার পাত্রী নয় সে। আর সেটা ভাষায় প্রকাশ করতেও দ্বিধা করে না। তাতে কে কী ভাবল, বয়েই যায় তার! যাক গে, এবার বাকি তিনজনের অপেক্ষা। কেউ এসে পৌঁছেছে বলে মনে হয় না।

মৃন্ময়ী কিন্তু আগেই এসেছে। তা-ও প্রায় আট-দশ মিনিট হবে। এবং লাউঞ্জের যেখানটায় বসেছে সে, সেখান থেকে ঢোকার দরজাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সংযুক্তা যে অস্থির হয়ে আছে, বসার জায়গা থেকেই বুঝতে পেরেছে মৃন্ময়ী। স্বভাব বদলায়নি ওর। স্কুলে প্রচুর ছটফট করত, আর প্রচুর ঝগড়াও করত। মনে মনে হাসল মৃন্ময়ী। সংযুক্তা একদমই শান্ত প্রকৃতির ছিল না। মনে হয় তিরিশ বছর পরেও ওর চরিত্র বদলায়নি। তবে ওর মনটা ভালো। প্যাঁচ নেই। রাগ পুষে রাখে না। মানে, যদ্দূর মনে পড়ছে, এমনটাই ছিল সংযুক্তা। পালটায়নি মনে হচ্ছে। মৃন্ময়ী ভাবল, থাক, একটু খুঁজুক, নিজে থেকে হাত-ফাত নাড়ব না।

মৃন্ময়ী এমনভাবে বসেছিল, যেন সংযুক্তাকে চেনেই না। ওর হাতে মলাট দেওয়া একটা মোটা বই। সংযুক্তা বন্ধুদের খুঁজতে খুঁজতে ছটফটে দৃষ্টি নিয়ে মৃন্ময়ীর সামনে দিয়ে লাগেজ ঠেলতে ঠেলতে একবার ঘুরে গেল। যথারীতি মৃন্ময়ীকে খেয়াল করল না। ফেসবুকের ছবি আর আসল মৃন্ময়ীকে মেলানোর ক্ষমতা ওর নেই। সেটা আগেই জানত মৃন্ময়ী। আসলে মৃন্ময়ী ফেসবুকে নিজের ছবি গুচ্ছ-গুচ্ছ পোস্ট করে না কোনোদিনই। সেটা ওদের ছ-জনের মধ্যে একমাত্র সুপর্ণাই করে। ও এখনো এসে পৌঁছোয়নি। ওর নিশ্চয় সাজগোজ করতে সময় লাগে। ছোটো থেকেই খুব সাজুনি। মৃন্ময়ীর খুব ভালো মনে আছে, সরস্বতী পুজোর দিন স্কুলে পুজোর কোনো কাজ করত না। খুব সাজগোজ করে আসত, হাসি-হাসি মুখে সবার দিকে চাইত, আর অপেক্ষা করত কখন কে ওকে 'কী সুন্দর লাগছে রে তোকে!' বলবে। বিয়ে করেছে। সংসারও করে। একটা মেয়ে। বর ভালো চাকরি করে। নিজে শাড়ির ব্যবসা করে। সব সামলেও দিব্যি সাজগোজ করে একটার পর একটা ছবি তুলে যায়। সব তথ্যই ফেসবুকের সৌজন্যে পেয়েছে মৃন্ময়ী। এই ধরনের মানুষ শুধুই 'সেল্ফি'-তে বিশ্বাসী। আর বাকি রইল বিদিশা। মৃন্ময়ী যতটুকু যা বুঝেছে, ওর কেসটা একটু গোলমেলে ঠেকেছে। ফেসবুকে আছে, বন্ধুদের গ্রুপে আছে, সব কথা শোনে, কিন্তু কোনো কথাই প্রায় বলে না। সাড়াটুকু দেয় মাত্র। তাতেই বোঝা যায় সবেতেই আছে। ব্যাঙ্গালোর যাবার ব্যাপারে রাজিও হয়েছে। কিন্তু একটু বেশিই যেন চুপচাপ।

সংযুক্তা দ্বিতীয়বার যখন মৃন্ময়ীর সামনে দিয়ে ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে আর চোখ চারপাশে ঘোরাতে ঘোরাতে যাচ্ছিল, তখন মৃন্ময়ী আর দেরি না করে সংযুক্তার আঁচলটা ধরে হালকা টান মারল। সংযুক্তা পেছন ফিরে মৃন্ময়ীর দিকে তাকাতে মৃন্ময়ী বলল, 'আর পাক খেতে হবে না। বস এসে।'

সংযুক্তা খুব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মৃন্ময়ীর দিকে তাকিয়ে একটু সময় পরে প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠল, 'মৃন্ময়ী, তুই তো অন্যরকম দেখতে হয়ে গেছিস রে! ফুলের ছবি দিয়ে রেখেছিস কেন? নিজের ছবি দিসনি কেন? তুই আমাদের সেই মৃন্ময়ী তো?'

মৃন্ময়ী ভাবল, নিজের ছবি দিলে আর করে খেতে হত না। হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'সন্দেহ আছে?'

সংযুক্তা বলল, 'প্রথমে সন্দেহ ছিল। এখন তোকে দেখে আর নেই। ভাবা যায়! তিরিশ বছর পরে দেখা। তুই আর দুটো বিনুনি করিস না? একটু মোটা হয়েছিস, তাই না রে?'

মৃন্ময়ী সংযুক্তার হাতটা একটু টেনে বলল, 'এটা বয়সের মোটা হওয়া। কিন্তু তুই চেঁচাচ্ছিস কেন? আগে তো বসবি নাকি দাঁড়িয়েই থাকবি?'

সংযুক্তা বসতে বসতে বলল, 'দাঁড়া বসছি। বাকি দুজন এসেছে? দ্যাখ, দুটো বেজে গেল। এরপর তো জায়গা পাব না!'

মৃন্ময়ী হেসে ফেলে বলল, 'প্লেনে জায়গা পাবি না মানে! পাগল হলি নাকি?'

সংযুক্তা বলল, 'আরে হ্যাঁ রে! প্লেনেও জায়গা পাওয়া যায় না। কনফার্মড্ টিকিট হাতে থাকলেও! আমাদের সঙ্গে গত বছর হয়েছিল। আমরা গোয়া যাচ্ছিলাম। সে বিশাল গল্প। আগে কল্যাণীর বাড়ি যাই, দাঁড়া, অনেক গল্প আছে। হ্যাঁ রে, তুই বিয়ে করিসনি কেন রে? একা-একা পঞ্চাশটা বছর কাটিয়ে দিলি? বুড়ো বয়সে কে দেখবে বল দেখি? অ্যাঁ?'

মৃন্ময়ী সংযুক্তার হাতে একটু চাপ দিয়ে বলল, 'পঞ্চাশ! হিসেবে গোলমাল করছিস কেন?'

'ওই হল। দেখতে দেখতে হয়ে যাবে। বল না, বিয়ে করিসনি কেন? কে দেখবে?'

'তুই দেখবি।'

সংযুক্তার মুখে আপত্তির বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা গেল না। সোৎসাহে বলল, 'চলে আয় আমার কাছে। আমার শ্বশুরবাড়িটা অতিরিক্ত বড়। আরামসে থাকতে পারবি।' তারপর বোধহয় ভাবল এখন এ-বিষয়টা আলোচনা করার মতো নয়। তাই প্রসঙ্গ পালটে বলল, 'বিদিশা আর সুপর্ণা তো এখনো এল না! দুটো দশ হয়ে গেল তো রে! ওদের সঙ্গে তোর কোনো কথা হয়েছে?' মৃন্ময়ী বলল, 'হয়েছে। ওরা রাস্তায়।' সংযুক্তা বলে উঠল, 'একসঙ্গে আসছে নাকি রে?' মৃন্ময়ী বলল, 'না বোধহয়। সুপর্ণা থাকে বেহালায়। আর বিদিশা শিলিগুড়ি থেকে আজ সকালে কলকাতা পৌঁছেছে। দাদার বাড়িতে উঠেছে। ওর দাদা টালাতে থাকে। এখান থেকে বেশি দূর তো নয়। এসে পড়বে। তুই অত দুশ্চিন্তা করছিস কেন? তোর ব্লাডপ্রেশার কি বেশি?'

সংযুক্তা বলে উঠল, 'না, আমার ওসব নেই। তা শোন না,

বাজে কথা রাখ। আচ্ছা আমি বরং সুপর্ণাকে ফোন করি। তুই বিদিশাকে দ্যাখ।' বলেই ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন বার করে সুপর্ণাকে ফোন করা শুরু করল। মৃন্ময়ী বিদিশাকে ফোন করার কোনো চেষ্টাই করল না। ও শুধু সংযুক্তার কাণ্ড দেখছে।

ফোনটা কান থেকে নামিয়ে সংযুক্তা বলে উঠল, 'কী মেয়ে মাইরি! ফোনটা ধরল না! কী অসভ্য দেখেছিস। কী মনে করে কী নিজেকে? কীসের দেমাক ওর এত?'

মৃন্ময়ী সংযুক্তাকে থামাতে বলে উঠল, 'ও পুলিশকে সামলাবে না তোর ফোন ধরবে?'

'পুলিশ মানে?' সংযুক্তা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল।

মৃন্ময়ী দরজার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওই দ্যাখ, আসছে।'

'বাবাঃ, কী সেজেছে রে! বিয়েবাড়ি যাচ্ছে নাকি?'— এটাই ছিল সংযুক্তার প্রথম প্রতিক্রিয়া। সুপর্ণাকে দেখার পর।

সুপর্ণা ওদের কাছাকাছি এসেই বুঝতে পারল ওরা ওরই অপেক্ষা করছে। মৃন্ময়ী চেয়ার থেকে উঠে সুপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'কতদিন পরে দেখা, বল তো? তুই তো আরো সুন্দরী হয়েছিস!'

সুপর্ণা একটু হাসল মাত্র। তারপর সংযুক্তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে বলল, 'কেমন আছিস? কতদিন পরে দেখলাম। বেশ গিন্নি-গিন্নি দেখতে হয়েছিস।' সংযুক্তা সুপর্ণার হাত ধরে বলল, 'তোদের মতো নাকি? দু-দুটো বাচ্চা মানুষ করতে হয়েছে। বর আছে, শাশুড়ি আছে। ঝক্কি কম নাকি?'

সুপর্ণা বলল, 'হ্যাঁ রে, যা বলেছিস।'

স্কুলে থাকতেও সুপর্ণা খুব বেশি কথা বলত না, এখনো বলে না। সংযুক্তা সুপর্ণার নীল শাড়ি ছুঁয়ে বলল, 'এটা তোর বুটিকের শাড়ি নাকি রে?'

সুপর্ণা বলল, 'হ্যাঁ রে। আমার ডিজাইন করা।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই কখন বিদিশা এসে দাঁড়িয়েছে কেউ খেয়ালই করেনি। চেহারাটা একটু কেমন যেন ম্লান। পরে আছে কালো জিন্‌স্ আর শ্যাওলা সবুজ টি-শার্ট। শার্টের ওপর ইংরেজিতে গোটা গোটা করে লেখা 'মাই অ্যাটিটিউড'। কালচে হলুদ দিয়ে। আর লেখাটার পেছনে একটা ভেঙে যাওয়া কাচের ছবি। অনেকটা ছোটবেলায় আঁকা সূর্যের মতো। সাদা রঙের। ঘাড় পর্যন্ত মসৃণ চুল। দু-গালের জুলপির কাছের কিছু চুলে পাক ধরেছে। সবার দিকে তাকিয়ে হাসল। এতদিন পরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা, কিন্তু মৃন্ময়ীর মনে হল বিদিশার দেহে এবং উপস্থিতিতে একটু যেন দমবন্ধ ভাব আছে। মৃন্ময়ী ভাবতে চাইল এবং বুঝতেও চাইল কেন এমনটা তার মনে হচ্ছে। হাসিমুখে বিদিশার সঙ্গে হাত মিলিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছিস রে? কেমন শান্ত-শান্ত লাগছে। কী রে, সব ঠিক আছে তো?'

বিদিশা হেসে বলল, 'সব ঠিক আছে। কতদিন পরে দেখা হল! কেমন যেন লাগছে।'

সংযুক্তা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাকি কথা বলার অনেক সময় পাবি। ঘড়িটা দেখেছিস? ক-টা বাজে খেয়াল আছে? চল তাড়াতাড়ি।' সবাই মেনে নিল বাধ্য হয়ে। ঘড়ি বলছে দুটো কুড়ি। আর দেরি করলে ঝামেলায় পড়তে হতে পারে।

লাগেজপত্র স্ক্যান করা, বোর্ডিং পাস নেওয়া, সিকিউরিটি ইত্যাদি করে সবাই যখন ভেতরে গিয়ে বসল, তখন ঘড়িতে প্রায় বিকেল তিনটে বাজে। সংযুক্তা বসার পর কাঁধের ভারী ঝোলা থেকে একটা বেশ বড় খাবারের বাক্স বের করল। মৃন্ময়ী জিজ্ঞেস করল, 'এতে কি খাবার এনেছিস?'

সংযুক্তা বাক্সটা পাশে রেখে বলল, 'আরো আছে। কল্যাণীর বাড়ি পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে। প্লেনের ভেতর খাবারের প্রচণ্ড দাম। কেন খামোখা অত পয়সা দেবো বল তো?' বলে আর একটা বাক্স বের করে পাশের চেয়ারে রাখল। তারপর ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একগোছা টিশ্যু পেপারও বার করল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে টিশ্যু ধরিয়ে বলল, 'লুচি-তরকারি এনেছি। এখন ফাঁকায় ফাঁকায় খেয়ে নে। নে ধর। কেউ খাব না বলিস না। অনেক কষ্ট করে বানিয়েছি।' চামচও এনেছে।

সুপর্ণার দিকে তাকিয়ে মৃন্ময়ী বলল, 'ঠিকই বলেছিস। একদম পাকা গিন্নি!'

ততক্ষণে সংযুক্তা প্রত্যেককে দুটো করে লুচি, সঙ্গে তরকারি দিতে দিতে বলল, 'এক্সপেরিয়েন্স সোনা! দুটো ছানা, বর, শাশুড়িকে নিয়ে যখন ঘুরতে যাই, এরকমটা করতে হয়। আরো বেশি করতে হয়। বাচ্চারা বড়ো হয়ে গেলেও ঘুরতে গেলেই খাই-খাই করে। ওদের পেট ভরা না থাকলেই ফালতু পয়সা নষ্ট।'

বিদিশা এবার মুখ খুলল, 'আর বরের সঙ্গে যখন যাস?'

'ভুলে গেছি। সে তার মতো অফিসের কাজে যখন যায়, নিজের পয়সায় খায়। আমার অত পয়সা নেই ভাই।'

সুপর্ণা বলে উঠল, 'ভালোই হয়েছে। নিজেই রান্না করলি?'

'আবার কে? আমার রান্নার কোনো লোক নেই।'

মৃন্ময়ী জিজ্ঞেস করল, 'এই যে তুই থাকবি না, ওদের কে রান্না করে খাওয়াবে?'

'শাশুড়ি বা সুইগি। আর লুচি নিবি কেউ? বেশি করেই এনেছি।'

বিদিশা বলল, 'খাইয়ে ভালোই করলি রে। সকাল এগারোটায় খেয়েছিলাম। বুঝিনি যে এতটা খিদে পেয়েছে। দে আর একটা লুচি দে। তরকারি আছে?'

সংযুক্তা বিদিশার হাতে আরো দুটো লুচি আর তরকারি তুলে দিয়ে বলল, 'ওই জন্যই তোকে শুকনো শুকনো দেখাচ্ছিল। পেট ভরে খা।'

'তুই খাবি না?'

'খাব রে বাবা! অনেক আছে।'

খেতে খেতেই মৃন্ময়ী জিজ্ঞেস করল, 'তুই ক-টা স্টুডেন্ট পড়াস রে?'

সংযুক্তা নিজের জন্য খাবার নিয়ে বলল, 'বর্তমানে সব মিলিয়ে কুড়িজন। এটা কম-বেশি হয়।'

'তোর সাবজেক্ট কী রে?'

'ইতিহাস আর বাংলা।'

মৃন্ময়ী বিদিশার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তুই কী পড়াস রে বিদিশা?'

বিদিশার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। টিশ্যু পেপার ফেলার জন্য ডাস্টবিনের দিকে যেতে যেতে বলল, 'অঙ্ক।'

ব্যাঙ্গালোরের পথে প্লেনে কথা মূলত সংযুক্তা আর মৃন্ময়ীই বলছিল। মৃন্ময়ী, সংযুক্তা আর সুপর্ণা পাশাপাশি বসেছিল। বিদিশা পাশের জোড়া সিটের ধারে। যাওয়ার পথটা একটু-আধটু কথাবার্তা, একটু-আধটু ঝিমুনির মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে ঠিক সময়েই ওরা ব্যাঙ্গালোর পৌঁছোল। এয়ারপোর্টের বাইরে যখন এল তখন ঘড়িতে সাতটা বেজে গেছে। একটা ট্যাক্সি পেয়ে ওরা সবাই উঠে বসার পর মৃন্ময়ী মোবাইল বার করে কল্যাণীকে ফোন করে খুব মার্জিত কণ্ঠে বলল, 'এসে গেছি রে! গাড়িতে উঠেছি।' পাশ থেকে সংযুক্তা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'হুররে! কতদিন পর আবার দেখা হবে।'

অন্যান্য দিন যে সময়টা আসে, আজ তার থেকে আধঘণ্টা দেরিতেই এসেছে সপ্না। কল্যাণী গতকালই বলে দিয়েছিল, একটু দেরিতে এলে অসুবিধা নেই। সপ্না বেশ লম্বা। গায়ের রং মাজা। চোখদুটো বেশ টানাটানা। পাছাছোঁয়া লম্বা বিনুনি করে আসে। চুলে কমলা কনকম্বরমের গজরা পরে। স্থানীয় মহিলারা বলে কানকামরি বা কানকামরা। আর গজরাকে বলে মাল্লা। গন্ধহীন ছোটো ছোটো উজ্জ্বল কমলা ফুল। সপ্নার চুলে এই মাল্লা টুকটুক করে ছন্দে ছন্দে দোলে। সপ্নার একটু বেশিই দোলে। চুল এবং ফুল— দুই-ই। সপ্নার একটা পা অন্য পা থেকে ছোটো। ফলে বেশ খুড়িয়ে হাঁটে। কারণ কল্যাণী জানতে চায়নি। যেমন জানতে চায়নি ঘরে আর কে-কে আছে ইত্যাদি। অফিস যাবার তাড়ায় যেমন বাড়তি কথা বলা যায় না, তেমনই ভাষাগত সমস্যাও আছে। কল্যাণী এতদিন ব্যাঙ্গালোরে আছে, দু-চারটে শব্দ ছাড়া কন্নড় বুঝতে যেমন পারে না, বলতেও পারে না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে বা দোকান-বাজারে হিন্দি আর অফিসে তো সর্বক্ষণ ইংরেজি। আর বাংলা বলার মানুষও গোনাগুনতি। এর বেশি কল্যাণীর প্রয়োজনও নেই। সপ্না দু-একটা কাজ চালানো হিন্দি বলতে পারে, বুঝতে পারে তার চেয়ে একটু বেশি। নয়তো হাত-মুখ নেড়ে ইশারায় কাজ চালায় কল্যাণী। আর এরা কাজ করে করে এতটাই অভ্যস্ত, বেশি বোঝাতেও লাগে না। সব বাড়িতেই তো ঝাড়ু-পোঁছা, বর্তন ধোনা, আর নয়তো চাকু-সবজি এগিয়ে দিয়ে হাত দিয়ে অভিনয় করে দেখানো— এই মাপে এতটা কেটে দাও। এর বেশি প্রয়োজনও পড়ে না। কল্যাণী কাজের লোকের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতেও পছন্দ করে না। বলতে গেলে এটা তো একারই সংসার। শিলাজিৎ যখন থাকত, ওর এসব নিয়ে কোনোই মাথা ব্যথা ছিল না। আর তুতান তো থাকেই না। বছরে সব মিলিয়ে এক মাসও থাকে কিনা সন্দেহ। আজ বন্ধুরা আসছে। আগামী কয়েকটা দিন একটু অন্যরকম কাটবে— এমনটাই আশা কল্যাণীর।

রাতের জন্য কী কী রাঁধবে ভেবে রেখেছে কল্যাণী। মুরগি এনে রেখেছে। সেটা দিয়ে সাধারণ পাতলা মতো ঝোল করবে, ভাত রাঁধবে আর একটা কোনো ভাজা। বেগুন আছে, ভেজে দিলেই হবে। আর কারোর খাওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা আছে বলে জানা নেই। ডিম আছে ঘরে। ডাল একটু করা যেতে পারে। ভাবল কল্যাণী। আজ রাতে অত ঝামেলা রাখার কোনো মানে হয় না। রাজেশ্বরী আগে আসবে। সপ্নাও এসে পড়বে। দেখা যাবে তখন। এখন প্রায় ন-টা বাজে। লগ-ইন করাটা জরুরি। কিন্তু ওই নামেই। মাঝেমধ্যে একটু একটু সাড়া দিয়ে গেলেই হবে। সপ্নাকে নিয়ে ঘর দুটো একটু গুছিয়ে ফেলতে হবে। গোছানোই আছে, তবুও। রাজেশ্বরী বলেছে, আজ রাতটা কাটলে বোঝা যাবে সমস্যা কিছু হচ্ছে কিনা। 'আমি কি একটু বেশিই নির্ভর করছি রাজেশ্বরীর ওপর?'— ভাবল কল্যাণী। একা-একা থাকার অভ্যাসে কল্যাণীর মনে একটু দ্বিধা তৈরি হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই ঝামেলাটা না নিলেও পারত। কিন্তু কী এমন হবে? তিরিশ বছরের অদর্শনে কী এমন ঝামেলা হবে? সমস্যা হলে একমাত্র সংযুক্তার সঙ্গেই হবে। বড্ড কথা বলে সব ব্যাপারে। স্কুলে থাকতেও বলত। আজকাল গ্রুপে বড্ড বেশি ফটফট করে। অবশ্য কল্যাণী নিজের ভাবনা কখনো প্রকাশ করেনি। করে তো প্রাইভেট টিউশন। অত কথা বলার কী আছে! ভেবে পায় না কল্যাণী। করত তার মতো এত দায়িত্বের কাজ। ল্যাপটপে টিং করে একটা আওয়াজ হতে কল্যাণী কাজে একটু মন ফেরাল। আজ শুক্রবার, অত চাপ নেই। বুধবার হলে খুব চাপে পড়ে যেত ও। সামনের বুধবার ছুটি। আসলে ওর ছুটি আগামী এক সপ্তাহ। বলা ভালো পাঁচদিন। আবার সোমবার থেকে অফিস। রোববার দুপুরে সবাই চলে যাবে। নিশ্চিন্ত হবে কল্যাণী। বন্ধুরা আসার আগেই ওদের যাবার কথা ভাবছে কল্যাণী। ভাবল, এটা ঠিক হচ্ছে না। একটু ঘরের কাজ করা দরকার ভেবে হাঁক পাড়ল, 'সপ্না!' ভেতরের বারান্দা মুছতে মুছতে সপ্না উত্তর দিল, 'বর্তিনি আম্মা!' কল্যাণী সপ্নার অপেক্ষা করতে করতে দেখল অফিসের একটা মেল এসেছে। কল্যাণী ভাবল, যদি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে সপ্নাকে নিয়ে যেটুকু কাজ করবে ভেবেছিল, তা আর করা সম্ভব হবে না। মেলটা খুলে দেখল, না, তেমন জরুরি কিছু নয়। সামনের সপ্তাহের কিছু মিটিং নিয়ে চিঠি লিখেছে। কল্যাণী কোনো উত্তর দেবার প্রয়োজন অনুভব করল না। সামনের সপ্তাহ পুরোটাই ছুটি নিয়েছে সে। আর দিনরাত মিটিং আর মিটিং— মাঝে মাঝে খুব ক্লান্ত লাগে কল্যাণীর।

সাড়ে ছটা কি বেজেছে? ওদের ফ্লাইট তো নামার কথা। মোবাইলে চোখ রাখল কল্যাণী। নেমেই ওরা ফোন করবে, সেরকমই কথা হয়েছে। রাজেশ্বরী দুদিন আগেই ব্যাঙ্গালোরে এসেছে। একটা সেমিনারে যোগ দিতে। ওরও এসে পড়ার কথা। তার মানে, মোটামুটি একই সময়ে সবাই এসে পৌঁছবে। কত বছর পর সবাইকে দেখবে! এক কাপ চা বানিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল কল্যাণী। স্যুইমিং পুলে বাচ্চাদের চেঁচামেচি পাঁচতলার ওপর থেকে ভালোই শোনা যাচ্ছে। সামনে ইবলুর পার্কের

পুকুরটা এ-বছর আবার পরিষ্কার করে কেটেছে। দু-তিনটে মরশুম পেলেই জলে ভরে উঠবে। মনে-মনে সেই পুকুরে ক-টা হাঁস ছেড়ে দিল। হাঁসই যখন ছাড়ল, কটা পদ্ম বা শাপলাও ছাড়া যাক। ভালো লাগল ভাবতে। বর্ষাকালে যখন ট্রেনে করে বেড়াতে যেত মা-বাবার সঙ্গে, লাইনের ধারে-ধারে পুকুরে শাপলা ফুটে থাকতে দেখেছে। হাঁস চড়তে দেখেছে। বিকেলের আকাশ ভারি চমৎকার রঙে সেজেছে। আজ বিকেলটা অন্য দিনের চেয়ে একদম আলাদা মনে হচ্ছে। সে কি বন্ধুরা আসবে বলেই? হতে পারে। আবার চোখ মেলে দেখার অবসর বা মনটাই হয়তো হারিয়ে গেছে কল্যাণীর।

কমপ্লেক্সের ভেতরের মাঠে একদল বাচ্চা ফুটবল খেলছে। ছেলে-মেয়ে মিলেমিশে। কল্যাণীর এটা দেখতে খুব ভালো লাগে। বাচ্চাদের আবার লিঙ্গ বিভাজন কী! বড়োরাই ওদের মধ্যে ছেলে-ছেলে, মেয়ে-মেয়ে ভাবনা ঢোকায়। এটা ছেলেদের খেলা, ওটা মেয়েদের খেলা। কলকাতায় এখনো এটা ভাবাই যায় না। নিজের ছেলেটার কথা মনে পড়ে গেল। এখন আর সে বাচ্চা নেই। হোস্টেলে থাকে, রোজই কথা হয়। শুনেছে মায়ের স্কুলের বন্ধুরা আসছে। দীর্ঘ তিরিশ বছর পর সবাই জড়ো হবে। কল্যাণী যতটা উত্তেজিত, তুতান ততটা নয়। ব্যাপারটা বোঝার জন্য আগে ওকে স্কুল ছাড়ার পর তিরিশটা বছর কাটাতে তো হবে! হঠাৎ মনে হল হাতের চা-টা তো ঠান্ডাই হয়ে যাচ্ছে! একটা চুমুক দিয়ে আবার মোবাইলের দিকে তাকাল। কলকাতা থেকে ফ্লাইট ছাড়ার সময় মৃন্ময়ী ফোন করেছিল। সময়মতোই ছেড়েছে। আবহাওয়াও ভালো। দেরি হবার কথা তো নয়! আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এল। কমপ্লেক্সের ভেতর বাতিগুলো জ্বলে উঠল। পুকুরটায় দূরে যাওয়া-আসা করা গাড়ির চলন্ত আলো চিকচিক করছে।

মৃন্ময়ীর ফোনটা এলে বারান্দা থেকে ভেতরে ঢুকে এসে কল্যাণী চায়ের কাপটা রান্নাঘরের বেসিনে রাখতে যাবে, এমন সময় বেল বেজে উঠল। 'হুররে! ওরা এসে গেছে।' তাড়াতাড়ি গিয়ে বিরাট একটা হাসি নিয়ে দরজা খুলে দেখল একজন ডেলিভারি বয়। ধ্যুস্! ভুলেই গেছিল কল্যাণী। এই তো কিছুক্ষণ আগেই ফোন করল মৃন্ময়ী। এত তাড়াতাড়ি কী করে আসবে! মাথাটা গেছে মনে হয়। একটা বড়োসড়ো প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছেলেটা একটা রিসিটে সই করিয়ে নিল। টিং করে একটা আওয়াজ হল। লিফট থামার আওয়াজ। সারাদিনে কতবার এই টিং হয়! কল্যাণী দরজা বন্ধ করে হাতের প্যাকেটটা খাবার টেবিলের ওপর রাখবে বলে দু-পা এগিয়েছে, আবার বেল। 'আবার কে?' সামান্য বিরক্ত কল্যাণী প্যাকেট হাতেই দরজার দিকে ফিরল। দরজা খুলতেই দেখে একজন মেয়ে। রাজেশ্বরী! সঙ্গে ঢাউস স্যুটকেস। চোখে চশমা। চাপা গমরঙা চকচকে চামড়া। বড়োবড়ো চোখে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে আছে। কল্যাণী ছোটোবেলার বন্ধুকে দেখে শব্দ হারিয়ে ফেলেছে। পাঁচ সেকেন্ড মাত্র। রাজেশ্বরী বলে উঠল, 'ঢুকতে দিবি না?' এইবার কল্যাণী 'রাজেশ্বরী!' বলে চিৎকার করে এক হাতে জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে। দুজনেরই চোখ ছলছল করে উঠল। এত বছর পর! আবার যে দেখা হবে, ভাবতে পেরেছিল ওরা? দায়ী— ফেসবুক। দুশমন নাকি দোস্ত!

তিরিশ বছরে প্রায় সবকিছুই বদলে গেছে সবার জীবনে। কে কীরকম ছিল, মনে রাখাও সম্ভব নয়। তবু, স্কুলের বন্ধু, তার সঙ্গে সম্পর্কটা অন্য ধরনের। রাজেশ্বরী ঘুরে ঘুরে কল্যাণীর ফ্ল্যাট দেখছিল। ও জানে কল্যাণীর ডিভোর্স হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই জানে সে-কথা। তুতানের ছবি দেখে রাজেশ্বরী কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী নাম তোর ছেলের?' 'তুতান। ভালো নাম গৌরব।' কল্যাণীর উত্তরে রাজেশ্বরী একটু হেসে বলল, 'বাহ্! তুতান। খুব মিষ্টি নাম। হোস্টেলে থাকে, তাই না? কী পড়ছে?' 'ইঞ্জিনিয়ারিং। কিছু খাবি?'—কল্যাণীর প্রশ্নে রাজেশ্বরী বলল, 'না, খিদে নেই। একটু চা খাওয়া যেতে পারে। কটা বাজে রে? ওরা কখন আসবে, কিছু বলেছে?' 'মৃন্ময়ী ফোন করেছিল নেমে। আর কিছু সময় পড়ে এসে যাবে। চা কি খাবি? বানাব?' কল্যাণীর প্রশ্নের উত্তরে রাজেশ্বরী বলল, 'বানা। আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসি। কোন ঘরে রাখব স্যুটকেসটা?' 'আমার ঘরে। তুই আমার সঙ্গেই শুবি।' বলে কল্যাণী রাজেশ্বরীর দিকে তাকালে দেখল রাজেশ্বরী তার দিকেই তাকিয়ে আছে। 'আমার তাই ইচ্ছা। এবার তোর যদি অন্য কোনো ইচ্ছা থাকে তো বল।' কল্যাণীর কথায় রাজেশ্বরী কাঁধ ঝাঁকিয়ে এমন একটা ইঙ্গিত দিলো যাতে বোঝায়, কোনো কিছুতেই তার কোনো অসুবিধা নেই। কল্যাণী বুঝল, বলল, 'দ্যাখ, এতদিন পার হয়ে গেছে। বয়স বেড়েছে। এখন কে কেমন, কার কেমন স্বভাব... আমার একটু অসুবিধা হতে পারে।' রাজেশ্বরী জিজ্ঞেস করল, 'তুই খুশি নোস? আমাদের আসাটা তুই চাসনি?' 'না, ঠিক চাইনি নয়, একটা সংশয় কাজ করছে। একা থাকা, ডিভোর্স, চাকরি, জেদি ছেলে— সব মিলিয়ে ভেতরে ভেতরে একটা ডিফেন্সিভ অ্যাটিট্যুড কাজ করে বোধহয়। কতটা ভালো লাগবে জানি না। এটাও আমার জন্য একটা পরীক্ষা। তুই, মৃন্ময়ী ঠিক আছে। বাকিদের আমি কোনোদিনই ঠিক হজম করতে পারতাম না।' কল্যাণীর এইসব কথা শুনে রাজেশ্বরী একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'এতটা অসন্তোষ নিয়ে সাত-আটটা দিন কাটাবি কী করে? সংযুক্তা যখন প্রসঙ্গটা তুলল, রাজি হলি কেন?' 'হলাম, একঘেয়ে জীবনে একটু বদল আসবে বলে। আমি জানি, সবার সঙ্গ আমার ভালো লাগবে না। আমি চুপচাপ একা থাকার মেয়ে। একার লড়াই, একার বেঁচে থাকা নিয়ে একটা অভ্যাস তৈরি হয়ে গেছে। সেই অভ্যাসে একটা বদল আনতে চেয়েছিলাম। তা বলে তুই ভয় পাস না, কারোর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করব না। খারাপ লাগাগুলো গিলে নিতে শিখেছি। যা, ফ্রেশ হয়ে নে। আমি চা বসাই।'

রাজেশ্বরী তার সামনের চেয়ারটার দিকে ইঙ্গিত করে কল্যাণীকে বলল, 'এখানে বস। চা করতে হবে না। একটু কথা বল আমার সঙ্গে। তুই আবার বিয়ে করলি না কেন? আই অ্যাম সরি। এভাবে জিজ্ঞাসা করাটা ঠিক নয়। তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু, কিছু মনে করিস না। নতুন কোনো সম্পর্কের কথা

ভেবেছিস কখনো?'

কল্যাণী নিজের হাতের পাতা, নখের দিকে মনোনিবেশ করে বলল, 'ইচ্ছা করেনি। তুতানকে বড়ো করে তোলাটাই একমাত্র দায়িত্ব মনে করেছি। এই ফ্ল্যাটটা কিনতে পেরেছি। একটা পয়সাও কারোর কাছ থেকে নিইনি।'

'শিলাজিৎ?'— রাজেশ্বরী একটু একটু করে মোড়ক খোলার চেষ্টা করছে।

'ওর সঙ্গে যখন ছাড়াছাড়ি হয়, তুতানের বয়স এগারো। তারপর জানতে চাইনি শিলাজিৎ কোথায়, কীভাবে থাকে। আমরা দুজনেই এই দাম্পত্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম বোধহয়। শিলাজিৎ প্রথম প্রথম তুতানের খরচ দিতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। আমি যথেষ্ট টাকা রোজগার করি। তাতে তুতানের আর আমার খরচ খুব ভালোভাবে চলে যায়। একটা গাড়িও কিনেছি। নিজেই চালাই। তবে তুতান একটু অন্যরকম।'

'অন্যরকম মানে?'

'ওর ধারণা আমার কারণেই শিলাজিৎ চলে গেছে। আমি প্রথম প্রথম বোঝাতে চেষ্টা করতাম। অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। জানিস তো, তুতান কী বলে? বলে, মা, আমার পেছনে যা-যা খরচ করছ, সব হিসেব রাখো। আমি চাকরি করতে শুরু করলে তোমার সব টাকা শোধ করে দেবো।'— কল্যাণী এতক্ষণে হাসল। ক্ষীণ।

'রাখিস?'— রাজেশ্বরীও হেসে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। সুদ সমেত!' কল্যাণীর ফোনটা বেজে উঠল। মৃন্ময়ীর ফোন। ফোনটা ধরে কল্যাণী জিজ্ঞেস করল, 'কদ্দূর?' মৃন্ময়ীর উত্তরে কল্যাণী বলল, 'ঠিক আছে, আমি নীচে নেমে দাঁড়াচ্ছি।' রাজেশ্বরীকে বলল, 'আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চলে আসবে। তুই ততক্ষণে ফ্রেশ হয়ে নে। আমার ঘরেই বাথরুম। অসুবিধা হবে না। আমি নীচে যাই। চারজনে মিলে ঝামেলা শুরু করে দেবে। অলরেডি পাশ থেকে সংযুক্তা চেঁচাচ্ছে!' হা-হা করে হেসে উঠল কল্যাণী।

রাজেশ্বরী বুঝল, মোড়কটা অনেকটাই খুলতে পেরেছে। আসলে দীর্ঘদিন সবকিছু চাপা রেখে রেখে কল্যাণীর স্বভাবে গুমোট একটা ভাব এসে গেছে। রাজেশ্বরীর মনে আছে, স্কুলে থাকতে কল্যাণী একটু নাকউঁচু, অহংকারী স্বভাবের ছিল। চট করে মানিয়ে নিতে ওর অহং-এ বাঁধত।

সবাইকে নিয়ে কল্যাণী ওপরে এল। রাজেশ্বরী দরজা খুলতেই সবাই হইহই করে উঠল। সবারই একই অবস্থা। সবাই ভাবছে আবার স্কুল-জীবন ফিরে পেল। কল্যাণীর ভেতরে যাই-ই থাক, মুখে বেশ চওড়া হাসি। বন্ধুদের হইচই-এ পুরো ফ্ল্যাটটা যেন ঝলমল করে উঠল। কল্যাণীর এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। দীর্ঘদিন পর অন্তত কয়েকজন বন্ধুকে একসঙ্গে পেয়ে প্রত্যেকেই প্রাথমিক উত্তেজনায় যেন খেপে উঠেছে। কল্যাণী বলল, 'আমরা এখনো চা খাইনি। তোদের অপেক্ষা করছিলাম। সবাই চা খাবি তো?'

সংযুক্তা সবার আগে হড়বড় করে বলে উঠল, 'আমি কিন্তু লিকার। চিনি দিবি।'

কল্যাণী বুঝল, তার মানসিক চাপ শুরু হল। এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা খাদ্যাভ্যাস, রুচি আছে। কতটা পূরণ করতে পারবে, জানে না। সে বলল, 'বল বল, কার কার কী কী পছন্দ। তাড়াতাড়ি বল। আমি জল বসাচ্ছি।'

প্রত্যেকেই বলল, 'যা বানাবি খাব।'

রাজেশ্বরী একটা ঢিলেঢালা প্যান্ট আর শার্ট পরেছে। সুপর্ণার দৃষ্টি ঠিক পোশাকের দিকে পড়েছে। এলেবেলে পোশাক নয়। ব্র্যান্ডেড। কোম্পানির নামটা দেখতে পেলে ভালো হত। এটা থেকে স্টেটাসটা বোঝা যায়। রাজেশ্বরীর চোখের চশমাটাও বেশ দামি। সুপর্ণার মনে হল, সবার মধ্যে রাজেশ্বরী সব দিক দিয়ে বেশ ক্লাসি, মেইনটেইন্ড। মৃন্ময়ীর নজর এড়ায়নি বিষয়টা। সে সুপর্ণাকে বলল, 'রাজেশ্বরীকে দেখে অমন হাঁ হয়ে গেছিস কেন রে? অনেক পালটে গেছে? স্কুলের সেই রাজেশ্বরী, দু বিনুনি, সাদা ফিতে আর চোখের সেই মিচকি হাসি— খুঁজে পাচ্ছিস না?'

সুপর্ণা সামান্য একটু হাসল। তারপর রাজেশ্বরীকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন ব্র্যান্ডের রে জামাটা?'

রাজেশ্বরী উত্তরে 'ধুর! ফুটপাথ।' বলে কল্যাণীকে সাহায্য করতে গেল রান্নাঘরে। সুপর্ণা একদমই বিশ্বাস করল না। ভাবল, আমার এ-লাইনে বহু বছর হয়ে গেছে খুকি। আমার চোখকে অত সহজে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। ফুটপাথ না হাতি! সুপর্ণার অবাক লাগছে, এখনো কেউ তার শাড়ি নিয়ে কিছু বলল না দেখে। সংযুক্তা একমাত্র এয়ারপোর্টে তার শাড়ির প্রশংসা করেছিল। সুপর্ণা যা শাড়ি এনেছে, সব তার নিজের বুটিকের। সেই শাড়িগুলো দেখে বন্ধুরা নিশ্চয় তাকে শাড়ির অর্ডার দেবে— এমন একটা দাঁও মনে মনে ভেবে রেখেছে। তার শাড়িগুলো রাজেশ্বরীর এই জামার থেকে অনেক বেশি গর্জিয়াস আর দামি। এরা কি মর্যাদা দিতে পারবে? এসব ভেবে সুপর্ণা তার শাড়ির আঁচলটা অহেতুক খোলা-পরা করতে লাগল। একটু উঠে দাঁড়িয়ে কুচিটাও ঠিক করে নিল। নাহ্, কারোর চোখেই পড়ল না। সবাই নিজের খেয়ালে আছে। আর খামোকা 'এই শোন না', 'ওই শোন না' করে হুল্লোড় করছে। বিশেষ করে সংযুক্তা।

রাজেশ্বরী চা নিয়ে এল বসার জায়গায়। কল্যাণীর হাতে দু-তিনরকমের বিস্কিটের প্যাকেট। টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, 'আপাতত এই খা। আর একটু পরেই তো রাতের খাবারের সময় হয়ে যাবে।'

সংযুক্তা অবাক হয়ে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি খাব কী রে! আমি তো রাত সাড়ে এগারোটা বারোটার আগে খাবার সময়ই পাই না। অবিশ্যি তুই ঝাড়া হাত-পা। তাড়াতাড়ি খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়িস। আমার যে কত ঝামেলা...'

মৃন্ময়ী চুপ থাকল না। ও বুঝতে পারছে এ-যাত্রায় বিবেক, বিদূষক, যা-যা রোল আছে সব তাকেই পালন করতে হবে। কল্যাণী চুপ করে থাকবে, বিদিশা চুপ করে থাকবে, রাজেশ্বরী

শুধু মিচকি মিচকি হাসবে আর ওদিকে নন স্টপ কথা বলে যাবে সংযুক্তা। শুধু কথা তো বলবে না, এমন সব বেয়াড়া পরিস্থিতি তৈরি করবে... একটা ঝামেলা না তৈরি হয়। সে বলল, 'সকালে কখন উঠিস?'

সংযুক্তার উত্তর, 'ছটার মধ্যে না উঠলে তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। দাসী বুঝিস, দাসী? আমি তাই। সবার খাওয়া হলে আমার খাওয়া। সবার বাথরুমের কাজ শেষ হলে আমার বাথরুম যাওয়া। নিজের জন্য যেটুকু করি, তা টিউশনি। ওটুকুই আমার এন্টারটেনমেন্ট। ওই নিয়েই বেঁচে থাকি। তাও কী, রাত সাড়ে নটার পর আর নিজের কোনো কিছুই করতে পারি না। হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে জীবন গেল।'

না, সংযুক্তার কথা ফেলা যায় না। ও সত্যি সাদাসিধে ধরনের। মৃন্ময়ীর প্যাঁচ আন্দাজ পর্যন্ত করতে পারল না।

রাজেশ্বরী জিজ্ঞেস করল, 'সিনেমা দেখিস? হলে গিয়ে?'

সংযুক্তা কল্যাণীকে বলল, 'বিস্কুটটা তো বেশ ভালো খেতে। কী বিস্কুট রে? ব্রিটানিয়া?'

কল্যাণী বলল, 'না, এখানে একজন বানায়। অফিসে দিয়ে যায়।'

সংযুক্তা বলল, 'আমার জন্য এক প্যাকেট আনিস তো!'

কল্যাণী বলল, 'আমি তো অফিসে ছুটি নিয়েছি রে।'

সংযুক্তার প্রশ্ন, 'কদ্দিন? সোমবার তো অফিস যাবি?'

কল্যাণী জায়গাটা থেকে একটা ঘরে যেতে যেতে বলল, 'যাব না।' এর বেশি কথা বাড়াবার ইচ্ছা তার নেই। বেশ বিরক্ত সে ইতোমধ্যেই। এইরকম বোকা-বোকা কথাবার্তা কল্যাণীকে চিরকাল বিরক্ত করেছে। ফালতু বকবক করে অন্যের মাথা খাবার মতো এনার্জি এরা কোত্থেকে পায় কে জানে! রাজেশ্বরী কল্যাণীর চলে যাওয়া দেখে মৃন্ময়ীর দিকে তাকিয়ে দেখল, মৃন্ময়ী রাজেশ্বরীর দিকে তাকিয়ে আছে।

চুপ করে বসে থাকা বিদিশাকে কেউ যেন পাত্তাই দিচ্ছে না। না, তা ঠিক নয়, বিদিশা একপাশে এমনভাবে বসে চা খাচ্ছে, যেন তার উপস্থিতি কারোর চোখে পড়ছে না। ম্যাজিকের মতো উবে গেছে সে। চা শেষ করে কল্যাণী যে ঘরে গেছে সেই ঘরের দিকে তাকিয়ে বিদিশা বলল, 'কল্যাণী, কোন ঘরে জিনিসপত্র রাখব রে? এবার তো চেঞ্জ করে ফ্রেশ হওয়া দরকার।' কল্যাণী ভেতরে কিছু একটা করছিল মনে হয়, বা করছিল না। বা নিজেকে সামলাচ্ছিল, বোঝাচ্ছিল এত অল্পে মেজাজ হারালে চলবে না। সামনের কটা দিন আরো ভয়াবহ হতে পারে। বলল, 'রাজেশ্বরী জানে। ওকে জিজ্ঞেস কর।'

রাজেশ্বরী বিদিশাকে বলল, 'তুই ওই ঘরে থাকবি। আমার আর কল্যাণীর সঙ্গে। আর এই ঘরে মৃন্ময়ী, সংযুক্তা আর সুপর্ণা থাকবে।' মৃন্ময়ীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছে না?' মৃন্ময়ী হেসে বলল, 'একদম!' তারপর সবার উদ্দেশ্যেই বলল, 'চ, ফ্রেশ হয়ে নে সবাই। কে আগে বাথরুমে যাবি? দাঁড়া দাঁড়া, কেউ যাবি না; সংযুক্তা যাবে। এখানে প্রতিদিন ওকে এই সুযোগটা দেবো আমরা। যান মহারানি, শিগগিরি বাথরুমে যান।' সবাই হো-হো করে হেসে উঠলেও সুপর্ণা ভেবে পাচ্ছে না, বাজে বকা এই মেয়েটাকে মৃন্ময়ী এত পাত্তা দিচ্ছে কেন?

রাজেশ্বরী মৃন্ময়ীকে আস্তে করে বলল, 'চালিয়ে যা!'

মৃন্ময়ী ফিশফিশ করে উত্তর দিলো, 'কী করব! বুঝতেই তো পারছিস। তবে আমি একা পারব না, তোকেও সঙ্গে থাকতে হবে।'

রাতে খাবারের জোগাড় করার সময় রান্নাঘরে কল্যাণীকে সাহায্য করছিল রাজেশ্বরী। বাকিরা তখনো পুরোপুরি নিজেদেরকে গুছিয়ে উঠতে পারেনি। এই দুজন ছাড়া কাছেপিঠে কেউ নেই দেখে কল্যাণী রাজেশ্বরীকে বলল, 'বিদিশাকে আমাদের ঘরে ঢোকালি কেন?'

রাজেশ্বরী খুব ঠান্ডা গলায় বলল, 'তোর তো আর কোনো ঘর নেই। আমরা ছ-জন। একটু কষ্ট হলেও তো একটা বিছানায় তিনজন করে শুতে পারব। আর তাছাড়া কাকে নিতাম?'

'মৃন্ময়ীকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে না। ওকে নিলে ভালো করতিস।'

'না, ও ও-ঘরে শুক। নইলে হবে না। বিদিশাকে দেখছিস একদম চুপচাপ। ও সংযুক্তা আর সুপর্ণাকে সামাল দিতে পারত না। আর মাত্র তো কয়েক ঘণ্টা। এমনটা করিস না কল্যাণী। বুঝতে পারছি তোর সমস্যা হচ্ছে। একটু সহ্য কর। কটা তো মাত্র দিন।'

'সুপর্ণাটা অমন ন্যাকা কেন রে?'

'ন্যাকা কোথায়? তেমন তো কিছু করেনি!'

'আমার ন্যাকা-ন্যাকা লেগেছে। কী বিশ্রী একটা শাড়ি পরে এসেছে!'

'ওটা ওর বুটিকের শাড়ি। বোধহয় ওর নিজের ডিজাইন করা। খারাপ কোথায়? বেশ রংচঙে, ঝলমলে।'

'তুই থাম! মাংসটা নিয়ে টেবিলে রাখ। আমি ভাত নিয়ে আসছি। দ্যাখ তো মৃন্ময়ীর হল কিনা। ওকে ডাক।'

রাজেশ্বরী একটা হাঁক পাড়ল— 'এই মৃন্ময়ী! হল তোর? এদিকে আয়। একটু হাত লাগা।' চাকরির সুবাদে এমন চড়া গলায় রাজেশ্বরীকে কখনো কথা বলতে হয় না। আর সংসার বলতে একার সংসার। সেখানে কারোর সঙ্গে কথা বলার প্রশ্ন আসে না। সত্যি বলতে কী, চেঁচিয়ে বেশ আরাম হল। মজা পেল। কটা তো মাত্র দিন। একটু খোলামেলা, মুক্তি-মুক্তি স্বাদ। মন্দ না। কল্যাণী না সমস্যা করে।

মৃন্ময়ী না এসে এল সংযুক্তা। টেবিলে রাখা খাবার দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী রান্না করলি রে কল্যাণী? মুরগি মনে হচ্ছে।'

রাজেশ্বরী উত্তর দিলো। বলল, 'হ্যাঁ। ডাক সবাইকে।'

'সুপর্ণা সাজছে।'

'এই রাতে সাজছে মানে?'

'রাতের সাজ। কী সব মাখছে গায়ে। বেশ মিষ্টি গন্ধ। আমি গায়ে নাক ঠেকিয়ে শুঁকেছি। রেগে গেল।' বলে সংযুক্তা খুব একচোট হাসল।

সবাই খেতে বসলে সংযুক্তা ঘোষণা করার মতো কণ্ঠে বলল, 'এই সবাই শোন। কাল থেকে আমিও রান্না করব। কল্যাণী একা শুধু করবে কেন? আমাকে সুপর্ণা হেল্প করবি।'

সুপর্ণার ভেতরটা রাগে ফেটে পড়ছে। যুতসই কিছু মনে আসছে না। এখন তোলা থাক। এর জবাব পড়ে দেবে। মুখে বলল, 'সে আর বলতে! আমি একা কেন, বাকিরাও তোকে হেল্প করবে। কাল সকালে বাজার করে আনিস তুই।'

মৃন্ময়ী বলল, 'আমি বিকেলের দিকে একটু বেরোব। একটা কাজ আছে।'

যথারীতি সংযুক্তা! চুপ না থেকে বলে উঠল, 'বেড়াতে এসেছিস না কাজ করতে এসেছিস? কাজ-ফাজ কলকাতায় গিয়ে করিস। আমরা সবাই সবসময় একসঙ্গে থাকব। এতদিন পরে দেখা!'

রাজেশ্বরী বলল, 'কোথায় যাবি?'

'রাজাজিনগর। দু বছর আগে প্রথম গেছিলাম।'— মৃন্ময়ী উত্তর দিলো।

'অফিসের কোনো কাজ?'— রাজেশ্বরী আবার প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। একজন বাবাজির কাছে।'

'বাবাজি! মাদুলি-টাদুলি দেয় নাকি?'— সংযুক্তা জিজ্ঞেস করল।

'সব দেয়। আমাকেও দিয়েছে। কাল দেখবি, পরে যাব।'

'সেখানে কী করবি? ভাগ্য গণনা?'

'সেটা আগেই হয়ে গেছে। খবর পেয়েছিলাম লোকটা বাঙালি। মুর্শিদাবাদের। দীর্ঘদিন এখানে আছে। তার আগে নাকি হিমালয়ে ছিল। ও যে বাঙালি সেটা এখানে বাইরের কেউ জানে না। লোকটা কন্নড় জানে। হিন্দি জানে। ইংরেজিও জানে। লোকটা ধড়িবাজ। মেয়ে পাচার, মেয়েদের গর্ভবতী করা এসব করে জ্যোতিষচর্চার আড়ালে। ওটাই আসল ব্যাবসা। গত দু-তিন বছর ধরে লেগে আছি এই কেসটা নিয়ে। মনে হচ্ছে এবার এসপার কি ওসপার একটা কিছু হবে। বিদিশা যাবি নাকি আমার সঙ্গে?'

বিদিশা বলল, 'আপত্তি নেই। বাজার-হাটে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। বাবা দর্শন করে আসি। লোকটার নাম কী?'

'সোয়ামি সত্যানন্দ্ মহারাজ।'

'জব্বর নাম!'— রাজেশ্বরী বলল।

'শোন মৃন্ময়ী, আমার বাড়িতে থেকে এসব না করলেই ভালো করবি। আমি চাই না কোনো ঝামেলা হোক।'— কল্যাণীর কঠিন কণ্ঠে সবাই ওর দিকে তাকাল।

'তোকে কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না। লোকাল থানার সঙ্গে আমি আগেই যোগাযোগ করে এসেছি। প্রয়োজনে ওরা আমাকে প্রোটেকশন দেবে।'

'এটা একটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া। এখানে আমাকে থাকতে হয়। এদের নিয়মকানুন আছে যা আমাকে মেনে চলতে হয়। এখানে পুলিশ-টুলিশ এলে আমাকে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে হবে। তুই কাল না গিয়ে পরে যাস। সবাই থাকাকালীন এসব হুজ্জোতি হোক আমি চাই না। তুই তো ব্যাঙ্গালোরে আগেও এসেছিস, তাই না? হোটেলে উঠিস সেক্ষেত্রে। আমি মানতে পারছি না। সরি।'— কল্যাণী নিজের থালাটা নিয়ে উঠে চলে গেল রান্নাঘরে। কল্যাণী কোনো দুর্ব্যবহার করবে না বলেছিল। পারল না।

পুরো পরিবেশটা এতটা পালটে যাবে ভাবেনি মৃন্ময়ী। থম মেরে বসে রইল কিছুক্ষণ। বিদিশা মৃন্ময়ীর পিঠে হাত রেখে বলল, 'নে চল, ওঠ। পরে ভাবা যাবে। এখন আর ভাবিস না।'

সুপর্ণা সাধারণত কোনো কথাই বলে না। কথা বলে সংযুক্তা। সে এতক্ষণ চুপ করে সব কিছু শুনছিল। এবার বলল, 'কল্যাণী তো ঠিকই বলেছে। ঝামেলা তো হবেই। তোদের সাংবাদিকদের কাজকর্মের কোনো ঠিক আছে? হয় নেতা নয় পুলিশ, চোর-ডাকাত, খুন-ধর্ষণ এসব নিয়ে তোদের কারবার। তুই এসব করতে আসবি জানলে আমি অন্তত আসতাম না।' সে-ও থালা নিয়ে উঠে গেল।

মৃন্ময়ী উঠল না টেবিল থেকে। রাজেশ্বরী এবার কথা বলল, 'মৃন্ময়ীকে তো তার কাজ করতেই হবে। আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে ও খারাপ বোধ করে। তোদের ওকে এভাবে বলা ঠিক হয়নি। সবে আজ সবাই এক হয়েছি।' তারপর মৃন্ময়ীকে বলল, 'তোর কি কালকেই যেতে হবে বাবাজির কাছে? দুদিন পরে গেলে হবে না?'

মৃন্ময়ী কিছু না বলে থালা নিয়ে উঠে গেল টেবিল থেকে। ঘরের পরিবেশটা এভাবে নষ্ট করতে সে চায়নি। ভেবেছিল তার এই রোমাঞ্চকর কাজে বন্ধুরা আগ্রহী হবে। তার প্রশংসাই করবে। ঠিক উলটোটা হল।

আর কোনো আড্ডা হল না। সবাই শুয়ে পড়ল। মৃন্ময়ী বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দূরে রাস্তা দিয়ে এত রাতেও একটার পর একটা গাড়ি যাওয়া আসা করছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকল মৃন্ময়ী। এমন সময় পিঠে একটা হাতের ছোঁয়ায় পিছন ফিরে দেখে বিদিশা। সঙ্গে রাজেশ্বরীও আছে। তিনজনে কোনো কথা না বলে রাস্তার দিকে, পুকুরের দিকে, অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে বিদিশা বলল, 'শনি-রবিটা বাদ দে। সোমবার চল। আমিও যাব তোর সঙ্গে।'

মৃন্ময়ী বলল, 'ভাবছি কাল হোটেলেই চলে যাই। সবার অসুবিধা করে এখানে থাকলে নিজেকে আরো দোষী মনে হবে। নিজেকে মিসফিট লাগছে।'

রাজেশ্বরী বলল, 'সে তুই হোটেলে যেতেই পারিস। যেখানে তুই কমফর্টেবল থাকবি, সেখানেই থাকবি। তবে কালই যাস না। দুদিন এখানে আমাদের সঙ্গে থাক। আমি তোর অবস্থাটা বুঝতে পারছি। কিছু মনে করিস না, আচমকা বলেছিস তো, সবাই ঘাবড়ে গেছে।'

বিদিশা বলল, 'না, ঘাবড়ে গেছে তেমনটা নয়। কল্যাণীর সমস্যাটা স্বাভাবিক। কিন্তু সুপর্ণা যেভাবে রিঅ্যাক্ট করল... নেওয়া যায় না। মৃন্ময়ী শোন, তুই হোটেলে গেলে আমিও তোর সঙ্গে হোটেলে চলে যাব। সত্যি বলছি রাজেশ্বরী, আমি শুরুতে এখানে আসার জন্য যতটা উৎসুক ছিলাম, এখন আমার আর

পোষাচ্ছে না। তিরিশ বছরে সবাই পালটে গেছি। পুরোটাই পালটে গেছি। আমরা নিশ্চয় বন্ধুই আছি, কিন্তু বন্ধুত্বটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমার জীবনযাপন তোদের থেকে একদম আলাদা। একা নিজের মতো ছোটো শহরে থাকি। সেখানে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না।'

রাজেশ্বরী বলল, 'আমিও একা থাকি। সারা বছর খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। নিজের ঘরে বছরে কটা দিন থাকি হিসেব করে বলতে পারি। ব্যাঙ্গালোরে আমাকে প্রায় আসতে হয়। কল্যাণীর ফ্ল্যাটে আগে কখনো আসিনি। ফেসবুক আমাদের আবার এক জায়গায় করল ঠিকই, কিন্তু মাঝে এতগুলো বছরের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারল না। বয়স বাড়ার ফলে সবার সহজভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতাও বোধহয় কমে গেছে। সবাই রূঢ় হয়ে গেছি। চল এবার, শুয়ে পড়ি। সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখিস। কাল সকালে যা ভাবার ভাবিস।'

মৃন্ময়ী বলল, 'আমি সবটাই বুঝতে পারছি। আমার এত তাড়াহুড়ো করাটাও ঠিক হয়নি। ভেবেছিলাম... তোরা যা। আমি পরে শোব। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে।'

সকালে সবার আগে ঘুম ভাঙল সংযুক্তারই। বিছানায় মৃন্ময়ী নেই। শুধু সুপর্ণা ঘুমোচ্ছে। মৃন্ময়ী কি চলে গেল কোথাও? তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখল মৃন্ময়ী সোফার ওপরে ঘুমোচ্ছে। খুব মায়া হল সংযুক্তার। কিন্তু সত্যি ওর কিছু করার নেই। কাল যা হয়েছে, তাকে অবজ্ঞাও করা যায় না। কল্যাণীর দিক থেকে কল্যাণী ঠিক আছে। সুপর্ণাটা বেশি পাকা। নিশ্চিন্ত সংযুক্তা বাথরুম থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে কল্যাণীদের ঘরের দরজায় ঠকঠক করে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, তোরা উঠবি না? কটা বাজে জানিস? চা তো হয়ে এল।'

কল্যাণীই আগে উঠে ঘরের বাইরে এসে বলল, 'চা হয়ে গেছে? তুই বানালি?'

'হয়নি, জল চাপিয়েছি। হয়ে যাবে। তুই বাকিদের ডেকে তোল।'

ঘরের ভেতরে রাজেশ্বরী বিদিশাকে ঘুম থেকে তুলে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'বাকি দুজন উঠেছে?'

'না। সুপর্ণাকে আগে তোল। ও তো আবার সাজতে বসবে। মৃন্ময়ী সোফায় ঘুমোচ্ছে। ওকেও তোল। অনেক কাজ। বাজার যেতে হবে।'— সংযুক্তার গিন্নিপনা সার্থকতার দিকে যাচ্ছে দেখে রাজেশ্বরী একটু হাসল। মৃন্ময়ীর কাছে গিয়ে আস্তে করে ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, 'ওঠ রে।'

কল্যাণী বলল, 'কাল থেকে বাজার-বাজার করছিস কেন? আমি তো বাজার করেই রেখেছি। একটু পরে সপ্না আসবে। রান্না করতে বেশি সময় লাগবে না। চা-টা খেয়ে নিই, আমি ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করছি।'

'কিছু করতে হবে না। বেড়াতে এসেছি, ঘরে খাব না। বাজার যাব, তোদের বাজার কেমন ঘুরে-ঘুরে দেখব। ধোসা খাব। ইডলি খাব। তারপর ফিরে দুপুরের রান্না করব। তোকে কিছু করতে হবে না। তোর সপ্না না কে, সে এলে অন্য কাজ করিয়ে নিস।'

'তুই কিন্তু বাড়াবাড়ি করছিস সংযুক্তা।'

চা ছাঁকতে ছাঁকতে সংযুক্তা বলল, 'জানি সংসারটা তোর। কদিনের জন্য আমাদের ধার দে না বাপু! এই সবাই টেবিলে আয়। চা হয়ে গেছে।'

রাজেশ্বরী দূর থেকে বলল, 'কল্যাণী, পাগলিকে ঘাঁটাস না। ও কিছু মন্দও বলেনি। তুই চাপ নিচ্ছিস কেন? কদিন আরাম কর না।'

কল্যাণীর গাড়িতে চারজনের বেশি আঁটবে না। সবাই বাজারে গেলে আর একটা গাড়ি লাগে। মৃন্ময়ী বাজারে গেল না। বিদিশাও যাওয়া থেকে বিরত থাকল। ওদের না যেতে দেখে সংযুক্তা গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, 'তুই কি বাবাজির কাছে যাবার প্ল্যান করছিস?'

মৃন্ময়ী কোনো উত্তর দিলো না। রাজেশ্বরী সংযুক্তাকে বলল, 'বড্ড বাজে বকিস! ও কি ছোটো মেয়ে নাকি?'

সংযুক্তা চুপ করে থাকতে জানে না। বলল, 'না, ছোটো কেন হবে। এই তোরা কী খাবি? আমরা তো রাস্তায় খাব।'

বিদিশা এবার জবাব দিলো, 'আমরাও। আশেপাশে কিছু না কিছু পেয়ে যাব। এখানেই একটু হাঁটাচলা করব। তোরা ফিরে আমাদের ফোন করিস। আমাদের কাছে ফ্ল্যাটের কোনো চাবি নেই। ঢুকতে পারব না।'

কল্যাণী চাবি রেখে দেবার কথা বলল না। বলল, 'হ্যাঁ, করব।'

ওরা চলে গেলে কমপ্লেক্সের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে বিদিশা মৃন্ময়ীকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই খুব আপসেট হয়ে পড়েছিস।'

মৃন্ময়ী বলল, 'কাল আপসেট হয়ে পড়েছিলাম। এখন নতুন করে প্ল্যান বানাতে হবে।'

'কেসটা কী আমাকে বলবি?'

'চল, বাইরে গিয়ে একটা দোসা-টোসার দোকান খুঁজে বের করি। তারপর বলব।'

কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে বড়ো রাস্তার দিকে কিছুটা গিয়েই দোসার গাড়ি দেখতে পেল ওরা। খাবারগুলো মন্দ না। আবার ওরা কমপ্লেক্সের ভেতর ফিরে এসে একটা বেঞ্চে বসল। বিদিশা বলল, 'এবার বল।'

'লোকটা বাঙালি, কালই বলেছি। কিন্তু এখানে সাধারণ মানুষ সে কথা জানে না। তারা জানে বাবাজি হিমালয় থেকে এসেছে। বিহারের হতে পারে, ইউপি-র হতে পারে, হরিয়ানার হতে পারে। কারণ লোকটা হিন্দিটা খুব ভালো বলে। আর বেশ সুললিত কণ্ঠে। লোকটার বয়স ষাটের ওপর বলেই মনে হয়।'

'মুর্শিদাবাদের লোক জানলি কী করে?'

'এর পেছনে মিডিয়া অনেক দিন ধরে ঘুর-ঘুর করছে। আমিই তো গত তিন বছর ধরে লেগে আছি। এ লোকটার কাছে আমি প্রথম আসি দু বছর আগে। ভাগ্য গণনার ছল করে। হোম-যজ্ঞ করে প্রথমে একটা কনকম্বরমের মালা দেয়।

সবাইকে। বলে মন্ত্রপূত।'

'কনকম্বরম মানে?'

'আজ সপ্নার চুলে ঝুলছিল, দেখিসনি? এখানকার লোকাল মহিলারা চুলে ওই ফুলের মালা ঝোলায়। প্রায় সবাই। একটু খেয়াল রাখলেই দেখতে পাবি। কমলা রঙের। যাই হোক, এছাড়াও লোকটা মাদুলি, পাথর এসবও দিয়েছিল। সেগুলো সব ওর থেকেই নিতে হয়েছিল। বাইরে থেকে কিনলে নাকি ফল দেবে না— এই বলে। শোধন-টোধন করে আমাকে পরালো। পরলাম। আর আশ্চর্যের বিষয়, আমি বাঙালি সেটা বুঝে আমার সঙ্গে ঝরঝরে বাংলায় কথাও বলেছিল। কোনো টান নেই কথায়।

'আমরা আগেই খবর পেয়েছিলাম লোকটা নারীপাচার করে। যেসব মহিলাদের দীর্ঘদিন বাচ্চা হয় না, তাদের যাতে বাচ্চা হয়, সে ব্যবস্থাও করে। সবই ওই পুজো-যজ্ঞ-জ্যোতিষ ইত্যাদির আড়ালে। বাচ্চাগুলো শুনেছি সবই ওর ঔরসে জন্মেছে। বা ওর সাগরেদদের ঔরসে। গ্রামগুলো থেকে বহু মেয়েকে এখানে নিয়ে আসে কাজ দেবার লোভ দেখিয়ে। গ্রামে গ্রামে ওর এজেন্ট আছে। আবার অনেক গরিব বাবা-মা মেয়েকে একলপ্তে মোটা টাকা পেয়ে বাবাজির কাছে বিক্রিও করে দেয়।'

'তোর কাজটা কী? আর এটা তো খুব রিস্কি কাজ। তুই একা কেন এসেছিস? সঙ্গে আর কেউ নেই কেন?'

'বলতে পারিস, এবার আমি এসেছি আরো একটু তদন্ত করার জন্য। বা বাবাজিকে খোঁচাবার জন্য।'

'কীভাবে?'

'এই একটু গালগপ্প করব। আর আমি আরো কতটা উপকার পেতে পারি সেসব নিয়ে কথা বলব। আজই যাব। একবার যখন ঠিক করেছি, তার থেকে সরব না।'

'আমিও যাব তো?'

'না, তুই গেলে ওরা সন্দেহ করবে।'

'কারা? বাবাজিরা?'

'না। কল্যাণীরা। বাদ দে, এবার তোর কথা একটু বল শুনি।'

'আমার আর কী কথা। দেখতেই তো পাচ্ছিস। একা থাকি। স্কুলে পড়াই। বড়ো ছুটিতে ঘুরতে যাই।'

'একা ঘুরতে যাস?'

বিদিশা চুপ করে থাকল। মৃন্ময়ী বিদিশার চুপ করে থাকা থেকে বুঝতে পারল তার অনুমানে বোধহয় কোনো ভুল নেই। জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটা কী করে?'

'কোন মেয়েটা?'

'তোর পার্টনার? তোরা একসঙ্গেই থাকিস?'

'একসঙ্গে থাকি না। ও বাঁকুড়ায় থাকে। ব্যাংকে চাকরি করে।'

'কতদিনের সম্পর্ক?'

'অনেক বছর। তুই কীভাবে আন্দাজ করলি?'

মৃন্ময়ী বিদিশার পিঠে হাত রেখে বলল, 'তোর যেমনটা ইচ্ছা তেমনভাবে বাঁচবি। নিজেকে গুটিয়ে রাখিস না।'

'বাকি বন্ধুরা কীভাবে নেবে ব্যাপারটা...'

'আমি কি ওদের সঙ্গে আলোচনা করব, না তুই?'

'বললি না তো কীভাবে বুঝতে পারলি?'

'এই চোখদুটো খুব খারাপ জানিস তো! না-দেখা জিনিসও দেখে ফেলে। স্কুলে থাকতে তুই চুপচাপই থাকতিস। এই কারণেই?'

'বলতে পারিস। ক্লাস নাইনে উঠে বুঝতে পারলাম আমি কী, কী চাই। একটা অপরাধ বোধ আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেত। চেয়েছিলাম বাড়ি থেকে দূরে একা একটা চাকরি নিয়ে থাকব। সেভাবেই বাইরে যাওয়া। তুই ঠিক বুঝবি না কোথায় আমার টানাপোড়েনটা।'

'এক জায়গায় থাকিস না কেন?'

'ছিলাম। ছোটো জায়গা তো, লোকজন বাজে বাজে টিটকিরি দিত। তারপর ও বাঁকুড়ায় বদলি নিয়ে চলে গেল। ওই দ্যাখ কল্যাণীরা এসে গেছে। চল।'

'নামটা বলবি না?'

বিদিশা মৃন্ময়ীর দিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে বলল, 'এটুকু গোপন থাক?' হাসল, 'তুই তো তাকে চিনিস না। দেখাও কোনোদিন হবে না।'

গাড়ি থেকে নেমেই সংযুক্তা হইহই করে মৃন্ময়ীদের বলে উঠল, 'তোরা যে কী মিস করলি জানিস না! ছ-তলা বাজার! ভাবা যায়? কী নেই সেখানে। এক তলায় কাঁচা বাজার, অন্য তলায় মদের দোকান, আর এক তলায় মাছ-মাংস... সে এক এলাহি ব্যাপার।'

বাকিদের নামিয়ে কল্যাণী গাড়িটা পার্কিং-এর জায়গায় নিয়ে যেতে যেতে স্বগতোক্তির মতো হলেও একটু জোরেই বলল, 'শুরু হয়ে গেল।' মুখে মজা নয়, বিরক্তিই ফুটে উঠল। মৃন্ময়ী বুঝল সংযুক্তা বেশ জ্বালিয়েছে ওকে।

'কেন, তুই এরকম বাজার আগে দেখিসনি?'— মৃন্ময়ীর মেজাজ কাল রাত থেকে একদমই ভালো নয়। তবু সে জিজ্ঞেস করল, যেন দায় তারই সংযুক্তাকে বশে রাখার।

'না বাবা, বাপের জন্মে দেখিনি।'— সংযুক্তার চটপট জবাব।

'আবার মৃত মানুষটাকে নিয়ে টানাটানি কেন করিস? নিজের জন্মেই থাক না।'— মজা করে বলল মৃন্ময়ী।

ওরা কল্যাণীর আসার অপেক্ষায় লিফ্টের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বিদিশা জিজ্ঞেস করল, 'কী কী কিনলি?'

'বেংগলি কাট মাছ। নইলে ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ করে মাথা থেকে ল্যাজ পর্যন্ত কেটে দেয়। বলতে হয়, বেংগলি কাট। নতুন শিখলাম। কলকাতায় গিয়ে মাছ কেনার সময় বারবার মনে পড়বে।' বলে সংযুক্তা হাসল, 'কল্যাণী কি আমাদের ফেলে চলে গেল? এখনো আসছে না কেন রে?'

রাজেশ্বরী উত্তর দিলো, 'এত অধৈর্য কেন তুই? আসবে তো। কোথায় যাবে?'

'না, আমাদের ওপর যা বিরক্ত হচ্ছিল। রেগেমেগে শেষকালে আমাদের ফেলে চলেই যাবে।'— সংযুক্তা বলল।

'আমাদের ওপর নয়। তোর ওপর। তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি।'— সুপর্ণা মুখ না খুলে পারল না।

'চুপ কর। আমি তোর মতো ন্যাকা নই। যা বলার স্পষ্ট বলি।'— সংযুক্তার গলায় উষ্মা।

'বাজে কথা বলবি না! আমি ন্যাকা না তুই ন্যাকা? কাল থেকে সবেতেই চিল্লাচ্ছিস। ঘ্যানঘ্যানে বাচ্চার মতো।'— সুপর্ণা ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়।

রাজেশ্বরী এবার বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী হচ্ছেটা কী? তোরা কি এখনো স্কুলে পড়িস? একটা দিনও কাটেনি, এখনই এই? বাকি দিনগুলো তো কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিবি। অন্যরাও বিরক্ত হয়ে যাবে। নিজেদের সামলা প্লিজ।'— রাজেশ্বরী দৃশ্যতই বিরক্ত হয়ে কথাগুলো বলল।

কথা কাটাকাটি বাড়ার আগেই কল্যাণী এসে গেছে। সবাই লিফ্‌টে উঠে পড়ল। কারোর মুখে কোনো কথা নেই। পরিবেশটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। এত বছর পর বন্ধু ঠিকই আছে এরা কিন্তু বন্ধুত্বে দানা বাঁধছে না। তিরিশ বছর আগের আয়নাটা ভেঙে গেছে। টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে বন্ধুত্ব। জোড়া লাগালেও ছবিটা জোড়া লাগছে না।

থমথমে পরিবেশটা ঠিক করার জন্য ফ্ল্যাটে ঢুকে রাজেশ্বরীই প্রথম কথা বলল। কল্যাণী একদম চুপ। মনে হচ্ছে ফ্ল্যাটটা ওর নয়। ও-ও এখানে বেড়াতে এসেছে।

— তোরা কেউ চা খাবি? আমার চা-তেষ্টা পেয়েছে।— বলে রাজেশ্বরী সবার মুখের দিকে তাকাল। কেউ কোনো কথা বলছে না দেখে বিদিশা বলল— বানা না, সবাই খাবে। এই তোরা বাজারে যে গেছিলি, কেমন দেখলি? সংযুক্তা? তোর উৎসাহ তো সব থেকে বেশি ছিল। কেমন দেখলি, বল। কী খেলি তোরা? আমরা দোসা আর বড়া খেয়েছি। বেশ খেতে কিন্তু!

সংযুক্তা কোনো কথা না বললেও সুপর্ণা বলে উঠল, 'বেশি বকবক করছিস কেন তুই? এত কিছু তো বলার নেই।'

মৃন্ময়ী চুপ। কল্যাণী চুপ। রাজেশ্বরী চায়ের জোগাড় নিয়ে ব্যস্ত। বিদিশা এমনিতে খুব কম কথা বলে, কিন্তু পরিবেশটা তো হালকা করতে হবে! এই ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'আরে, বকবক কোথায় করলাম? কী খেলি সেটাই তো জানতে চেয়েছি। বল না, কী খেলি?'

সুপর্ণা উত্তর দিলো, 'রাস্তার ধারে কী-ই বা পাওয়া যেতে পারে বলে তোর মনে হয়? কোনো হোটেল-রেস্টুরেন্টে তো আর যাইনি। রাস্তার খাবার কোনো ভদ্রলোকে খায়! খেতে হল।'

সংযুক্তা এবার আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, 'রাস্তার ধারে বলে তোর আপত্তি, নাকি ভালো শাড়ির কদর হয়নি বলে আপত্তি? কম কিছু তো খেলি না।'

রাজেশ্বরী রান্নাঘর থেকে বলে উঠল, 'চুপ কর তোরা। এখানে কি ঝগড়া করতে এসেছিস? বয়স বেড়েছে, পাল্লা দিয়ে অসহিষ্ণুতাও বেড়েছে। কটা দিন একসঙ্গে কাটাব বলে তো আসা। নিজেদের ইগো নিজেদের কাছে রাখ না। এভাবে তো এক মুহূর্তও থাকা যাবে না। এত বছর পর দেখা, একটু সামলেসুমলে রাখতে পারছিস না নিজেদের?'

সুপর্ণা বলে উঠল, 'দিদিমণিগিরি ফলাস না রাজেশ্বরী। আর আমাকে কেন বলছিস, সংযুক্তা কাল থেকে যা শুরু করেছে, সেটা দেখছিস না?'

'তোকে কোথায় বলেছি? সবাইকে বলেছি। একটু শান্ত হয়ে থাকতে কী হয়? চা হয়ে এসেছে, সবাই এক জায়গায় বস। কাল থেকে তো সবাই ছিটকে ছিটকে আছি। স্কুলের গল্প করি সবাই, আয়।'

আগে হলে সংযুক্তা তড়বড় করে বাজার থেকে আনা জিনিসপত্র নিজেই ফ্রিজে ঢুকিয়ে ফেলত। এখন আর সে উৎসাহ নেই। নিজেকে সংযত করছে অতি উৎসাহ থেকে। কল্যাণীকে তাই জিজ্ঞেস করল, 'এই কল্যাণী, এগুলো কোথায় কোথায় রাখব বল। নষ্ট হয়ে যাবে।'

কল্যাণী এগিয়ে এসে নিজেই সবকিছু গোছাতে শুরু করল। সপনা বিকেলে আসবে। বন্ধুদের বদান্যতায় তার কাজ বাড়ল। আর ভালো লাগছে না। কী কুৎসিত মনোভাব সবার! ছোটোলোক সব!

রাজেশ্বরী চা নিয়ে টেবিলে আসতে আসতে তুমুল বৃষ্টি শুরু হল। এটাই এখানকার স্বাভাবিকত্ব। সারা বছরই বৃষ্টি হয়। কলকাতা বা দিল্লির চোখে যা অপূর্ব। রাজেশ্বরী উচ্ছল হয়ে বলে উঠল, 'আরে, কী অপূর্ব রে! গান গা না কেউ।' সবার দিকে তাকিয়ে দেখল, তেমন উৎসাহ নেই। কারোর মধ্যে। নিজেই গেয়ে উঠল, 'এমনি বরষা ছিল সেদিন...'। সংযুক্তার ইচ্ছে হল বলে, দুপুরবেলা রাতের গান! বলল না।

মৃন্ময়ী ভাবছে, যতই গা, সুর কেটে গেছে। গত রাত থেকেই। তবে এত তাড়াতাড়ি এমনটা হবে, ভাবেনি সে। কেউই বোধহয় ভাবেনি। আজ বিকেল পাঁচটায় তাকে বাবাজির কাছে যেতেই হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। কাউকে কিছুই সে বলবে না। সময় হলে বেরিয়ে যাবে। কাল থেকে কে কোথায় যেতে চাইবে, ঘুরতে চাইবে, আর যাওয়া হবে না। দরকার হলে আজই হোটেলে গিয়ে উঠবে। এখানে থাকলে ভালো থাকবে বলে আর মনে হচ্ছে না মৃন্ময়ীর।

বিদিশা চায়ের কাপটা নিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। সামনেটা পুরো খোলা। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। এতখানি খোলা দেখতে পাওয়া তো হয় না বিদিশার। কারই বা হয়? খেলার মাঠের ধারের গাছগুলো ঝলমল করছে। মিনিট পাঁচেক মাত্র বৃষ্টি হল। তারপর আবার ঝলমলে রোদ উঠে গেল। বিদিশার ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে না। রাজেশ্বরীর গান মাঝপথেই থেমে গেছে। সবাই কিছু একটা নিয়ে হাসার চেষ্টা করছে। স্কুল, স্কুল ঘিরে নানা স্মৃতি সবাইকে হয়তো ঘিরে ধরছে। তার মধ্যে বিবাদই বেশি হবে হয়তো বা। বিদিশার ভালো লাগছে না কিছু। ইচ্ছে করছে মৃন্ময়ীর সঙ্গে নীচে গিয়ে হাঁটতে। কেনই বা শুধু

মৃন্ময়ী? সেটা কি ও বিদিশাকে বুঝতে পেরেছে বলে? হতে পারে।

দুপুরের খাওয়া মিটতে মিটতে তিনটে বেজে গেল। এখনো আবহাওয়া শান্ত হয়নি। গুমধরা ভাবটা কিছুতেই কাটছে না। মৃন্ময়ী নিজের ঘরে ঢুকে ব্যাগ গোছাতে গোছাতে রাজেশ্বরীকে একটু চেঁচিয়েই ডাকল, 'রাজেশ্বরী, একটু শুনবি?'

রাজেশ্বরী ঘরে এসে দেখল মৃন্ময়ী ব্যাগ গোছাচ্ছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাগ গোছাচ্ছিস কেন? চলে যাবি নাকি?'

— হ্যাঁ।

— কোথায় যাবি?

— হোটেলে।

— তারপর?

— তারপর ফোন আছে। ঘুরতে গেলে যদি চাস ফোন করবি, পৌঁছে যাব।

— এটা কি ঠিক হবে মৃন্ময়ী?

ব্যাগ গোছানো থামিয়ে মৃন্ময়ী রাজেশ্বরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একদম ঠিক হবে। আমার আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। যেতেই হবে। এটা মিস করা যাবে না। আর কাল তো দেখলি, আমাকে নিয়ে সবার সমস্যা হচ্ছে। এটাই ঠিক হবে।'

রাজেশ্বরী কী ভাবল, বলল, 'কল্যাণীকে বলে যাস।'

মৃন্ময়ী ব্যাগের চেন আটকাতে আটকাতে বলল, 'তুই বলে দিস। চলি।'

মৃন্ময়ী কাউকে কিছু না বলে স্যুটকেস নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল। সুপর্ণা দেখল, বিদিশা দেখল— কিন্তু কেউ কিছু বলল না। সংযুক্তা সামনে ছিল না, কল্যাণী নিজের ঘরে ছিল। ফলে ওরা কেউ দেখতে পেল না। একমাত্র সংযুক্তাই হয়তো আপত্তি করত। বাকিদের মনে হয় এতে ভালোই হল। বিদিশাকে কেন সঙ্গে নিল না, বিদিশা জানতে চাইল না। এতদিন পরে যতই ব্যক্তিগত কথাবার্তা হোক, মৃন্ময়ীর সিদ্ধান্ত নিয়ে আর কোনো কথা বলতে চাইল না বিদিশা। খালি লিফটের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সাবধানে থাকিস। আমিও তোর সঙ্গে যেতে পারতাম। সেরকম কথাই তো হয়েছিল।' মৃন্ময়ী মৃদু হেসে বলল, 'তোকে বিপদে ফেলব কেন?' লিফট এসে গেছে। বিদিশা আবার বলল, 'ফোন করিস।' লিফট মৃন্ময়ীকে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

রাত তখন বোধহয় দেড়টা। কল্যাণীর ধাক্কায় ধড়ফড় করে উঠে বসল রাজেশ্বরী। স্বাভাবিক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? কটা বাজে?'

কল্যাণী বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, 'থানা থেকে ফোন এসেছিল। মৃন্ময়ীর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি। আমার সঙ্গে চল।'

'তোকে কেন ফোন করল?'

'ওর কল লিস্টে লোকাল নাম্বার হিসেবে আমার নাম্বারটা পেয়েছে। দেরি করিস না। ওঠ। বিদিশাকে ডাক। ওকে বলে যাই।'

রাজেশ্বরী বিদিশাকে ডেকে সব বলল। বিদিশা বলল, 'বেঁচে আছে তো?'

রাজেশ্বরী বলল, 'জানি না।'

বিদিশা ভাবল, মৃন্ময়ী এই আশংকাই করছিল। বিদিশার মন বলছে, অ্যাকসিডেন্ট নয়, খুন।

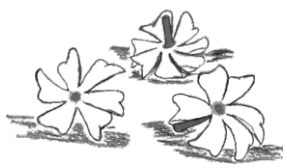

ঊপন্যাস

অপারেশন নন্দাদেবী

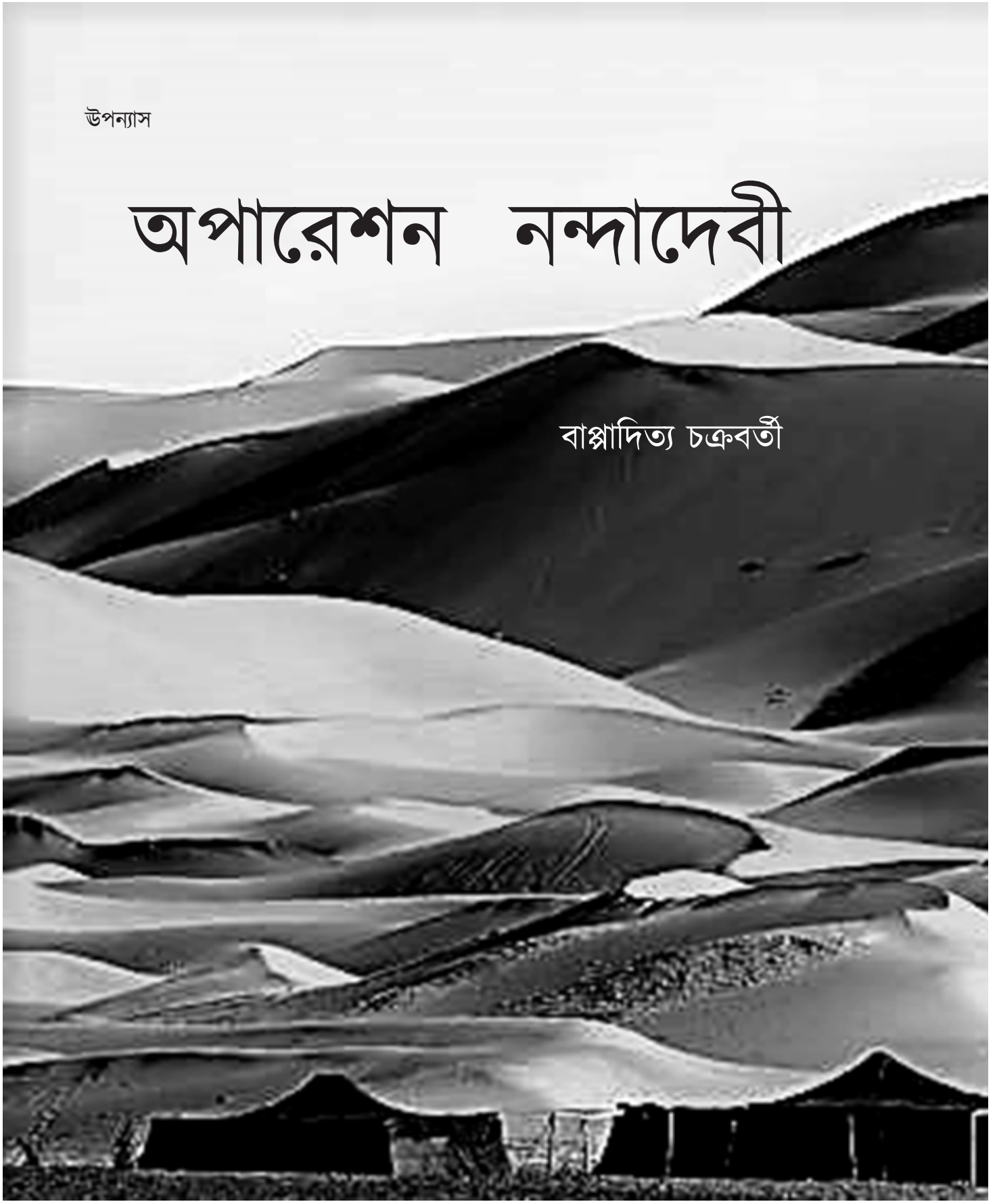

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

পূর্বকথা

জানুয়ারি ১৯৬৫, ওয়াশিংটন, দিল্লি

ওয়াশিংটনে নিজের ঘরে বসে সি.আই.এ-র ডাইরেকটর রাবর্ন ফাইল দেখছেন। বার্লিন থেকে পাওয়া রিপোর্ট। ইস্ট জার্মানির স্পাই এজেন্সি স্টাসি-র কার্যকলাপ সম্বন্ধে। ঘড়ি দেখলেন। রাত সাড়ে এগারটা। এই রিপোর্টটা শেষ করেই বাড়ি যেতে হবে। কাল সকাল আটটায় আবার প্রেসিডেন্টকে ব্রিফ করতে হবে। অবশ্য প্রেসিডেন্ট জনসন ঘড়ি দেখে চলেন না। পাঁচ মিনিট দেরি হলে আকাশ-পাতাল এক করেন না। তবুও। দরজায় টোকা মেরে ঘরে ঢুকলেন রিচার্ড হেমস, একাধারে ডেপুটি ডাইরেক্টর এবং স্পেশ্যাল অপারেশনসের চিফ। ১৯৬১ সালের বে অফ পিগস্‌এর লজ্জাজনক ব্যাপারের পর অনেক অফিসারকে যেমন বিদায় নিতে হয়েছে, তেমনই অনেকের ভাগ্য গেছে ফিরে। হেমস তাদেরই একজন। পাক্কা প্রফেশনাল,

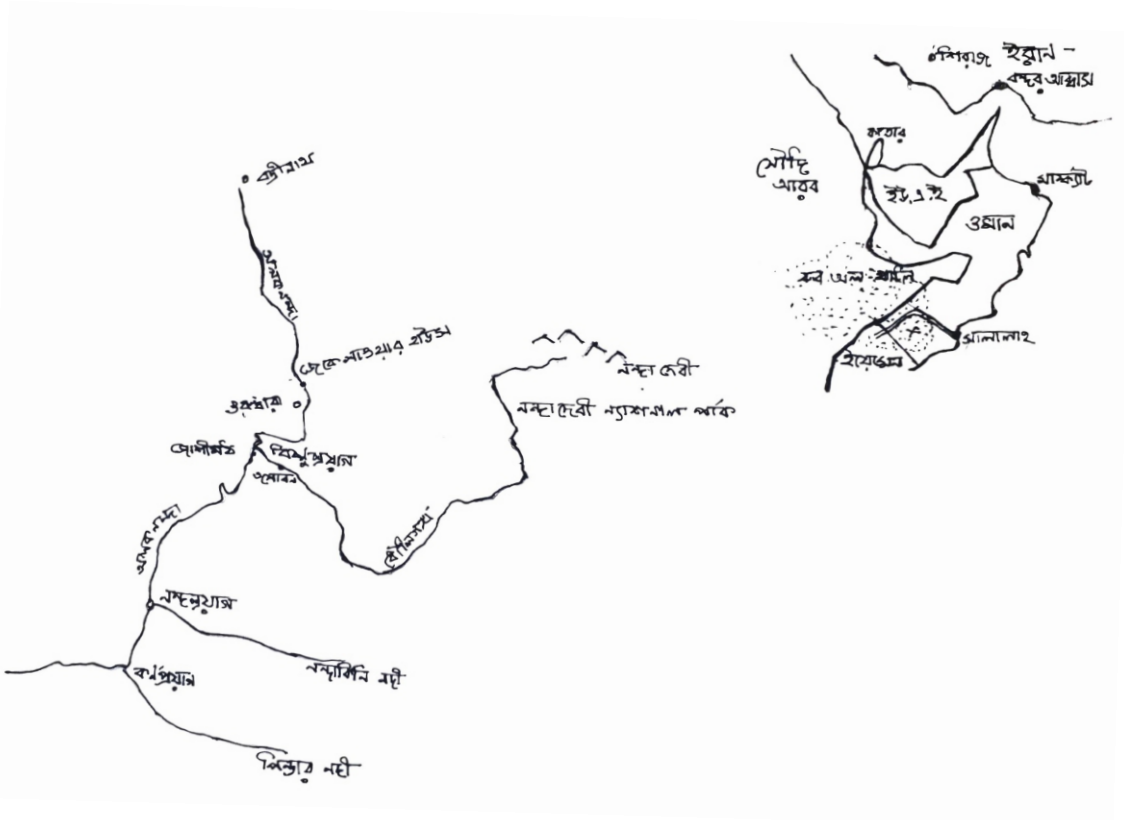

স্পাইগিরির সবদিকেই সজাগ নজর। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে রাবর্ন একেবারে কাঁচা। স্পাইগিরি কখনো করেননি, বিশেষ বোঝেনও না। গোলমাল দেখলেই হেমসের দিকে ঠেলে দেন। প্রেসিডেন্টের ব্রিফিং-এ সবসময় হেমসকে সঙ্গে রাখেন। ভালো ভাবেই জানেন, ওঁর পরে হেমসই ওঁর চেয়ারে বসবে। হেমসও সেটা জানেন। বোধহয় সেই কারণেই দুজনের মধ্যে অসদ্ভাব নেই।

'কী ব্যাপার, রাশিয়ানরা কি ইউরোপ অ্যাটাক করেছে নাকি?' মৃদু হেসেই চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন রাবর্ন।

'ঠিক তা নয়। সেরকম কিছু হলে আপনি রেডিওতেই শুনতে পেতেন, আমার দরকার ছিল না। তবে চিন্তার ব্যাপার নিশ্চয়ই।' হেসেই উত্তর দিলেন হেমস। বে অফ পিগসের পর থেকেই সি.আই.এ-র বাজেটের ওপর সবার নজর পড়েছে, ঠান্ডা লড়াই সত্ত্বেও লোক কমাতে হয়েছে। দুজনেই জানেন। মাথা নাড়লেন রাবর্ন।

একবার নিজের বসের দিকে তাকিয়ে বলে চললেন হেমস , 'আমার চিন্তা চীনকে নিয়ে। গত বছর নিউক্লিয়ার টেস্ট করার পর থেকেই নানারকম কাজকর্ম শুরু করেছে শিনিয়াং আর তিব্বতে। ঠিক কী করছে বোঝা যাচ্ছে না।'

'খুব তাড়া আছে কি?' যেন ঝামেলা এড়াবার জন্যই কথাটা বললেন রাবর্ন।

-'আমার তো তা-ই মনে হয়। বেশি বাড় বাড়ার আগেই ওদের সম্বন্ধে আমাদের জানা দরকার। যদিও নিজেরা নিউক্লিয়ার টেস্ট করেছে – রাশিয়ার সাহায্য ছাড়া তো আর সেটা সম্ভব হয়নি – রাশিয়ানরা যদি ওদের মিসাইল টেকনোলজি দিয়ে থাকে, আর তা-ই দিয়ে ওরা ব্যালিস্টিক মিসাইল বানায়, সেটা তো আমাদের ইমিডিয়েটলি জানা দরকার।'

'হুঁ', কিছুক্ষণ গুম্হয়ে রইলেন রাবর্ন।

মনে মনে হাসলেন হেমস। ভেবে-চিন্তেই টোপটা ফেলেছেন। রাবর্ন নাম কামিয়েছেন আমেরিকার ন্যাভাল মিসাইল সিস্টেম তৈরি করে। মিসাইল ওঁর বড়ো প্রিয়।

-তা, কী করতে চাও?

'একটা লিসেনিং পোস্ট বসাতে চাই, চীনাদের সমস্ত

রেডিও ট্রান্সমিশনের ওপর খবরদারি করতে। বিশেষ করে শিনিয়াং আর তিব্বতে।'
-ভেবেছ কিছু?
'ইন্ডিয়ানদের সাহায্য দরকার হবে। আমার অ্যানালিস্টরা বলেছে, একটা পাহাড়ের চূড়া আছে, নাম নন্দাদেবী, তার মাথায় বসানো যেতে পারে। চূড়াটা ইন্ডিয়ার মধ্যেই পড়ে।'
নিজের কাগজ দেখে উত্তর দিলেন হেমস।
-ঠিক আছে। প্ল্যান দ্য অপারেশন। আমি সায় দিলাম। টক টু দ্য ইন্ডিয়ানস। অফিসারদের সঙ্গে কথা বলো। যদি মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলার দরকার হয়, আমি বুঝে নেব।

* * * *

অফিসে ফিরে ঘড়ি দেখলেন হেমস। রাত বারোটা প্রায় । ওঁর সেক্রেটারি বাইরে বসে। ঘরে ঢুকে ইন্টারকম তুললেন,
'দিল্লিতে কটা বাজে এখন?'
-বেলা প্রায় একটা।
– গেট মি রাও ইন নিউ ডেলহি।
ফোন কেটে গেল। বাজল প্রায় আধ ঘন্টা পর।
'হ্যালো রিচার্ড।' ওপাশ থেকে পি.ভি.আর.রাও-এর গলা। আই.বি-র চিফ।
-হ্যালো পি.ভি.। আই হ্যাভ আ প্রোপোজাল। আর ইউ অন আ সিকিওর লাইন?
-ইয়েস। সো গেট অন উইথ ইট।
-ইটস লাইক দিস, সাম মাউন্টেনিয়ারিং ইনভলভড ...'

* * * * *

পরের দিন রাও প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে ব্রিফ করলেন।
-স্যার, আমেরিকানদের প্রপোজালটা ভালো। খরচ সব ওদের। আমরা কয়েকজন দক্ষ মাউন্টেনিয়ার দেব। লিসেনিং পোস্ট ওদের। একটা নিউক্লিয়ার জেনারেটর থাকছে। প্লুটোনিয়াম। পাহাড়ের মাথায় বসানো হবে। চীনাদের সব রেডিও ট্রান্সমিশন ধরা পড়বে।
প্রধানমন্ত্রী ভাবলেন কিছুক্ষণ। কম কথার মানুষ। কিন্তু ডিসিশন যা দেন, খুব ভেবেচিন্তে।
রাও চুপ করে বসে রইলেন। মিনিট দুয়েক পরে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী, 'ঠিক হ্যায়। শুরু কিজিয়ে। হাঁ, ইয়ে দেখ লিজিয়ে কি লীডার হামারা হো।'
উঠতে গিয়েও একবার বসলেন রাও। প্রধানমন্ত্রী ভুরু তুললেন।
'স্যার, চাভানজী কো...' ওয়াই.ভি. চাভান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তাঁকে ডিঙিয়েই এসেছেন রাও।
-হাম সমহাল লেঙ্গে। আপ অপনা কাম করো।
বাইরে এসে একটু দাঁড়ালেন রাও। লিডার ঠিক করা হয়ে গেছে। মাউন্টেনিয়ারিং টিমের লিডার ক্যাপ্টেন কোহলি। টেকনিকাল টিম লিডার টম ক্রফট – সে আবার নামজাদা মাউন্টেনিয়ারও বটে। অবশ্য টিমের সবাই অভিজ্ঞ মাউন্টেনিয়ার, না হলে ২৩,০০০ ফুট উপরে বরফের পাহাড়ে একটা ৫৬ কেজি ওজনের যন্ত্র বসানোর কথা ভাবা যায় না। অবশ্য এত কথা পিএমকে বলার কোনো দরকার নেই। আপাতত পুরো টিমকে আমেরিকা পাঠাতে হবে, ট্রেনিং-এর জন্য। সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। হাতে মাত্র কয়েক মাস সময়।
গাড়িতে বসে নিজের অফিসের দিকে রওনা দিলেন রাও।

জানুয়ারি ১৯৭২, পাকিস্তান

মুলতান। ঠান্ডা পড়েছে জবরদস্ত। প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো, মিটিং-য়ে পরিষ্কার বললেন, 'অ্যাটম বোম বানাতে ক'দিন?' পাকিস্তান সবে ভারতের কাছে মাত খেয়েছে – মাত্র একমাস আগে। ভুট্টোর কথা শুনে মনে হল, উনি নাৎসি জার্মানির মতো ভারতের বিরুদ্ধে এক হাজার বছরের যুদ্ধের প্রস্তুতি করছেন। একজন ছোকরা বৈজ্ঞানিক বলল, 'পাঁচ বছর।' সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টোর উত্তর, 'টু লেট।' প্রায় শুধু একজনের কথার ওপর নির্ভর করে শেষ পর্যন্ত রফা হল – তিন বছর। গুণীজনের নাম সিদ্দিক আহমেদ বাট – হল্যান্ডে পাকিস্তান এম্ব্যাসির কাউন্সেলর , সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি।
যাঁরা-যাঁরা বোমার পক্ষে নন, বা চাপে পড়ে প্রস্তাব সমর্থন করলেন, তাঁদের মধ্যে হলেন আব্দুস সালাম, তখনকার পাকিস্তানের প্রধান আণবিক বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম, এবং ইশরত উসমানী, পাকিস্তানি অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান। জন্ম ভারতে, শিক্ষা আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি এবং বম্বে ইউনিভার্সিটিতে। নামকরা বৈজ্ঞানিক – ডক্টরেট করেছেন খোদ নীলস বোর-এর কাছে। অ্যাটম বোমার ঘোরতর বিরোধী।
মিটিং শেষ হবার আগেই ভুট্টো সেক্রেটারিকে বললেন, 'নজর রাখো।'
মিটিং থেকে বেরিয়ে গেলেন ভুট্টো। গন্তব্য, লিবিয়া। গাদ্দাফির কাছে টাকা চাইতে হবে। সফরে আরো আছে ইরান, সৌদি, ইজিপ্ট। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর প্রতিশোধ নিতে হবে। ইসলামিক জগতে পাকিস্তানকে

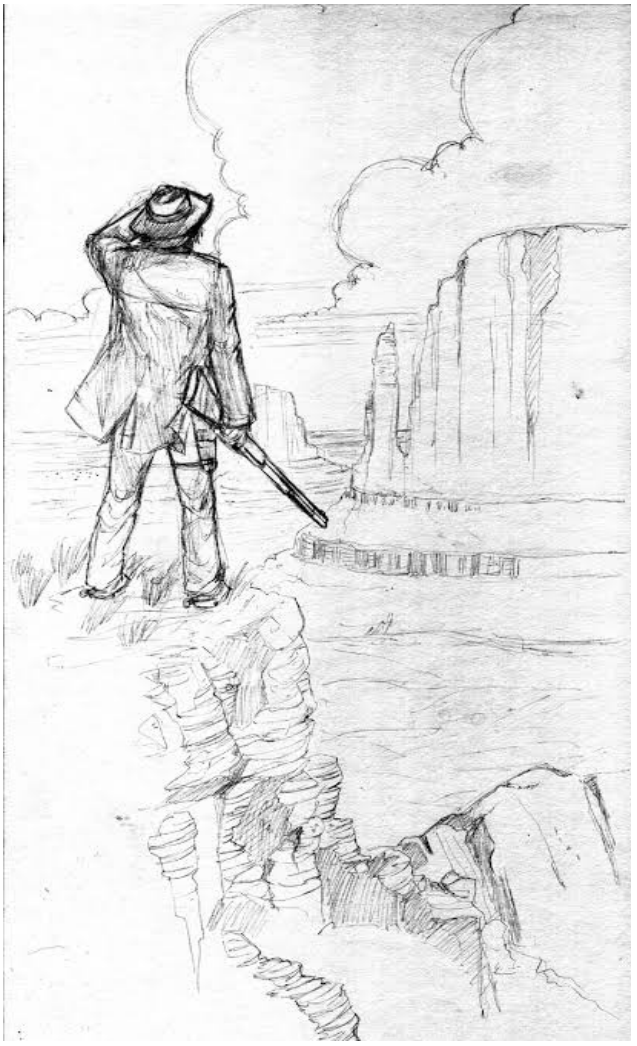

সেরা করে তুলতে হবে, আর নিজেকে করতে হবে সেই সেরা দেশের সেরা নেতা। লাগবে টাকা, সুতরাং গৌরী সেনদের দরজায় দরজায় ঘুরতে হবে। উচ্চাকাঙ্খী ভুট্টোর তাতে আপত্তি নেই।

একই গাড়িতে ইসলামাবাদের দিকে রওনা হলেন উসমানী আর আব্দুস সালাম।

'এটা সম্ভব না।' জানলার বাইরে তাকিয়ে বললেন উসমানী। পোড় খাওয়া লোক। পাকিস্তানের আণবিক কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রায় ছ'শ বৈজ্ঞানিককে বিদেশ থেকে তৈরি করিয়ে এনেছেন।

'সম্ভব করিয়ে ছাড়বে। দেখে নেবেন।' উত্তর দিলেন সালাম।

-আমরা থাকতে তো হবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন সালাম , 'আমাদেরই যেতে হবে।'

'দরকার হলে যেতে হবে বইকি। কিন্তু এত আপোস তো করা যায় না।' নিরুত্তাপ কণ্ঠে উত্তর উসমানীর।

-দেখাই যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

'তবে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে,' বললেন উসমানী, 'এরা ঠিক কোন রুট দিয়ে যাবার কথা ভাবছে ? প্লুটোনিয়াম, না ইউরেনিয়াম?'

-ইউরেনিয়ামে তো অনেক ঝামেলা। প্লুটোনিয়াম রুটই নেবে মনে হয়।

মাথা নাড়লেন উসমানী, 'হয়ত দুটোই।'

দুজনেরই অজান্তে সেইদিনই রাত্রে জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, স্যুইডেন, হল্যান্ড এবং আমেরিকায় যত পাকিস্তানি দূতাবাস এবং কনসুলেট, সবার কাছেই নির্দেশ গেছে, 'গেট দ্য টেকনোলজি, গেট দ্য মেটিরিয়াল'।

আমস্টারডাম, হল্যান্ড, জুন ১৯৭৫

শেষ পর্যন্ত প্লেনে উঠে বাঁচল কাদের খান। গত তিন বছরের টেনশন শেষ হল। পেশায় ধাতুবিজ্ঞানী আব্দুল কাদের খান গত তিন বছর ধরে আণবিক টেকনলজি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে, এবং নিজের দেশ পাকিস্তানে সেই টেকনলজি, বিশেষত ইউরেনিয়াম থেকে শুরু করে অ্যাটম বোমা পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছনো যায় সেই বিদ্যা, নিজে ত রপ্ত করেছেই, পাকিস্তানেও পাঠিয়েছে। এখনো কাজ বাকি আছে, কিন্তু দেশে সরে পড়া ভালো। ডাচ ইন্টেলিজেন্স যে পিছনে লেগেছে, সেটা বহুদিন থেকেই জানে কাদের খান। এতদিন কিছু করেনি, তার একমাত্র কারণ হল, ডাচ ইন্টেলিজেন্সের ওপর সি আই এ-র চাপ। তারা ডাচ ইন্টেলিজেন্সকে বুঝিয়েছে যে, পাকিস্তানের অ্যাটম বোমার প্রোগ্রাম সম্বন্ধে জানতে হলে খানকে ছেড়ে রাখাই ভালো। এই করে তিন বছর কেটে গেছে। তবে এখন ইন্ডিয়ানরা চাপ দেওয়া শুরু করেছে, সুতরাং ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কত না লড়াই করতে হয়েছে। বিভিন্ন ইউরোপীয়ান কোম্পানিদের চোখে ধুলো দিয়ে সেন্ট্রিফিউজের ব্লুপ্রিন্ট জোগাড় করা থেকে শুরু করে তার পার্টস অর্ডার দেওয়া, সবই করেছে খান। অবশ্য বাট সর্বক্ষণই পাশে ছিল, তাতে অনেকটা সুবিধা হয়েছে। জার্মান ব্যবসায়ী হার্ম্যানকে দিয়ে করাচির আর্শাদ আমজাদ আরবিদ প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সই করানো হয়ে গেছে ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড তৈরি করার তিনটে প্লান্টের জন্য। আরো অনেক কাজ হয়ে গেছে। তবে শেষের

দিকে হতচ্ছাড়া ফ্রিটস্ভীরম্যানের রিপোর্টের জন্য ইউরেনকো-র অত সুবিধাজনক চাকরিটা ছাড়তে হল। বস্তুত ইউরেনকোর সেন্ট্রিফিউজের ব্লুপ্রিন্টের উপর ভরসা করেই কাদের খান এগিয়েছে।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল খান। যাক, যা গেছে তা যাক্– এবার পুরস্কারের পালা। সামনে নতুন করে শুরু করার উৎসাহ, আর পিছনে.... উর্সুলার কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। এছাড়া লড়াই তো করতেই হবে। প্রথম লড়াই, সালামের সঙ্গে, প্লুটোনিয়াম ভার্সাস ইউরেনিয়াম। খবর যা, প্লুটোনিয়াম রুট দিয়ে কাজ অনেক এগিয়েছে, তবে কাদেরের হিসাবে, ধোপে টিকবে না।

ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ডিসেম্বর, ১৯৭৫

'কী অবস্থায় তাহলে আছি আমরা', উসমানীর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে, সেটার দিকে খেয়াল নেই। সামনে বসা জনা দশেক বৈজ্ঞানিক, আর তাদের টিম লিডার সালাম।
'বছর তিনেক লাগবে। তবে আমার একটা সন্দেহ আছে। প্লুটোনিয়াম পাওয়া গেলে হয়। লন্ডন ক্লাব নানারকম শর্ত লাগিয়েছে।' একজন বৈজ্ঞানিকের মন্তব্য।
ধোঁয়া ছেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলেন উসমানী, 'চুড়ি-পরা পুলিশ। ওদের দিয়ে কী হবে ? দেখলে না, কীভাবে ওদের নাকের ওপর দিয়ে সেন্ট্রিফিউজের জন্য ভালভের পাইপ কিনে আনা হল ?'
সালাম এতক্ষণে মুখ খুললেন, 'কিছু প্লুটোনিয়াম কম পড়ছে আমাদের কাজের জন্য। তাড়াতাড়ি কিছু জোগাড় করা যায় ?'
'এখুনি কী দরকার?' সবাই জানে, উসমানী অ্যাটম বোমার পক্ষপাতী নন।
-হলেই ভালো হয়। আসলে এটা আমাদের প্ল্যান বি। আমরা একটা স্ন্যাপ (সিস্টেম নিউক্লিয়ার অক্সিলিয়ারি পাওয়ার জেনারেটর) বানাব। আমাদের বোমার প্ল্যান তো এগোচ্ছেই, এটা সরকারের কাছে আমাদের একটা বিল্ড-আপ বলা যায়। ইউরেনিয়াম রুট নিয়ে যারা কাজ করছে, তাদের সঙ্গে টক্কর দেবার জন্য।
'ঠিক আছে। দেখছি কী করা যায়। তবে তোমাদের আইডিয়া ভালো।' মনে মনে নিজেকে তারিফ করলেন সালাম। সাহেবের মত পাবার এই একটাই রাস্তা ছিল।
* * * *
ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে যাবার পর উসমানী লাল ফোনটা তুলে একটা নম্বর ডায়াল করলেন।
-সালাম আলেইকুম, জিলানী সাহাব। সব্খৈরিয়ত?
-আলেইকুম অস্সলাম, উসমানী সাহাব। কহিয়ে, কৈসে ইয়াদ কিয়া?
-মদদ চাহিয়ে।
'ফরমাইয়ে। ইসিলিয়ে তো বৈঠে হ্যাঁয়।' গুলাম জিলানী খান পাকিস্তানি গুপ্তচর বাহিনী আই.এস.আই এর চিফ। ভুট্টোর ডান হাত। বা উল্টোটাও বলা যায় । উসমানীর কথা শুনে বললেন, 'দেখছি'। মনে মনে হাসলেন। উসমানীর তো মাত্র আর কয়েকটা দিন। তবুও, কথাটা মন্দ বলেনি। পুরো ব্যাপারটা একটু বাজিয়েই দেখা যাক না।

ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, এপ্রিল ১৯৭৬

মুনির আহমেদ খান এখন পাকিস্তানি অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান। উসমানীকে মাত্র একমাস হল চেয়ার ছেড়েছেন। অবশ্য ছাড়ানো হয়েছে বলাই ভালো। পাকিস্তানে নতুন আইন পাশ হয়েছে আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে। উসমানী আহমদিয়া। দেশ থেকে পালাবার তোড়জোড় করছেন শোনা গেছে। মুনির আহমেদ যত না বৈজ্ঞানিক, তার থেকে বেশি পলিটিশিয়ান। কাদের খান পাকিস্তানে ফেরৎ আসার পরে অবশ্য প্রতিপত্তি একটু কমেছে। তবে এক মাঘে তো শীত যায় না, মুনির খানও নিজের খেলা খেলে চলেছেন। কাদের খান নিজেই নিজের কবর খুঁড়বে বলে ওঁর ধারণা।
এহেন মুনির খানের তলব পড়েছে আজ সকালে আই.এস.আই চিফের ঘরে।
-'জনাব, আপনার আগের চেয়ারম্যান আমাকে একটা কাজ দিয়েছিলেন গত বছর। সম্প্রতি সে- কাজ কিছুটা এগিয়েছে। আমার জানা দরকার আপনাদের এখনো ইন্টারেস্ট আছে কিনা।' গুলাম জিলানীর হাতে সিগারেট, মুনির খানকে অফার করেননি। বোধহয় দুজনের তফাৎটা বোঝাবার জন্য। মুনির লক্ষ্য করেছেন, কিছু বলেননি। সময় আসবে।
-আপনি কি স্ন্যাপ জেনারেটরের কথা বলছেন? ব্যাপারটা আমি জানি। যেদিন ওই নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, আমি ওখানেই ছিলাম।
-ভালোই হল। আমাকে আর বিস্তারিত বলতে হবে না। তা, আপনাদের যদি এখনো ইন্টারেস্ট থাকে, তাহলে

এগোনো যেতে পারে।
-কী ভাবে ?
সিগারেট হাতেই জিলানী উঠে গেলেন জানলার দিকে।
-১৯৬৬ সালে আমেরিকান আর ইন্ডিয়ানরা মিলে একটা লিসেনিং পোস্ট বসিয়েছিল নন্দাদেবী পাহাড়ে। চেষ্টা করেছিল তার এক বছর আগেই, তবে কিছু করে উঠতে পারেনি। তবে মেশিনটা, যাতে আপনাদের ওই স্ন্যাপ জেনারেটর ছিল – সেটা হারিয়ে যায়। পরের বছর গিয়ে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে ইদানীং কিছু খবর এসেছে তাতে মনে হয় মেশিনটা ওখানেই কোথাও আছে। সেটা হাত করার চেষ্টা করা যেতে পারে।
মন দিয়ে শুনছিলেন মুনির। এরকম একটা কিছু হাতে এলে কাদের খানকে কায়দা করা খুব একটা শক্ত হবে না। জিলানী থামতে বললেন, 'ইন্টারেস্ট আমাদের পুরোপুরি আছে। তবে দুটো প্রশ্ন।'
ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন জিলানী।
-বলুন।
-এক, ইন্ডিয়ানরা আর চেষ্টা করেনি ?
-করেছিল, নন্দাকোট চূড়োয় এর একটা যন্ত্র বসিয়েছিল। সেটা এক বছর চলে আর চলেনি।
-কারণ জানা গেছে?
-রেডিওঅ্যাক্টিভ জেনারেটর থেকে যা উত্তাপ বেরিয়েছিল তাতে পুরো যন্ত্রটাই প্রায় দু'মিটার গর্তের মধ্যে ঢুকে যায়। অ্যান্টেনা বেঁকে যায়। অনেক কষ্টে ইন্ডিয়ানরা যন্ত্রটা বার করে নিয়ে যায়।
-প্রথম মেশিনটা যে এখনো আছে, তার প্রমাণ পেলেন কী করে?
-সেটা আমার ব্যাপার। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন?
-এটা জোগাড় করা কতদূর সম্ভব? আমি কি সম্ভব ভেবেই চলতে পারি?
হাসলেন জিলানী, 'আমাদের পেশায় সম্ভব বলে কিছু নেই। অসম্ভব বলেও নয়। আমরা দুয়ের মাঝখানের গ্রে এরিয়াতে কাজ করি। সুতরাং গ্যারান্টি দিতে পারব না। তবে আমার আশা আছে।'
-'আপনার আশার ওপর ভরসা করেই চলব। আফটার অল পাকিস্তানে আল্লাতালার পর তো আপনারাই।' ব্যাঙ্গোক্তিটা করে মুনির ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সিগারেট না-দেবার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে।

এখন
প্রথম দিন
দিল্লি সন্ধ্যে ৭:০০ – রাত ১১:০০

রাধেশ্যাম গুপ্তা। পেশায় ওয়াটার কোয়ালিটি স্পেশ্যালিস্ট। উত্তরাখন্ডের শ্রীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর। রোগা পাতলা চেহারা। ডক্টরেট করেছেন আই.আই.টি কানপুর থেকে। জলে-জঙ্গলে ঘোরাটাই নেশা। তবে আপাতত ঘুরছেন দিল্লির বিভিন্ন মন্ত্রকে। হাতে কতকগুলো কাগজ নিয়ে। পরিবেশ মন্ত্রালয় থেকে বিজ্ঞান মন্ত্রালয় সব ঘুরে ফেলেছেন। কোনো জায়গাতেই ডেপুটি সেক্রেটারির ওপর উঠতে পারেননি। মনে মনে 'চুলোর দোরে যাক' বলে বিকালের ট্রেন ধরার আগে শেষ চেষ্টা করবেন বলে রওনা দিলেন ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জির অফিসে। অটো ধরলেন একটা। পকেট থেকে মোবাইল বার করে ঠিকানা চেক্করলেন – ওয়েস্ট ব্লক, রামকৃষ্ণপুরম। যেতে লাগল আধ ঘন্টা। রিসেপশনে নাম লেখালেন। ফর্ম ভরতে হল। কার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন? ডক্টর গুপ্তা কাউকেই চেনেন না। তবে অটোতে বসেই ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে অফিসারদের নাম দেখেছেন। মনে মনে ঠিক করে

নিয়েছেন ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করবেন। ওঁর কাগজে যা লেখা আছে তাকে তো ক্রাইসিসই বলা যায় ?

পরের প্রশ্ন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ? নেই। কী বিষয়ে ? কনফিডেনশিয়াল। নিজের নাম আর পদ লিখে সই করে কাগজটা ধরিয়ে দিলেন। রিসেপশনের করণিক একবার দেখল। কিছু না-বলে ফোন করল একটা। একজন পিয়নকে ডাকল। 'যাইয়ে ইসকে সাথ।' পিয়নের পিছনে চলতে চলতে গুপ্তা ভাবলেন, ভাগ্য একটু ভালো হয়েছে মনে হয়, নয়ত দেখাই হত না । এখন বড়ো সাহেব কথা শুনলে হয়।

ডক্টর মিশ্রা। ফলক লাগানো ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকে সেক্রেটারির ইশারায় ভিতরের দরজায় টোকা দিয়ে বড়ো ঘরে ঢুকলেন। ঘরের মাঝামাঝি জনা আটেকের বসার একটা টেবিল। একপাশে সোফা, অন্য পাশে সাহেবের টেবিল। গুপ্তাকে ঢুকতে দেখে মিশ্রা নিজেই উঠে এলেন। একটু হেসেই বললেন, 'আমি শ্রীনগর ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম একসময়। আপনার নাম শুনে ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে গেল। বসুন।' হৃদ্যতা দেখে একটু আশ্বস্ত হলেন গুপ্তা। সোফায় গিয়ে বসলেন।

-বলুন, কী আপনার কনফিডেনশিয়াল ব্যাপার। কিন্তু তার আগে....চা খাবেন তো?

মাথা নাড়লেন গুপ্তা। সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে গলা শুকিয়ে গেছে। হাতের কাগজগুলো পাশে রেখে শুরু করলেন, 'আমি গত একবছর ধরে ঋষিগঙ্গার বিভিন্ন জায়গায় জলের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করছি। লক্ষ্য করেছি জলের রেডিওঅ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেছে। এর আগেও এরকম হয়েছে কিনা জানবার জন্য লাইব্রেরি আর অন-লাইন যা কিছু আছে দেখেছি। ১৯৭৭ সালে এরকম একটা অ্যানালিসিস করা হয়েছিল। দুটো আমেরিকান ল্যাবরেটরিতে পাঠান হয়েছিল স্যাম্পল। একটা ল্যাবরেটরি কিছু পায়নি, আরেকটা বলেছিল রেডিওঅ্যাকটিভিটি আছে। পি.এম কে জানানো হয়েছিল ব্যাপারটা। কিন্তু তারপর আর কিছু হয়নি। আমি জানতে পারলাম যে স্যাম্পল নেওয়া হয়েছিল অনেক নীচে, ধৌলিগঙ্গা আর অলকনন্দার সঙ্গমে। আর সেগুলো কোনো সায়েন্টিফিক ভাবে নেওয়া হয়নি। ফলেই হয়ত ঐরকম সব রেজাল্ট বেরিয়েছিল।'

-এসবের ডিটেল আপনার কাছে আছে?

'হ্যাঁ। সঙ্গে নিয়েই এসেছি।' কাগজের তাড়া বাড়িয়ে দিলেন ডক্টর গুপ্তা।

কাগজগুলো হাতে নিয়ে পাশে রাখলেন ডক্টর মিশ্রা। 'ঠিক আছে। পরে দেখব। কপি আছে তো?'

-আমার কম্পিউটারে আছে। তবে এনক্রিপ্টেড ফাইলে।

হাসলেন মিশ্রা। 'আপনার এনক্রিপশন অন্যদের কাছে জলবৎ। সে যাক, তারপর বলুন।'

'আমার পুরো একবছরের রেকর্ড এই কাগজে রয়েছে। আপনি দেখুন যে ইউরেনিয়াম ২৩৫ আর ইউরেনিয়াম ২৩৮ এর ট্রেস রয়েছে। আপনি তো জানেন প্লুটোনিয়াম ক্ষয় হয়ে এই দুটো তৈরি হয়। আর গত এক বছরে এর পার্সেন্টেজ বেড়েছে প্রায় তিরিশ। আর তাছাড়া বেড়েছে অন্যান্য রেডিওঅ্যাক্টিভ মেটিরিয়ালের পরিমাণ। এটা ন্যাচারাল কিছুতেই হতে পারে না। কোথাও একটা প্লুটোনিয়াম ক্ষয় হচ্ছে। সেটা নদীর জলে আসছে।' চায়ে একটা চুমুক দিলেন ডক্টর গুপ্তা।

ডক্টর মিশ্রা ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'আপনি ১৯৭৭-এর কথা বলছিলেন না ? কী একটা ব্যাপার... হ্যাঁ মনে পড়েছে ... ষাটের দশকের মাঝামাঝি, সালটা ঠিক মনে পড়ছে না , প্লুটোনিয়াওয়ালা একটা যন্ত্র বসানো হয়েছিল নন্দাদেবীতে। তারপর যন্ত্রটার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। হতে পারে সেটার থেকেই আপনার রেডিওঅ্যাক্টিভিটির উৎপত্তি।'

'ঘটনাটা আমিও পড়েছি,' বললেন ডক্টর গুপ্তা। 'তবে আমার ধারণা, যদিও যন্ত্রটাতে সাতটা প্লুটনিয়ামের রড ছিল, এত বছরে ক্ষয় হতে হতে নিশ্চয় সেটা এটা স্টেব্ল জায়গায় এসেছে, অন্তত আসা উচিৎ। সেক্ষেত্রে, তেজস্ক্রিয়তার এই বৃদ্ধির হারটা মেনে নেওয়া যায় না। তাহলে বাড়ছে কেন? আর আমি আপনাকে যে তিরিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধির কথা বলেছি, সেটা গড়পড়তা। আমার পনেরো দিন আগেকার রেকর্ড বলছে, বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় সাঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট। সেটা দেখেই আমি ভাবিত হয়ে ছুটে এসেছি দিল্লিতে।'

-আপনার থিওরি কি?

-দুটো কারণ হতে পারে। প্রথম, কোনো ভাবে যন্ত্রটা এমন জায়গায় এসে পড়েছে যেখানে সব রেডিওঅ্যাক্টিভ মেটিরিয়ালই জলে চলে যাচ্ছে। তবে আমার এটা মনে হয় না। আর দ্বিতীয়, কেউ বা কারা সুযোগ নিয়ে বেশি করে রেডিওঅ্যাক্টিভ মেটিরিয়াল ঢোকাচ্ছে। এটা বেশি বাড়লে পুরো গঙ্গার জলকে বিষাক্ত করে দেবে। একদিনে হবে না। কয়েক বছর, বা তার বেশিও লাগতে পারে। কিন্তু ততদিনে গঙ্গার জল যে কোটি কোটি মানুষ ব্যবহার করে তাদের জীবন শেষ।'

-আপনার প্রথম থিওরি গ্রহণযোগ্য নয় কেন?
-কারণ, আপনি তো জানেন, ইউরেনিয়াম খুবই ভারী। বরফের মধ্যে দিয়ে নীচে চলে যেতে কোনো অসুবিধে নেই। প্লুটোনিয়ামের ফিশন হবার সময় যে উত্তাপ হয় তাতেই বরফ গলে গিয়ে ইউরেনিয়াম অণু নিজের ভারে জলে গিয়ে মিশবে। তা-ই যদি হয়, তাহলেও তো একটা না একটা জায়গায় এসে পুরো ব্যাপারটা স্টেব্ল হবে। কিন্তু এখানে তো দেখছি সেরকম কোনো লক্ষণ নেই। অবশ্য এটাও তো থিওরি। গ্রাউন্ড এক্স-রে না করলে তো কিছু বোঝা যাবে না।
-হুম্। ঠিক আছে, দেখছি আমি। আপনার প্রাইভেট নম্বর আমাকে দিয়ে যান। আর কিছু জানাবার আছে আমাকে?
একটু ইতস্তত করলেন ডক্টর গুপ্তা, 'দেখুন, হয়ত খুবই ছোটো ব্যাপার, বা হতেও পারে আমার কল্পনা, তবে ...'
-বলে ফেলুন। হতেও পারে জরুরি।
-আমার কাজের ব্যাপারে হাঙ্গেরির ভিটুকি ইন্সটিটিউটের ডক্টর মিহাই মোলনারকে ইমেইল করেছিলাম। ডক্টর মোলনারের সঙ্গে আমার আলাপ হয় মাস ছয়েক আগে, সিঙ্গাপুরে একটা কনফারেন্সে। মোলনারকে ইমেইল করার কিছুদিন পরে থেকেই আমার মনে হত কারা যেন আমার ওপর নজর রাখছে। আমি সাধারণত নির্জন জায়গাতেই ঘুরে বেড়াই। নির্জন জায়গাই আমার পছন্দ। কেউ বিরক্ত করে না। তিন-চার দিন ধরে স্যাম্পল জোগাড় করি, নিজে তাঁবু খাটিয়ে থাকি। জিপে করে কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে যাই। বেশির ভাগ সময়েই ফিল্ডেই অ্যানালিসিস শুরু করে দিই। যাই হোক, ওই যে বললাম, আমার মনে হত কেউ বা কারা আমার ওপর নজর রাখছে। পায়ের ছাপ, ঝোপ-ঝাড়ের ভাঙা ডাল ইত্যাদি দেখে আমার সন্দেহটা আরো বদ্ধমূল হয়। সেই কারণে আমার দিল্লি আসা। যত তাড়াতাড়ি সরকারের নজরে এটা আনা যায়, ততই মঙ্গল বলে আমার ধারণা।
'আপনার সন্দেহ যদি অমূলক না হয় তাহলে সেটা আপনার দ্বিতীয় থিওরিটাকেই সাপোর্ট করছে', একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর মিশ্রা, যেন এরকম কিছুই উনি আশঙ্কা করছিলেন, তারপর বললেন, 'আর কারো সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছে ? আপনার ইউনিভার্সিটি বা এখানে দিল্লিতে?'
'দিল্লিতে কারো সঙ্গে হয়নি। আজ বেশ কয়েকটা মন্ত্রকে গিয়েছিলাম, কারোর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। আমি এমনিতেই এখানে কাউকে চিনি না। আপনার এখানে আসাটা একটা লাস্ট ডেস্পারেট অ্যাটেম্পট বলতে পারেন। আপনি দেখা না-করলে খালি হাতেই ফিরতে হত। আর ইউনিভার্সিটিতে আমার ডিপার্টমেন্ট হেডের সঙ্গে কথা হয়েছে, ডক্টর চতুর্বেদী। তবে ভাসা ভাসা। ওঁর নিজের ফিল্ড অন্য, সেজন্য খুব একটা ইন্টারেস্ট দেখাননি। শুধু জানতে চেয়েছিলেন কবে নাগাদ পেপার পাবলিশ করা যাবে।' মুচকি হাসলেন ডক্টর গুপ্তা, 'আসলে ডক্টর চতুর্বেদী প্রো-ভাইস হবার চেষ্টায় আছেন, বিভিন্ন জায়গায় দরবার করা নিয়ে ব্যস্ত। জানাতে হয়, তাই জানিয়ে রেখেছি।'
-আপনার পরিবার?
হাত তুললেন ডক্টর গুপ্তা, 'কেউ নেই। বিয়েই করিনি। জলে-জঙ্গলে ঘোরা লোককে কে বিয়ে করবে বলুন। মা-বাবা আছেন, লখনৌতে। ছোটো ভাই আছে, ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করে। কাউকেই কিছু বলিনি।'
-ঠিক আছে। আপনি দিল্লিতে কোথায় উঠেছেন?
-কোথাও উঠিনি। গতকাল রাত্রে ঋষিকেশে বন্ধুর বাড়ি ছিলাম। সকালে প্লেনে এসেছি। ফিরব ট্রেনে।
কিছু না-বলে পাশের একটা স্যুইচ টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন ডক্টর মিশ্রা, 'ম্যাডামকো বুলাও'।
সেক্রেটারি ঢুকলে পরে তাঁকে বললেন, 'দিস ইজ ডক্টর গুপ্তা। হি ইজ আওয়ার গেস্ট। ইন্কে লিয়ে পরসোঁ কা প্লেন কা টিকট করওয়া দিজিয়ে । দেরাদুন। ওয়াহাঁ গাড়ি হোনা চাহিয়ে, শ্রীনগর কে লিয়ে। আজ আউর কল হমারে গেস্ট হাউস মেঁ রহেঙ্গে। আউর ইনকে লিয়ে অভি এক গাড়ি বোল দিজিয়ে, ইনকে সাথ রহেগা ইয়ে দো দিন।'
অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন ডক্টর গুপ্তা। পুরো ব্যাপারটা যে এত সিরিয়াসলি নিয়েছেন ডক্টর মিশ্রা, সেটা এতক্ষণ বুঝতেই দেননি।
উঠে পড়লেন ডক্টর মিশ্রা, 'আসুন, আজ গিয়ে বিশ্রাম করুন, দিল্লি বেড়ান, কাল সকাল সাড়ে এগারোটায় আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার কাগজ আজ স্টাডি করব।'
নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন ডক্টর গুপ্তা; হতভম্ব ভাবটা এখনো যায়নি। দরজার বাইরে বেরোতেই সেক্রেটারি

মহিলা ডাকলেন, কাছে গিয়ে দাঁড়াতে বেয়ারাকে ইন্সট্রাকশন দিলেন, 'ইনকে সাথ যাও, গাড়ি মে বিঠা দো। গেস্ট হাউস লে যায়েগা। ড্রাইভার কো বলো মেরে সাথ ফোন পে বাত করেঁ।'
গুপ্তা বেরিয়ে গেলে ডক্টর মিশ্রা একটা ফোন করলেন।
-আই মে হ্যাভ সামথিং। আই থিঙ্ক উই শুড মীট। টুডে।
-কাম ওভার।
-নট ইন ইওর অফিস। নট দ্যাট স্টেজ ইয়েট। জিমখানা অ্যাট এইট।
-ডান্।

* * * *

সন্ধ্যাবেলা দিল্লির জিমখানা ক্লাবে। পোর্টিকোতে গাড়ি থেকে নামলেন ডক্টর মিশ্রা। বহুদিনকার মেম্বার। রিসেপশনিস্ট উঠে দাঁড়িয়ে গুড ইভনিং বলে অভ্যর্থনা করল। ডক্টর মিশ্রা কোনো চিন্তায় ডুবে আছেন, যেন শুনতেই পেলেন না। সোজা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেলেন। রিসেপশনিস্ট একটা শ্রাগকরে আবার নিজের জায়গায় বসে পড়ল।
ডান দিকে ঘুরে আবার বাঁ দিকে ফিরে সোজা এগিয়ে গিয়ে বার। বারে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকালেন একবার। ঘড়ি দেখলেন, আটটা বেজে তিন মিনিট। ডান দিকের কোণার দিকে একটা সোফায় একজন শিখ। বয়স্ক। বসার কায়দা দেখলেই বোঝা যায় মিলিটারিতে ছিলেন। গাঢ় ছাই রঙের স্যুট, সাদা শার্ট, শিখ রেজিমেন্টের কালো সোনালি স্ট্রাইপ টাই। মিশ্রাকে ঢুকতে দেখে হাত তুললেন। মিশ্রা এগিয়ে গেলেন। হাত মেলাবার এবং ড্রিঙ্কস অর্ডার দেবার পরে মিশ্রা বললেন, 'অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল আজ।'
ভুরু তুললেন শিখ ভদ্রলোক। ব্রিগেডিয়ার পরমজ্যোৎ সিং। একটা অনামী সংস্থার কর্ণধার। রিপোর্ট করেন শুধু পি.এম-কে।
-কী হল ?
-বলছি। সেজন্যই আসা। তবে এখানে নয়। বাইরে যাওয়া যাক।
ড্রিঙ্কস এলে পরে গেলাস হাতে নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে লনে বেরিয়ে গেলেন দুজনে। শীতকাল, এখানে ওখানে কয়েকটা আঙিঠি জ্বলছে। তারই একটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ওঁরা।
-বলুন এবার।
ডক্টর মিশ্রা গুপ্তার পুরো কাহিনি শোনালেন। বাদ দিলেন না কিছুই।
-ইন্টারেস্টিং। তা আপনার সায়েন্টিস্ট এখন কোথায়?
-আমাদের গেস্ট হাউসে। মনে হল সাবধানে রাখা ভালো।
-ঠিকই করেছেন।
-ব্যাপারটা কী বুঝছেন?
'গোলমাল তো একটা আছেই। তবে...একটু ভাবতে হবে।'
গেলাসে একটা চুমুক দিলেন ব্রিগেডিয়ার, 'ওঁকে কাল ডেকেছেন তো?'
-হ্যাঁ, সকাল সাড়ে এগারোটায়।
-ঠিক আছে। আমিও আসব।
যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন ডক্টর মিশ্রা, 'দ্যাট উইল বি ভেরি গুড। যাক্, এবার বলুন, ক্লাব ইলেকশনে কে দাঁড়াচ্ছে এবার?....'

* * * *

দিল্লির কমলা নেহেরু পার্ক। সন্ধ্যার সময় অনেকেই এখানে দৌড়োতে আসে। রুদ্রও এসেছে। রোজ আসা হয় না। দিল্লিতে থাকলে চেষ্টা করে। ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট। ব্রিগেডিয়ার পরমজ্যোৎ সিং-এর খাস লোক। লম্বা প্রায় ছ'ফুটের ওপর। টান-টান চেহারা। মুখটা চৌকো। দেখলে বাঙালি বলে বোঝা যায় না।। বাবা বাঙালি হলেও মা পাঞ্জাবি। রুদ্র-র গড়নটা মায়েরই মতো। বাবা ছিলেন আর্মিতে। রুদ্রও ওই রাস্তা দিয়েই এগিয়েছে। আগে ছিল স্পেশ্যাল ফোর্সেসে। বছর দশেক হল এজেন্সিতে।
কমলা নেহেরু পার্ক খুব বড়ো। পুরোটা ঘুরে আসতে মিনিট কুড়ি তো লাগেই। রুদ্র-র কোনো তাড়া নেই। আস্তে আস্তেই দৌড়োচ্ছে।
পার্কে আলো থাকলেও জায়গায় জায়গায় বেশ অন্ধকার। একটা ঝোপের পাশে সাদা মতো কী একটা দেখা যাচ্ছে। রুদ্র নীচু হল।
একটা লোক। সাদা শার্ট,প্যান্টের রঙ মনে হয় নীল। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বডিটা উলটো হয়ে পড়ে আছে। সাবধানে বডিটা উল্টোল, যদিও করা উচিত নয়। বুকে জমা রক্ত। পকেট হাতড়াল। একটা কার্ড। নিজের লাইটার জ্বালিয়ে দেখল কার্ডটা। ডক্টর রাধেশ্যাম গুপ্তা। শ্রীনগর ইউনিভার্সিটি। কার্ড আবার ভদ্রলোকের প্যান্টের পকেটে গুঁজে দিল। একটা পার্সও আছে। টাকা-পয়সা যথাস্থানে। তাহলে চুরি-ছিনতাই উদ্দেশ্য নয়। তবে মোবাইল নেই।
বডিটা আবার উলটো করে দিয়ে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করল।
আর-একটা ফোন করল। এজেন্সি কন্ট্রোলে। ফোন তুলে সাম্থানম ওরফে সান্টাকে চাইল। সান্থানম কন্ট্রোল রুমের বস তথা এজেন্সির যাকে বলে রেসিডেন্ট কম্পিউটার জিনিয়াস। সান্থানম তুললে বলল, ' ডক্টর রাধেশ্যাম গুপ্তা। শ্রীনগর ইউনিভার্সিটি। দেখো কী পাও।'
-কী হয়েছে ?

-মার্ডার্ড। বডি পেয়েছি আমি। অফিসে যাচ্ছি। বসকেও বলতে হবে।
-রজার। উইল ডু।

* * * *

ব্রিগেডিয়ারের পাশে রাখা ফোনটা বাজল।
-রুদ্র রিপোর্টিং স্যার। ফাউন্ড আ ডেড বডি ইন কমলা নেহেরু পার্ক। ডক্টর রাধেশ্যাম গুপ্তা। শট্। হ্যাভ আস্কড সান্টা টু লুক ইন্টু। অ্যাম গোইং টু অফিস।
' অ্যাম হিয়ার।' ফোন কেটে গেল।

* * * *

রুদ্র গেটের দিকে এগোচ্ছে, মনে হল ওর পিছনে কেউ আছে। একবার ঘুরে দেখল, কাউকে দেখতে পেল না। মনের ভুল ভেবে এগিয়ে যাচ্ছে, পিছন থেকে ঘাড়ে কেউ কিছু একটা মারল। রুদ্র পড়ে গেল।
যখন জ্ঞান ফিরল, দেখল একটা গ্যারাজের ভিতর। ও মাটিতে পড়ে আছে, আধো অন্ধকারে। মাথার পাশে একটা গাড়ির টায়ারের স্পর্শ। ঘাড় ঘোরাল। ব্যাথা করছে। তবে খুব বেশি নয়। হাত-পা নাড়ল। সব ঠিকই আছে। উঠবার চেষ্টা করল। মাথাটা ঘুরছে। ব্যাটারা স্যান্ডব্যাগ (টাইট করে বালি দিয়ে ভরা একটা মোজা বা ওই জাতীয় কিছু) দিয়ে মেরেছে । ঘাড় ভাঙতেই পারত। ভাগ্য ভালো। জগিং সুটের পকেটে মোবাইল ছিল। নেই। তবে ওর কোডেড মোবাইল এরা খুলতে পারবে না। ত নিয়ে চিন্তা নেই। তবে পার্সটাও নেই। কিছু টাকা ছিল, আর একটা আধার কার্ড। অবশ্য কার্ড ভুয়ো নামে। আর কেউ যদি ট্রেস করতে যায়, উলটে সে নিজেই ট্রেস হয়ে যাবে।
গ্যারাজের সামনের দিকে একটা কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। দুটো লোক কথা বলছে। গলার আওয়াজ চাপা করার কোন চেষ্টা নেই। বোধহয় ভেবেছে রুদ্র এখনো অজ্ঞান।
-ইসকো লেকে ক্যা করেঁ ?
-গাড় দেতে হ্যাঁয়।
- মুল্লা সে পুছনা হ্যায় ?
-ছোড়ো ইয়াকুব ভাই। কাঁহেকো ?
- ফির ভি...
-বাদ মেঁ দেখেঙ্গে। বোঝ হ্যায়, দফা করো।
-ঠিক হ্যায়। পেহলে দেখ তো কেঁ, জিন্দা হ্যয় কি নহিঁ।
যা শোনার, শুনেছে। আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসল রুদ্র। চারপাশ হাতড়াল। গ্যারাজ যখন, লোহার কিছু একটা তো থাকবেই। হাতে লাগল একটা স্প্যানার। উঠে দাঁড়াল। গাড়িটা ব্যাক করে লাগানো আছে। একটা লোক এগিয়ে আসছে। রুদ্র আস্তে আস্তে গাড়ির ডিকির দিকে সরে গেল। এক পা বাড়ালেই দেওয়াল। অন্ধকার। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। লোকটা আরো একটু এগিয়ে এসেছে। রুদ্রর বডি কোথায় ফেলেছিল বোধহয় ঠিক ঠাওর করতে পারছে না।
সুযোগ দেওয়া নেই। কাছাকাছি আসতেই স্প্যানার দিয়ে সোজা মাথায়। খট্করে একটা আওয়াজ। বোধহয় খুলিটা ফাটল। বডিটা পড়ে গেল। মরে গেছে কিনা দেখার সময় নেই।
লোকটার কোমরে গোঁজা একটা অটোমেটিক। প্রায় ছিনিয়েই নিল। সেফটি অফ করল। আবার হাঁটু গেড়ে বসে গাড়ির সামনের দিকে এগিয়ে গেল।
অন্য লোকটা এবারে আসছে। খালি হাতেই, কথা বলতে বলতে।
-আরে ক্যা হুয়া, ইদ্রিস ভাই?
একটু চাপা গলায় উত্তর দিল রুদ্র, 'ইয়াকুব ভাই, ইয়ে তো গয়া কাম সে।'
-বড়িয়া। ম্যাঁয় কুদাল লাতা হুঁ।
লোকটা মাঝ রাস্তাতেই পিছন ফিরল। রুদ্র বসা অবস্থাতেই একটা লাফ দিল। হাঁটু জড়িয়ে ধরল লোকটার। লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে রুদ্র। জুতো লোকটার ঘাড়ে। লোকটার হাত তার কোমরের দিকে যাচ্ছে। নীচু হয়ে পিস্তল দিয়ে মাথায় একটা বাড়ি।
অজ্ঞান হয়ে গেছে লোকটা। ওর পকেট থেকে বেরোল একটা ছুরি আর একটা পিস্তল। এদিক ওদিক তাকাল রুদ্র। দড়ি কিছু আছে বটে। তারপর নিজের মনেই হেসে লোকটার পাজামার দড়িটা টেনে বার করে তাই দিয়ে লোকটার হাত পিছমোড়া করে বাঁধল। লোকটার নিজেরই ছুরি দিয়ে আন্ডারওয়ার কেটে দিল। বডি উলটো করে কামিজের সামনের দিকটাও কেটে দিল। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উলঙ্গ থাকার মতো সাইকোলজিকাল ডিমরালাইজেশন আর কিছুতে হয় না।
দড়ি দিয়ে এবার পা বাঁধল। তাকাল একবার গাড়িটার দিকে। চালু আছে মনে হয়। চাবি ভিতরেই ঝুলছে। এটা সত্যি সত্যি হয়ত কোনো মেকানিকের গ্যারাজ। হাত-পা বাঁধা লোকটাকে ডিকির মধ্যে ঢোকাল। ইদ্রিসের পকেট থেকে নিজের পার্স আর মোবাইল উদ্ধার করল। ইদ্রিস

মরেই গেছে।
গাড়ি নিউট্রাল করে ঠেলে নিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজা ঠিক নয়, শাটার। তোলার আগে লাইটের সুইচ বন্ধ করল। গাড়ি আস্তে আস্তে বার করে আবার শাটার বন্ধ করল।
রাস্তাটা অন্ধকার। দোকানের বোর্ড পড়ার চেষ্টা করল। একটু পড়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে উত্তর দিল্লির সীলমপুর এলাকা। সেন্সিটিভ জায়গা। যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যায় ততই ভালো।
গাড়িতে বসে মোবাইল অন করল। মেসেজ পাঠাল কন্ট্রোলে। 'মাই লোকেশন ইজ দিস। গ্যারাজ। ডু নট নো নেম। ওয়ান ইনসাইড ফর ডিসপোজাল। অ্যাম প্রোসিডিং টু সেফ হাউস নাম্বার ফাইভ। ওয়ান ওয়ার্ম ইন মাই ডিকি। প্রিপেয়ার ফর ইনটারোগেশন।' গাড়ি স্টার্ট করল রুদ্র। মোবাইল বীপ করল। কন্ট্রোলের মেসেজ, 'আন্ডারস্টুড। ওকে।'

এখন
প্রথম দিন
রাত ১১:০০ – রাত ৩:০০

জিমখানা ক্লাব থেকে বেরোতে বেরোতে সাড়ে দশটা বাজল ব্রিগেডিয়ারের। গাড়িতে বসতে না বসতেই রুদ্রর ফোন ,'আমি সেফ হাউস নম্বর পাঁচে। অনেক কিছু হয়েছে।'
'হুঁ। আমি আসছি। বি দেয়ার।' ফোন কেটে দিলেন।
সেফ হাউস নম্বর পাঁচ (সেফ হাউস বলতে বোঝায় এমন কিছু বাড়ি, যার ওপর সবসময় নজর রাখা যায়, আর যার হদিস শত্রুপক্ষ জানে না, বা জানে না বলেই এজেন্সির ধারণা) দিল্লি বর্ডারের কাছে একটা ফার্ম হাউসে। সীলমপুর থেকে ওটাই কাছে বলে রুদ্র ওখানেই গিয়েছে। আর তাছাড়া একটু নির্জন বলে ইনটারোগেশনের সুবিধা।
জিমখানা থেকে পৌঁছতে লেগে গেল প্রায় এক ঘন্টা। ঘরে ঢুকে ব্রিগেডিয়ার দেখলেন জগিং সুট পরে রুদ্র বসে ব্রান্ডি খাচ্ছে। বললেন 'ওয়ান ফর মি টু প্লীজ।' রুদ্র উঠে সাইডবর্ড থেকে ড্রিংক বানিয়ে আনল।
-বলো।
পুরো ঘটনার বিবরণ দিল রুদ্র। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ব্রিগেডিয়ার। তারপর,
'শোনো। এই ডক্টর গুপ্তা একজন সায়েন্টিস্ট। ধৌলিগঙ্গার জল নিয়ে গবেষণা করছিল। আজ ডি এ ই-র ডক্টর মিশ্রার কাছে গিয়েছিল। ওর ধারণা...' অতঃপর ডক্টর মিশ্রা যা বলেছিলেন, সবই বললেন ; কেউ ডক্টর গুপ্তার পেছু নিয়েছিল, সেটাও বলতে ভুললেন না।
গেলাসে চুমুক দিলেন একটা ব্রিগেডিয়ার সিং, 'তোমার কী মনে হয়?'
-স্যার, দুটো দৃষ্টিকোণ আছে। একটা, এই ব্যাপারটা সত্যিই ওই যন্ত্রটার জন্য, এটা আমার মনে হয় না ঠিক। দুজন সায়েন্টিস্ট এটার বিরুদ্ধে। অবশ্য ডক্টর মিশ্রা এখনো ফাইনাল বলেননি, তবে সেটা আপাতত ধরে নেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় হচ্ছে, ডক্টর মোলনারের ব্যাপারটা। হাঙ্গেরির সঙ্গে চীনের সম্পর্ক তো আমরা জানি। সুতরাং এই খবর চীনে যেতে কতক্ষণ। আর চীন থেকে... কথাটা শেষ করল না রুদ্র। নিজের গেলাসে চুমুক দিল একটা।
বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ব্রিগেডিয়ার। গেলাসে আর এক চুমুক দিলেন।
- পয়েন্ট অফ অ্যাটাক আপাতত তিনটে, পরে আরও বেরোতে পারে। প্রথম, একটা সায়েন্টিফিক টীম পাঠিয়ে দেখা, রেডিও অ্যাক্টিভিটির পরিমাণ ঠিক কতটা। আর কতটা বাড়লে বড়ো ক্ষতি হতে পারে। সেটা দেখে বোঝা যাবে যে যারা এই কাজ করেছে বা করছে, অর্থাৎ জলে নিউক্লিয়ার মেটিরিয়াল মেশাচ্ছে, তারা এই অপারেশন চালিয়ে যাবে কিনা। যদি মনে হয় যাবে,

তাহলে ধৌলিগঙ্গার উৎসের কাছে সিকিউরিটির ব্যাবস্থা করতে হবে, আর লোকগুলোকে এলিমিনেট করতে হবে। দুই, এদের পিছনে কারা আছে খুঁজে বার করে তাদের এলিমিনেট করতে হবে। তিন, ডক্টর মোলনার...'
-বিগ টাস্ক, স্যার। আই নীড আ টীম।
'ইউ ক্যান হ্যাভ ইট। কার কথা ভাবছ?' একটু হাসলেন।
'সুস্মিতা ? ও ইয়েস, শি ইজ আ জিওলজিস্ট। মে বি অফ হেল্প। বিজয় উইল বি হেল্পফুল ইন ইউরোপ।'
-ওয়ান মোর স্যার।
-হোয়াই?
-সুস্মিতা প্রথম দিকের সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশনের সঙ্গে থাকবে। বিজয়কে পাঠাব হাঙ্গেরির দিকটা দেখতে। দুই নম্বর পয়েন্ট আমি দেখব। কো-অর্ডিনেশনের জন্য একজনকে চাই। কো-অর্ডিনেশনও করবে, দৌড়োদৌড়িও করবে।
-'হুঁ। ভেবে দেখি।' সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন মিনিটখানেক।
-ইউনিট পি-তে একজন আছে। যোশী। রঘুবীর যোশী। সবাই রঘু বলেই ডাকে। ব্রাইট চ্যাপ। এক্স-এন এস জি। প্রিটি গুড। ওকে বলব তোমার সঙ্গে দেখা করতে।
রুদ্র সাধারণত একা কাজ করে। দরকার থাকলে ওর নিজের টীম -- বিজয়, সুস্মিতা, শর্মিলা এরা। তবে শর্মিলাকে এখন পাওয়া যাবে না। অন্য কাজে ব্যস্ত। এখন উপায় নেই। টীম বড়ো করতেই হবে।
'রাইট স্যার। উইল টক টু হিম।' উঠতে যাচ্ছিল, ব্রিগেডিয়ার বললেন, 'হোয়াট অফ দ্য ম্যান ইউ ক্যাপচারড ?'
'ডক্টর ত্রিপাঠি ইজ অন দ্য জব স্যার। হি উড হ্যাভ ইঞ্জেক্টেড স্কোপোল্যামিন বাই নাউ। (স্কোপোল্যামিন একটা ট্রুথ ড্রাগ, কথা বার করার জন্য। ভারতেও ব্যবহার হয়।)
'আই উইল লুক এ্যাট ইট টুমরো', ঘড়ি দেখলেন। দুটো প্রায় বাজে। 'লেট আস গো। আই উইল ড্রপ ইউ।'
রুদ্র যখন বাড়ি পৌঁছল – বাড়ি বলতে আর কে পুরম-এর একটা ফ্ল্যাট, মাসে চারটে দিনও থাকে কিনা সন্দেহ – তখন বাজে রাত তিনটে। ফেরার পথে কমলা নেহেরু পার্ক থেকে নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছে।

এখন

দ্বিতীয় দিন

বাহাদুরাবাদ, হরিদ্বারের কাছে,
সকাল ৮:০০ – বেলা ১২:০০
দিল্লী
সকাল ৯:০০ – বেলা ৩:০০

হাইওয়ের ওপর একটা গ্যারাজ। টিনের চালা। ভিতরে যন্ত্রপাতি, একটা গাড়ি, দুটো মোটর সাইকেল, দুটো স্কুটার। গ্যারাজের সামনে মোড়ার ওপর বসে তিনজন লোক চা খাচ্ছে। একজনের নাম সেলিম, এখানে সবাই ওকে চেনে জগতার বলে – নিজেকে পরিচয় দেয় মোনা সর্দার বলে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল একটু উস্কো-খুস্কো, চোখ দুটো কোটরে বসা। লম্বা, তবে বসে আছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। পরনে খাকি প্যান্ট আর ওই রঙেরই শার্ট । দ্বিতীয় লোকটি হাফ প্যান্ট পরা, গায়ে একটা নোংরা টি-শার্ট। এর নাম রবি, আসল নাম মুন্তাজির। আর তৃতীয় লোকটির নাম খুদাবক্স। এরও পরনে টী-শার্ট আর হাফ প্যান্ট। এদের দুজনেরই মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা।
খুদাবক্স বলছিল ,'ইয়াকুব আর ইদ্রিসের কোনো খবর?'
মাথা নাড়ল জগতার , 'নাঃ। সালোঁ কো ক্যা হো গয়া পাতা নেহিঁ।'
রবি নিজের চায়ের ভাঁড় শেষ করেছে। 'ফঁস গয়ে হোঙ্গে কহিঁ।'
'আজ আসার কথা ছিল ?' খুদাবক্স জিগ্যেস করল।
'না। কাল।' উত্তর দিল জগতার।
রবি উঠে পড়ল। 'চিন্তা মৎ করো। আ জায়েঙ্গে। চালাক হ্যায়ঁ।'
জগতারও উঠল – তাকাল একবার গ্যারাজের ভিতরে। পিছনের দিকে দুটো ড্রাম রাখা আছে। নীল রঙের । মুখে বলল , 'আমাদের বেরোতে হবে আসছে সপ্তাহে। বিষ্ণুপ্রয়াগ যেতে হবে। এবার ওখানেই কাজ। দিনক্ষণ জানিয়ে দেবে।'
'আসছে সপ্তাহ কেন?' একটু অবাকই হল খুদাবক্স, 'যাবার কথা তো কালই।'
হাত ওল্টাল জগতার, 'কে জানে। হয়ত দিল্লিতে কিছু একটা হয়েছে। আমরা তো সব কিছু জানি না। জানবার দরকারও নেই।'
'সহি হ্যায়,' বলে গ্যারাজের ভিতর চলে গেল খুদাবক্স।

রবিও গেল তার পিছনে।
ওদের দিকে তাকাল জগতার। এই অপারেশনটার পরেই ওদের কাম তামাম করতে হবে। বেচারারা।এই কাজের জন্য দশ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। সেটা ভাগ করার কোনো ইচ্ছাই নেই জগতারের।

* * * *

সকাল ন-টার সময়েই পি এম তলব করলেন। আগের রাত্রেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে রেখেছিলেন ব্রিগেডিয়ার।
পি এম কে দেখে মনেই হয় না রাত তিনটে পর্যন্ত মিটিং করেছেন, আবার সকালে ব্যায়ামও করেছেন। ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই চেহারায়।
'বৈঠিয়ে', বলে সোফার দিকে দেখালেন। হাতের ফাইলটা পাশে রেখে নিজেও উঠে এলেন ডেস্ক থেকে।
-বলিয়ে।
সব শুনে পি এম বললেন, 'এর অনেকগুলো ইমপ্লিকেশন রয়েছে। প্রথম, রেডিওঅ্যাক্টিভিটির ব্যপারটা আমাদেরই ওপর বর্তায়। চীন বা পাকিস্তান – আলাদা আলাদা, বা মিলে মিশে - সেই সুযোগটাই নিচ্ছে এবং নেবে। আমাদের আস্কারাতেই তো প্রথমে ওই যন্ত্রটা লাগানো হয়েছিল। দ্বিতীয়, এর তো কোনো গ্যারান্টি নেই যে এই কান্ডটা অন্য কোনো নদীর ওপরেও হবে না। তৃতীয়ত, আপনি তো জানেন আমরা নদীগুলোকে কানেক্ট করার চেষ্টা করছি। সেক্ষেত্রে, এই পুরো ব্যাপারটা এখনি না সামলালে পরে আর করা যাবে না।'
-আপনার অর্ডার?
-জড় সে উঠা দিজিয়ে। এলিমিনেট। ব্ল্যাঙ্ক চেক। কিসিকো ভি বুলাইয়ে। এন আই এ হো, ইয়া কোই ভি হো। হোম কো হম্বোল দেঙ্গে।'
'ইয়েস স্যার।' উঠে পড়লেন ব্রিগেডিয়ার।
* * * *
'বুঝেছ ব্যাপারটা?' নিজের নর্থ ব্লকের ঘরে ফিরে রুদ্রর টীমকে ব্রিফ করলেন পরমজ্যোৎ সিং। তারপর আর্মির ভাষায়, 'কোই শক ?'
নতুন আমদানি রঘু যোশী মুখ খুলল, একবার রুদ্রর দিকে তাকিয়ে, 'স্যার, আমরা ই ইউ পোল (ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পোলিস) থেকে সাহায্য পেতে পারি না?'
-শুধু ই ইউ পোল কেন, ইন্টারপোল থেকেও পাবে, যখনই দরকার হবে। আউর কুছ?
সবার হয়ে রুদ্র মাথা নাড়ল।
টীম কে নিয়ে রুদ্র সেফ হাউস নম্বর পাঁচের দিকে রওনা হল। অবশ্য সবাই একসঙ্গে নয়। রুদ্রর সঙ্গে বিজয় আর সুস্মিতা। ড্রাইভার রুদ্র নিজেই।
চলতে চলতেই রুদ্রর ফোন বাজল। সান্টা। রুদ্র বলল, 'পুটিং ইউ অন স্পিকার।'
-দ্য বার্ড ইজ সিঙ্গিং। ইয়াকুবের থেকে জানা গেছে দিল্লিতে আরো দুটো সেল আছে। আর হরিদ্বারে একটা। তবে এরা জিহাদি নয়। কোনো একটা ইন্টারনাশনাল ক্রিমিনাল গ্যাং-এর এজেন্ট। আসল লোক কে, সেটা ইয়াকুব জানেনা, জানবার কথাও নয়। অর্ডার এসেছিল, সেজন্য গুপ্তাকে সরিয়েছে। দিল্লিতে মনে হয় আরো লোক আছে, নইলে গুপ্তার মুভমেন্ট জানার কথা নয়। আরো গান বেরোবে এই পাখির গলা থেকে। আপাতত কাজ চালিয়ে যেতে বলেছি ত্রিপাঠিকে। আর তোমাদের কী খবর?'
-তোমাকে একবার সেফ হাউস পাঁচে আসতে হবে। যত তাড়াতাড়ি হয়। আর এন আই এ-কে খবর দাও এদের সেলগুলোর হদিস বার করার জন্য। পি এম আর হোমের পারমিশন আছে। ওদের বলতে পারো।
সেফ হাউসে পৌঁছে কয়েকটা ফোন করল রুদ্র। জি এস আই আর ন্যশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং এজেন্সিতে। সোজা কর্ণধারদের সঙ্গে কথা বলে টীম তৈরি করাল। আগামীকালের মধ্যে যাতে রওনা হয় সেটা ঠিক করল। সুস্মিতা তাদের সঙ্গে যাবে, অবজার্ভার প্লাস আরো কিছু। সেটা ওই টীমের বাকিদের না-জানলেও চলবে।
যে প্রশ্নটা রুদ্রর মাথায় ঘুরছে সেটা হল, রাধেশ্যাম গুপ্তার গতিবিধি শত্রু জানল কী করে ? এক হতে পারে ওর পিছনে লোক আগে থেকেই লেগেছিল। যদি গুপ্তা ডক্টর মিশ্রাকে আরও কিছু বলে থাকে, সেটা জেনে নিতে হবে ব্রিগেডিয়ারের কাছ থেকে। আর দুই, দিল্লিতে এমন কোনো লোক আছে যাকে ইয়াকুবরা চেনে না। যদি প্রথমটা হয় তাহলে ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে হরিদ্বারের সেলেরই কাজ এটা। আর যদি দ্বিতীয়টা হয় তাহলে ইয়াকুবের মোবাইল থেকে জানা যেতে পারে।
লাঞ্চ খাবার সময় হয়ে গেছে। কেয়ারটেকার এসে স্যান্ডউইচ আর কফি দিয়ে গেল। খেতে খেতেই সান্টার আবির্ভাব। একবার তাকাল সবার দিকে, তারপর একটা প্রিন্ট-আউট বার করে রুদ্রর হাতে দিল। ইয়াকুবের মোবাইলের ডেটা-ডাম্প। চোখ বোলাল রুদ্র। একটা নম্বর

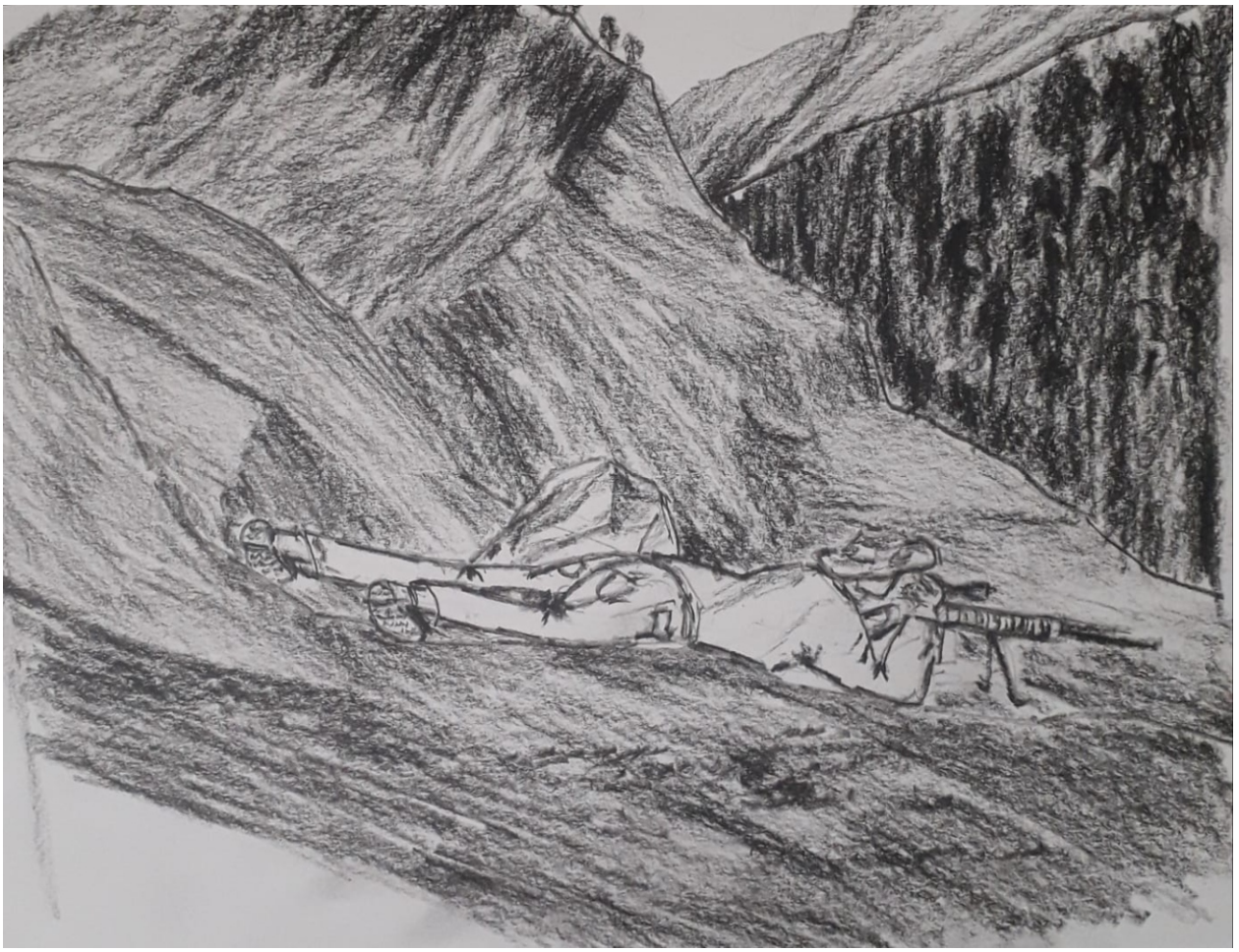

হাইলাইটার দিয়ে দাগ মারা আছে। রুদ্র মুখ তুলে তাকাতে সান্টা বলল ,'লক্ষ্য করো, কল হয়েছে সাতটা কুড়িতে। তার মানে অপারেশন রাধেশ্যাম শেষ হবার পরে। আর কোনো কল হয়নি তারপর থেকে। তার মানে তোমাকে যে গুম করেছে সেটা জানায়নি।'

মাথা নাড়ল রুদ্র, ' আমি জানি। ওদের বসকে জানাবে কিনা ভাবছিল ওরা। কিন্তু আমাকে গুম করার কারণটা পরিষ্কার নয়।'

'হতে পারে ওরা ভেবেছিল রাধেশ্যাম গুপ্তার কাগজ তুমি নিয়েছ। কাগজ বা ফ্ল্যাশ-ড্রাইভ, যা-ই হোক।' রঘু বলল।

'হতে পারে,' কথা বাড়াল না রুদ্র, সান্টার দিকে একটু ঘুরে বসল, 'নম্বর ট্রেস হয়েছে?'

-প্রি-পেড নম্বর। তবে কল এসেছিল মালবিয়া নগর থেকে। ফোর-সি (ফোর-সি, সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার)-কে লাগিয়েছি। রাতের মধ্যে বার করে দেবে ঠিক লোকেশন।'

'ফাইন। এবার শোনো...' ,সান্টাকে ব্রিফ করল, ' রঘু তোমার সঙ্গে টাচে থাকবে ২৪/৭। এই মালবিয়া নগরের নম্বর থেকে হরিদ্বার ডিস্ট্রিক্টে কোনো ফোন গেছে কিনা দ্যাখো। এ-ও দ্যাখো ইয়াকুবের মোবাইল থেকে হরিদ্বারে কোনো ফোন গেছে কিনা।'

'দেখব। আর কিছু ?' মাথা নাড়ল রুদ্র। সান্টা উঠে পড়ল।

-আমাদের জন্য ক্যা হুকম, বস?

'বলছি,' হাতের স্যান্ডউইচ শেষ করে কফিতে চুমুক মেরে রুদ্র ইন্সট্রাকশন দিল, 'বিজয়, ইউ উইল শ্যাডো সুস্মিতা। কোডেড মোবাইলস। রঘু, ইউ স্টে পুট ইন ডেলিহ।'

'তুমি?' সুস্মিতার প্রশ্ন।

-আই উইল বি সামহোয়্যার।

সুস্মিতা চোখ কপালে তুলল, কিছু বলল না। টিম লিডারকে প্রশ্ন করা যায় না সবার সামনে। পরে ধরবে।

বিজয় হাত তুলল , 'বাট বস...'

-ইয়েস?

-হাঙ্গেরি ?
-নট আর্জেন্ট। আউর কোই শক?
মাথা নাড়ল তিন জনেই।
ফেরৎ যেতে যেতে বিজয় বলল, 'রঘুকে আমাদের সঙ্গে রাখলে হত না ?'
সামনে একটা ট্যাক্সি। সেটাকে পাশ কাটিয়ে খালি রাস্তায় পড়ে রুদ্র বলল, 'রঘু আমাদের টিমে নতুন। একটু বাজিয়ে দেখি। সিচুয়েশন ডেভেলপ করুক, তারপর দেখব।'
হঠাৎ কী ভেবে রাস্তার ধারে দাঁড়াল। বলল, 'একটু চা খেয়ে নিই।' বিজয় আর সুস্মিতা অবাক হলেও, কিছু উত্তর দিল না। রুদ্র এগিয়ে গেল পাশের চায়ের দোকানের দিকে। চা খেতে খেতে ঘড়ি দেখল। ওরা বেরোবার পর থেকে দশ মিনিট হয়েছে। এতক্ষণে রঘুর মোটর সাইকেল চোখে পড়া উচিৎ ছিল।
চা খেয়ে সিগারেট ধরাল। সিগারেট প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। সুস্মিতা সঙ্গে থাকলে চেঁচামেচি করে আজকাল, সেটাও একটা কারণ। তবে পুরুষদের স্বভাবোচিত বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য পুরোপুরি ছাড়েনি। সিগারেটটা ফেলে আবার ঘড়ি দেখল। আরো দশ মিনিট হয়েছে। রঘুর দেখা নেই।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার গাড়িতে গিয়ে বসল।
* * * *
ওরা চলে গেলে রঘুও বেরল। নিজের বুলেট মোটর সাইকেলটা স্টার্ট করে চোখে সান-গ্লাস লাগাল। হেলমেট পরল। হাইওয়েতে পড়ে দিল্লির দিকে না-গিয়ে সোনিপতের দিকে চলল। সোনিপত ওর গন্তব্য নয়। রাস্তায় একটা পি সি আর বুথ পেলেই হল। লান্ডলাইন দরকার।
সোনিপত অবধি যেতে হল না। তার তিন কিলোমিটার আগেই একটা বুথ পেয়ে গেল। বুথে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। দোকানদার বাইরের একটা লোকের সঙ্গে গল্প করছে, রঘুর দিকে পিঠ করে। মুম্বাইএর নম্বর ডায়াল করল।
-হ্যালো...
-দিল্লি...
-বলো...। আগের ট্রেন ধরতে বলো। সম্ভব হলে দিন দুয়েকের মধ্যে।
-কেন?
-উকিলরা পৌঁছচ্ছে। কাল বা পরশু।
-আর কিছু?
-এখানে গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। অ্যাক্সিডেন্টে একজন মারা গেছে। আর একজন হাসপাতালে।
-ঠিক আছে।
ফোন রেখে বাইরে বেরিয়ে এল রঘু। পয়সা মিটিয়ে দিল্লি রওনা দিল।
* * * *
রঘুর ব্যাপারে ওর চিন্তাটা রুদ্র বিজয় বা সুস্মিতাকে জানায়নি। রঘুর গতিবিধির ওপর একটু নজর রাখতে ব্রিগেডিয়ার বলেছেন। অবশ্য সোজাসুজি নয়। তবে এটা অদ্ভুত কিছু নয়। ওর প্রফেশনে সবাইকে সন্দেহ করেই চলতে হয়, পরীক্ষা নিতে হয়। আর সেটা নেবার আগে বাকি টিমকে জানাবার দরকার নেই। যদি কিছু করতে হয়, রুদ্রকেই করতে হবে। এটাই নিয়ম।
দিল্লি পৌঁছে সান্টাকে ফোন করল। বলল, সব খবর এরপর থেকে ওকেই দিতে। সান্টা অবাক হলেও কিছু জানতে চাইল না। টিম লিডার যা বলবে তা-ই হবে। আর একটা অনুরোধ করল সান্টাকে। রঘু যোশীর পুরো ফাইল পাঠাতে।
কিছুক্ষণ পরে সান্টার লোক এসে একটা ফাইল দিয়ে গেল রুদ্রকে। সঙ্গে ব্যাংক স্টেটমেন্ট। ইমেইল করে শর্মিলাকে পাঠিয়ে দিল, সব ডিটেলস দিয়ে। শর্মিলা এজেন্সির মানি-ট্রেসার। রঘু যোশীর আর কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে কিনা, বার করে ফেলবে।
* * * *
আধঘন্টার মধ্যে বিজয় আর সুস্মিতা দুজনেই এসে হাজির। কিছু একটা প্ল্যান করেই এসেছে। বিজয়ই প্রথম মুখ খুলল, 'বস, আমাদের একটু খুলে বললে হয় না ? আমরাই তো লাইন অফ ফায়ার ইত্যাদি।'
-এখনো বলার মতো কিছু হয়নি। তবে খুব সাবধানে থাকবে। আমাদের খবর প্রতিপক্ষের কাছে পৌঁছচ্ছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ক্রমশই পাকা হচ্ছে। তবে আর একটু দেখব।
সুস্মিতা হঠাৎ বলল, 'রঘুকে কি আমাদের সিকিওর মোবাইল দেওয়া হয়েছে?'
মাথা নাড়ল রুদ্র, 'এখনো নয়। ভুলেই গিয়েছিলাম। একটু থাক না। তাড়াহুড়ো কী ? সবে তো এসেছে।'
-'বুঝেছি,' সুস্মিতা চুপ করে গেল। রুদ্রও আর কথা বাড়াল না।
সুস্মিতাই উঠে গিয়ে কফি নিয়ে এল সবার জন্য। হাতে পেয়ালা নিয়ে বলল ,'তোমার নিজের প্ল্যান কী ?'
-এখনো ভেবে উঠিনি। খবরের জন্য অপেক্ষা করছি।

-কী খবর?
রুদ্র একটু হাসল, 'নীড টু নো।' যদিও সুস্মিতার রুদ্রর ওপর একটু অধিকার আছে - অন্তত সুস্মিতা তা-ই মনে করে – কিন্তু নীড টু নো-এর ওপর কথা চলে না।
মিনিট খানেক চুপচাপ। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে রুদ্র বলল, 'আমার মনে হয় তোমরা আজ রাতেই চলে যাও। এন আই এ-র আপডেট সান্টাই তোমাদের দেবে। জি এস আই-এর টিম শিডিউল পাঠালে আমি জানিয়ে দেব। নিজেদের মধ্যে কো-অর্ডিনেট করে নিও। আর শোনো, সঙ্গে একটা টেলিসস্কোপিক রাইফেল নিও, আর নাইট-গ্লাস। একটা নতুন মডেল এসেছে – বুশনেল ইকুইনক্স, মেজর দুবে-র কাছ থেকে নিয়ে নাও। কাজে লাগবে।'
-আর?
-সান্টাকে বলো রুদ্রপ্রয়াগের ওপর যত পুলিশ-চৌকি আছে, সবাইকে বলে দিতে, যেন ট্রাক বা টেম্পো তেলের ড্রাম বা ওই জাতীয় কিছু নিয়ে যেতে দেখলেই ভালো করে চেক করে। ড্রাম বেশি ভারী হবে।'
'রাইট, বস। তুমি বলছ রেডিওঅ্যাক্টিভ ওয়েস্ট ড্রামে করে যাবে, তাই না?' বিজয় মন্তব্য করল।
'ইউ গট ইট। আর ওরা ধরা পড়লে ফায়ারফাইট হতে পারে। লোকাল পুলিস সামলাতে না-ও পারতে পারে, সেজন্য তোমরা তৈরি থেকো। আর সুস্মিতা, জি এস আই টিমের ওপরও হামলা করতে পারে। সাবধান।'
কথা বলতে বলতেই রঘুর ফোন।
-বস, আর ইউ কামিং টু অফিস ?
-ইন ওয়ান আওয়ার। তুমি কোথায় ?
-দিল্লি এসে গেছি। রাস্তায় পাংচার হয়েছিল, একটু দেরি হল।
-ঠিক আছে। সী ইউ।
* * * *

রুদ্রর অফিসটা ঠিক অফিস নয়। উদ্যোগ ভবনের পিছন দিকে গোটা তিনেক ঘর, সি পি ডব্লিউ ডি-র ফার্নিচার দিয়ে কোনোমতে সাজানো। এরকম অফিস আরো বেশ কয়েকটা আছে। এজেন্সির লোকেরা ঘুরে ঘুরে ব্যবহার করে। রুদ্র আর ওর টিম মাস খানেকের জন্য এখানে।
অফিসে গিয়ে বসতে না বসতে রঘু এল।
-হ্যালো বস। ক্যা হুকম্হ্যায় ?'
রুদ্র ফাইল দেখছিল। মুখ তুলে বলল ,'সিট। বি উইথ ইউ ইন আ জিফি।'
রঘু বসল। এদিক ওদিক তাকাল। রুদ্র ফাইলটা পাশে সরিয়ে রেখে বেল বাজিয়ে চায়ের অর্ডার দিল। বেয়ারা চলে গেলে বলল, 'বুঝতেই পারছ, ব্যাপারটা কত আর্জেন্ট। আমাদের খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে।'
গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল রঘু, 'সে তো ঠিকই। আর তুমি তো বলেছ বস যে , আমাকে বিজয় আর সুস্মিতাকে শ্যাডো করতে হবে।'
-রাইট। তুমি কালকে রওনা দেবে। ফর হরিদ্বার। সেখান থেকে যাবে রুদ্রপ্রয়াগ। টুরিস্ট লজে উঠবে। সেটা বাজারের মধ্যে। তোমার যাওয়া-আসা কেউ লক্ষ্য করবে না। তুমি কোথায় আছ সেটা বিজয়কে আমি জানিয়ে দেব। তোমার ওদের ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট করার দরকার নেই। তবে বিজয়ের টাচে থাকবে। ওদের পিছনে কেউ লেগেছে কিনা, সেটা বার করা তোমার কাজ। আর তাদের এলিমিনেট করা। কোই শক ?'
উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট মারল রঘু, 'নো স্যার। উইল এক্সিকিউট।'
* * * *
রঘু বেরিয়ে গেলে ব্রিগেডিয়ারকে ফোন করল রুদ্র , 'স্যার আমার আরো একজন অপারেটিভ চাই। এক

সপ্তাহের জন্য।'
-হোয়াই?
-উইল এক্সপ্লেন, স্যার। আই অ্যাম কামিং টু সী ইউ।
-ওকে।
সান্টাকে ফোন করে ইন্সট্রাকশন দিল। তারপর নর্থ ব্লকের দিকে রওনা দিল।
* * * *
অফিস থেকে বেরিয়ে রঘু গেল মালবিয়া নগর। চেনা পি সি আর বুথ থেকে ফোন করল।
-দিল্লি।
-স্পিক।
-অ্যাম ট্রাভেলিং টুমরো। পাস ইন্সট্রাকশন টু রিসিভ মি।
-ওকে। আউর কুছ ?
- নীড সাম ক্যাশ। তিন পেটি চাহিয়ে। আজ রাত। ব্যাংক জানে কা টাইম নেহি হ্যায়।
-মিল জায়েগা। দস বজে। রেস্তোরাঁ পহুঁচ জানা।
বুথ থেকে বেরিয়ে গেল রঘু। রাস্তার পানের দোকান থেকে একজন ওকে নজরে রেখেছে, সেটা চোখে পড়ল না। রঘু চলে যাবার পর লোকটি বুথে ঢুকল। ফোন করার বাহানায় একটা ছোটো যন্ত্র বুথের মিটারের ওপর লাগাল। তিরিশ সেকেন্ড। যন্ত্র খুলে নিয়ে বুথ থেকে বেরিয়ে এল মুখে চুক্চুকশব্দ করতে করতে। বুথের মালিক লোকটার দিকে তাকাতে বিরক্তি দেখিয়ে বলল, 'সকাল থেকে এই নিয়ে পাঁচবার হল। সালা ফোন লগতাই নেহি হ্যায়।
একটা অটো ধরল, 'আউরংজেব রোড।'
* * * *
সান্টার অফিসে ঢুকে লোকটা নিজের যন্ত্রটা জমা করল সান্টার কাছে। বাইরে এসে হেঁটে বেরোল গেট দিয়ে। অটো নিয়ে আবার দিল্লির ভিড়ে হারিয়ে গেল। সান্টা যন্ত্রটার থেকে একটা ফোন নম্বর পেল। সি-ফোরকে বলল ওই নম্বর ট্রেস করতে, আর ওই নম্বর থেকে কোথায় কোথায় ফোন করা হয়েছে গত এক সপ্তাহে, সেটা বার করতে।
ব্রিগেডিয়ারের অফিসে রুদ্র প্রায় ঘন্টাখানেক কাটাল। সান্টাকেও ডেকে পাঠানো হয়েছিল। যখন অফিস থেকে বেরোল সান্টা আর রুদ্র দুজনের মুখই গম্ভীর। অনেক কাজ করতে হবে।
* * * *
রঘু থাকে পঞ্চশীল পার্কে। বাড়িটা বাবাই করে গিয়েছিলেন। একটা আস্ত ফ্লোর। আসবাব বিশেষ নেই, তবে যা আছে, রুচিসম্মত। রঘু সাবধানী ছেলে। ওর বাড়িতে এসে যেন কারো মনে না-হয় যে ও পয়সা দেখায়। বিয়ে করেনি, খরচ করার লোক নেই। রঘুর শখ ইলেক্ট্রনিক্সে। সাউন্ড সিস্টেম থেকে শুরু করে টিভি – সবই দামি।
রঘু বাড়ি ঢুকেছে আটটা নাগাদ। স্নান করে পোষাক পালটে একটা ড্রিংক নিয়ে বসেছে। এই অপারেশনটার পরেই দেশ ছাড়তে হবে। অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না। এসব ভাবতে ভাবতেই ন'টা বেজে গেল। দশটায় অ্যাপয়ন্টমেন্ট। একটা জ্যাকেট চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে একটা স্কুটার নিয়ে একজন খুটখাট করছিল। রঘু নিজের মোটর সাইকেল নিয়ে বেরোলে লোকটা এদিক-ওদিক দেখে রঘুর বাইরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রঘু একতলাতেই থাকে। দরজায় ইয়েল লোক লাগান। পকেট থেকে ছুঁচের মতো একটা যন্ত্র বার করে লকটা খুলল। ভিতরে ঢুকে প্রথমে পর্দাগুলো টানল। তারপর পেন্সিল টর্চ জ্বালিয়ে তল্লাসি শুরু করল। রঘুর সবরকম ট্রিকই জানা আছে। কাজেই কম্পিউটারে কিছু পাওয়া যাবে না। লোকটা শুধু নিজের মোবাইল অন করে ওয়াই-ফাই এর নেটওয়ার্ক নোট করে নিল, আর রাউটারের একটা ছবি নিল। তারপর ড্রয়ার খুলতে লাগল একটার পর একটা। যেখানে যা কাগজ পেল – ওয়েস্ট বাস্কেট শুদ্ধ – ছবি তুলল। বইয়ের শেলফ হাতড়াল। একটা মোটা বইয়ের ভিতরে একটা ফলস ফ্ল্যাপ। তার ভিতরে একটা কাগজ। দেখে মনে হয় কোনো লিস্ট। তারও ছবি উঠল।
এরপর বেডরুম আর বাথরুম, বাথরুমের ক্যাবিনেটের ওপর বিশেষ নজর দিল। একটা শিশির মধ্যে কিছু ট্যাবলেট। শিশির ওপর কোনো লেবেল নেই। পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের ছোটো ব্যাগ বার করে তাতে গোটা দুয়েক ট্যাবলেট ভরল।
ঘড়ি দেখল একবার। পনেরো মিনিট হয়েছে। চারদিকে চোখ বোলাল। ঘরে কোনো সেফ নেই। তবুও একবার আলমারি খুলে দেখে নিল। না, কিছু নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল, সাইডে কাঠের ওপর একটা হুক লাগানো। তার থেকে কিছুই ঝুলছে না। শুধু শুধু হুক থাকবে কেন? এপাশ-ওপাশ ঠেলল হুকটাকে। কিছুই হল না। তারপর চাবির মতো ঘোরাতেই একটা প্যানেল খুলে গেল। হাত দিল ভিতরে।
থোকা থোকা নোট। আন্দাজ করল, লাখ পঞ্চাশ তো

হবেই। ফ্ল্যাশ দিয়ে ছবি তুলল। সব জামা-কাপড় শুদ্ধ ফ্রেম করে আরো কয়েকটা ছবি।
কাজ শেষ। সব কিছু যথাস্থানে রেখে দিয়ে, বাইরের দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।
স্কুটার যখন স্টার্ট করল, বাজে নটা কুড়ি।
সান্টার অফিসে বসে সব ছবি অ্যানালাইজ করতে বেজে গেল রাত প্রায় একটা। সান্টা তখনো অফিসে। লোকটার রিপোর্ট শুনল মুখেই। লোকটার মোবাইল থেকে নিজের কম্পিউটারে ছবিগুলো ট্রান্সফার করল। তারপর রুদ্রকে আর ব্রিগেডিয়ারকে পাঠিয়ে দিল নিজের একটা নোট লাগিয়ে।
লোকটা ততক্ষণে বিদায় নিয়েছে।
সান্টার ঘুম নেই। আবার নিজের কাজে মন দিল।

এখন

তৃতীয় দিন
দিল্লি, বাহাদুরাবাদ, হৃষিকেশ
সকাল ৯:০০ – রাত ১১:০০

জগতার খবরটা পেয়েছে গত রাত্রে। খুদাবক্সকে ঘুম থেকে তুলে বলেছিল ব্যাপারটা। যত তাড়াতাড়ি হয় বেরিয়ে পড়তে হবে। সেইমতো সকালে গিয়ে হাওয়ালা ডীলারের কাছ থেকে দু-লাখ টাকা নিয়ে এসেছে। সকাল থেকে খুদাবক্স আর রবি অনেকগুলো কাজ করে ফেলেছে। নীল রঙের ড্রামদুটোর পুরো ওপর দিকটা খুলে ফেলেছে। ওপরটা আসলে ঢাকনার মতো। স্ক্রু করা। এত টাইট যে খালি চোখে প্রায় বোঝাই যায় না। ভিতরে মোবিল অয়েল।একপাশে হাত দিলে বোঝা যায় ভিতরে একটা পাইপ আছে। স্ক্রু-টপ দিয়ে বন্ধ করা। আসলে এর নীচে আছে সিসার লাইনিং। আর তার ভিতর ভরা আছে রেডিও-অ্যাক্টিভ ওয়েস্ট। পুরো জিনিসটা একবার চেক করে (অবশ্য সিসার লাইনিং-এর ভিতর নয়) আবার ভালো করে ড্রামের ঢাকনা বন্ধ করে, দুটো ড্রামই একপাশে সরিয়ে রাখল। দুটো আরো নীল রঙের ড্রাম- এগুলো আসল – এনে রাখল। আগের ড্রাম দুটোতে একপাশে সাদা ডট দেওয়া আছে। কোনো অসুবিধা হবে না।
জগতার ফিরে এলে দুটো করে ড্রাম দুটো আলাদা ছোট ট্রাকে চড়ানো হল। এরা এগুলোকে বলে 'ছোটা হাথি'। পাহাড়ে অল্প লোডের জন্য এ-ই চলে। হাজার হাজার চলে রোজ। জগতারের ট্রাক দুটো নতুন নয়, আর অনেকবার যাতায়াত করেছে এই দুটোকে নিয়ে।
আগামীকাল সন্ধ্যেবেলা বেরোবে। খুদাবক্স আর রবি যাবে একটা ট্রাকে। জগতার নিজেই অন্য ট্রাকটা চালাবে। ওর সঙ্গে যাবে মোখতার। মোখতার ওদেরই দলের। থাকে আলাদা। নিজের একটা ফটোর দোকান চালায়, ওম শিব নাম দিয়ে। বাহাদুরাবাদ মোড় থেকে একটু এগিয়ে, হরিদ্বারের দিকে। মোখতারকে এখানকার লোকেরা কুলদীপ শর্মা বলে চেনে। অবশ্য বড়ো কাজে মোখতারকে ব্যবহার করা হয় না।
সাতটা নাগাদ পুলিসদের ডিউটি বদলায়, তার আগের আধ ঘন্টা সবাই যাবার জন্য ছটফট করে, কাজে বিশেষ মন দেয় না। সেই সুযোগ নিতে হবে। রাতে থামবে রুদ্রপ্রয়াগ। পরের দিন রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বেরিয়ে বিষ্ণুপ্রায়াগ, পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। সেখান থেকে জগতার যাবে ধৌলিগঙ্গার পাশ দিয়ে, আর খুদাবক্স নেবে অলকনন্দার পাশ দিয়ে বদ্রিনাথের রাস্তা। সারা রাস্তাই দুটো ট্রাক নিজেদের মধ্যে অন্তত দশ কিলোমিটার দূরত্ব বজায় রাখবে।
* * * *
সুস্মিতা আর বিজয় নিজেদের মধ্যে মিটিং ব্রেকফাস্টের সময়ই সেরে নিয়েছে। রাতে এবং ভোরবেলা রুদ্রর অনেকগুলো মেসেজ এসেছিল, সেগুলোর উত্তর দিয়েছে। তারপর সুস্মিতা গাড়ি নিয়ে চলে গেছে রুদ্রপ্রয়াগ, সেখান থেকে আজকেই বিষ্ণুপ্রায়াগ পৌঁছবে। জি এস আই-এর টিম পৌঁছবে আগামীকাল। টিম লিডারকে ডক্টর গুপ্তার কাগজপত্র আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজয় বেরোবে পরে। তবে চেষ্টা করবে রাতে বিষ্ণুপ্রায়াগ পৌঁছে যেতে । নাহলে আগামীকাল ভোরবেলা। দরকার না হলে আর সুস্মিতার সঙ্গে দেখা হবে না। যদিও কোডেড মোবাইলে সম্পর্ক সবসময় থাকবে।
* * * *
রঘুর দিল্লা থেকে বেরোনোর কথা ছিল সকালেই। কিন্তু হঠাৎ ব্রিগেডিয়ারের অফিস থেকে ফোন করে শর্মা - ব্রিগেডিয়ারের পার্সোনাল সেক্রেটারি এবং ডান হাতের বাড়া – কয়েকটা উটকো কাজ মালতী শর্মা ধরিয়েছেন। অ্যাসাইনমেন্টে দেরি হয়ে যাবে বলেও কোনো লাভ হয়নি।

রুদ্রকে নালিশ করেছিল। রুদ্র সমবেদনা জানিয়েছে, তবে এ-ও বলে দিয়েছে যে মালতী শর্মার ওপর কারো কথা চলে না। ব্রিগেডিয়ারেরও নয়। ফোন রেখে নিজের মনেই হেসেছে রুদ্র। রঘুকে একদিন দেরি করানো মানে, সুস্মিতা আর বিজয়কে গুছিয়ে নেবার আর একটু সময় দেওয়া। সান্টার থেকে লেটেস্ট খবর পাওয়ার পর রুদ্রর মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। এখন শুধু মাথা লাগিয়ে একটা সিচুয়েশন তৈরি করা। তবে অনেকটাই ওর ফিল্ড এজেন্টদের হাতে। দেখা যাক।

* * * *

সান্টার হাতে এখন অনেক ডেটা। ফোন বুথের নম্বর থেকে শুরু করে রঘুর ঘর তল্লাসির রেজাল্ট পর্যন্ত, অনেক কিছুর মানে বের করতে হবে। অনেকটাই বেরিয়েছে, তবে ফাইল এখনো পুরো হয়নি। ব্রিগেডিয়ারের কাছ থেকে বিকেল অবধি সময় চেয়েছে। মুম্বই নম্বর থেকে অনেকগুলো ফোন গেছে একটা দুবাই-এর নম্বরে। দুবাই-এর পুলিসকে জানানো হয়েছে। ইউরোপল থেকে এইটুকু শুধু জানা গেছে যে গত দশদিন ধরে ডক্টর মোলনার বেপাত্তা। ওরা নিজেদের সোর্স লাগাচ্ছে।

দুবাইয়ের ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। সাধারণত দুবাইয়ের পুলিস পুরোপুরি কো-অপারেট করে, কিন্তু এবারে যেন মনে হচ্ছে একটু গা-ঝাড়া দিতে চাইছে ব্যাপারটা থেকে। শুধু জানিয়েছে ফোন নাম্বারটা অল-আকসা ফাইন্যান্স কোম্পানির। কোম্পানির মালিকানা সম্বন্ধে কিছু জানায়নি। অফিসটা বরদুবাইতে। একটু ভেবে বিকালের মিটিং-এ রুদ্রকে আসতে বলল।

এখন

চতুর্থ দিন
দুবাই, ওমান
সকাল ৮ঃ০০-রাত ১০:০০

প্লেনের জানলা দিয়ে নিচে দেখছিল রুদ্র। মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যে দুবাই নামবে। স্টুয়ার্ডেস কফি দিয়ে গেছে। গত রাত্রের কথা মনে পড়ছে। ব্রিগেডিয়ারের ঘরে মিটিং শেষ হতে হতে প্রায় সাতটা বেজেছিল। 'রঘু যোশীর' দুবাই কানেকশন আর সান্টার খবর মিলিয়ে ব্রিগেডিয়ারই ডিসিশন নিয়েছিলেন, আর যার ফলে রুদ্রর দুবাই যাত্রা। রুদ্র নিজের কন্ট্যাক্টকে বলে দিয়েছে এয়ারপোর্টেই দেখা করতে, আর রাতের মধ্যেই যতটা পারে খবর নিতে। রুদ্রর মনে হচ্ছে হাতে বেশি সময় নেই। বিজয়েরও একই মত। রাতে ওর সঙ্গেও কথা হয়েছে।

ইমিগ্রেশন থেকে বেরোতেই একজন ওর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। রুদ্র জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখল একটা চিরকুট। একটা নাম লেখা। রুদ্র গেটের দিকে এগিয়ে গেল। যারা প্যাসেঞ্জারদের নিতে এসেছে তারা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রুদ্র প্ল্যাকার্ড দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। একটু তফাতে একজন, শোফারের ড্রেস পরা, হাতে মিস্টার হরিশ গুপ্তা লেখা একটা বোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে। রুদ্র ইশারা করল। লোকটা একটু মাথা ঝাঁকিয়ে পার্কিং-এর দিকে এগিয়ে গেল। রুদ্রর হাতে একটা গ্রিপ ছাড়া কিছু নেই। রুদ্র লোকটাকে ফলো করে পার্কিং-এর এক্সিটে অপেক্ষা করল। মিনিট পাঁচেক পরে একটা এস ইউ ভি এসে দাঁড়াল ওর পাশে। রুদ্র পিছনে উঠে বসল।

ড্রাইভার নিজের টুপিটা খুলে পাশে রাখল।

-সালাম আলেইকুম, সায়েব।

-আলেইকুম অসসালাম, মুর্তজা। ক্যাএফ হালুকাম ? এয়ফ তাকাদুমিন ? কেমন আছ ? কাজ এগিয়েছে কিছু ?

-এগিয়েছে। একটু খরচাও হয়েছে।

-খরচ নিয়ে ভেবো না। খবর কী ?

-আল-আক্সা কোম্পানির আসল মালিক হচ্ছে বদ্রুদ্দিন

অল-বাগরামি। মাফিয়া ডন। শেখের পরিবারে যাতায়াত আছে। সেজন্য কেউ ঘাঁটায় না। যেহেতু কাজ-কম্মো সব দুবাইয়ের বাইরে, পুলিসও খুব একটা বিরক্ত করে না ওকে।

-তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আছে ?

-আমার সঙ্গে ? সাপে নেউলে। কেন, পরে বলব।

-বুঝলাম। লোকটাকে বাগে কীভাবে পাওয়া যাবে ?

-মুশকিল আছে। একটু ভেবে দেখি।

একটা লে-বাইতে গাড়ি দাঁড় করাল মুর্তজা। গোটা দুয়েক ফোন করল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে বলল,

'শহরের ভিতরে কিছু করা যাবে না। সঙ্গে যথেষ্ট সিকিউরিটি থাকে। তবে আজ রাতে ও ওমান যাবে। মাসে দুবার অন্তত যায়। ওর বানু-ইয়াস ট্রাইবের (বেদুইন গোষ্ঠি) সঙ্গে সম্পর্ক আছে। ওর এক বোনের বিয়ে দিয়েছে ওদের ট্রাইবে। অবশ্যই ওদের হাতে রাখার জন্য। বানু-ইয়াসের লোকেরা স্মাগলিং করে সোনা থেকে শুরু করে হিরোইন, সব কিছু। মুম্বাই আর গুজরাটে যায় ওদের মাল।

-তাহলে তো অ্যাকশন নিতেই হচ্ছে। বাগরামি কোথায় যায় বার করতে পারো ?'

মাথা নাড়ল মূর্তজা, 'যায় রুব্অল-খালির কোনো একটা জায়গায়। বেন-হামিরা তো বেদুইন। রুব্অল-খালির মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।স্মাগলিং-এর কাজ তো ঐভাবেই হয়। এখন ওরা কোথায় থাকবে সেটা জানা যেতে পারে।'

-মালুম করো।

মুর্তজা আবার ফোন লাগাল। কল শেষ করে গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ি আবার ঘোরাল এয়ারপোর্টের দিকে।

-'আমি ধরেই নিচ্ছি আমাদেরও ওমান যেতে হবে।' হাসল একটু, 'আমার সম্পর্কে ভাই আছে ওমানে। ওকে বলে দিলাম খোঁজ নিতে। আমরা এখনি রওনা দিলে –' ঘড়ি দেখল '– লাঞ্চ নাগাদ সালালাহ্পৌঁছে যাব। আমার ভাই থাকবে সেখানে। তারপর ওই ব্যাবস্থা করবে।'

রুদ্র আর কিছু বলল না। গাড়ি ততক্ষণে এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেছে।

মূর্তজা গাড়ি সোজা নিয়ে গেল যেদিকে চার্টার প্লেনগুলো থাকে। রুদ্রকে গাড়িতে বসতে বলে এগিয়ে গেলো একটা চার্টার অফিসে। মিনিট দশেক পরে ফিরে এল।

-চলো সায়েব। প্লেন তৈরি। টাকা অবশ্য অ্যাডভান্স দিতে হবে।

মাথা হেলিয়ে রুদ্র প্লেনের দিকে এগোল। ছোটো প্লেন, একটা বীচক্র্যাফট বোনানজা। পাইলট নিজেই একটা ক্রেডিট কার্ড মেশিন সঙ্গে করে নিয়ে এল। টাকা মিটিয়ে দিতে, হাসল একটু। পাইলট যে, মালিকও সে-ই। বেশির ভাগ চার্টারই এরকম ভাবে চলে। ট্যাক্সির মতোই প্রায়।

সালালাহ্এয়ারপোর্টে মূর্তজার ভাই অপেক্ষা করছিল। নাম আহাদ। বলল, ওর এক আত্মীয়কে পাঠিয়ে দিয়েছে আগেই, বানু ইয়াসদের ক্যাম্পের খোঁজে। সালালাহ্থেকে প্রায় একশ' কিলোমিটার যেতে হবে উত্তর পশ্চিম দিকে। অন্ধকারের পরেই যাওয়া ভালো। গাড়ির পিছনে যে বালি উড়বে সেটা দেখা যাবে না। আহাদের লোক এক জায়গায় অপেক্ষা করবে, থিঙ্গায়র-এর পাশ দিয়ে যে হাইওয়ে গেছে উত্তর পশ্চিম দিকে, তার মাঝামাঝি। অল-বুরি অল-সালিয়ার মরুভূমির মধ্যে ঢুকতে হবে সেখান থেকে। ঠিক কোন জায়গায় বানু-ইয়াসরা ডেরা ফেলেছে সেটা ও-ই বলে দেবে। আহাদ এ-ও বলল যে অল-বাগরামি সাধারণত এয়ারপোর্ট থেকে নিজের হেলিকপ্টারে চলাফেরা করে। তবে ওদের গাড়িতে যাওয়াই ভালো। সঙ্গে আহাদের বেদুইনরা থাকবে। এরা অল-মুররা। বানু-ইয়াসদের জাত শত্রু।

তিনটে ফোর হুইল ড্রাইভ গাড়িতে রওনা দিল যখন, তখন সোয়া সাতটা। আহাদ একটু চিন্তায় আছে। কথা ছিল ওর লোক –নাম হালিম – প্রতি ঘন্টায় ওকে ফোন করবে স্যাটেলাইট ফোনে। ছ'টার পর থেকে কোনো ফোন আসেনি। তবে এখুনি কিছু করা যাবে না। শেষ যখন ফোন করেছিল, ম্যাপ রেফারেন্স দিয়েছিল। ওটা মাথায় নিয়েই এগোতে হবে।

ম্যাপ রেফারেন্সে পৌঁছতে বাজল রাত দশটা। হাইওয়ে থেকে গাড়ি বালিতে নামিয়ে খুব কম স্পিডে চালাতে হয়েছে। ভাগ্যিস আজ চাঁদ দেরিতে উঠবে। গাড়ির সব লাইট অফ করে শুধু জি পি এস-এর ভরসাতে গাড়ি চালাতে হয়েছে। তবে জি পি এস-এ তো আর বালিয়াড়ির ওঠা-নামা বোঝা যায় না, তাই একজন সমানে গাড়ির আগে আগে হেঁটেছে। প্রথম গাড়িতেই রুদ্র, মূর্তজা আর আহাদ। রুদ্রর হাতে একটা নাইট-ভিশন লাগানো ড্রাগুনভ স্নাইপার রাইফেল, কোমরে একটা ব্রাউনিং অটোম্যাটিক পিস্তল। মুর্তজা-ই জোগাড় করেছে। মুর্তজা আর আহাদের হাতে একটা করে .৩০৩ লি এনফিল্ড। ওরা এই দিয়েই গত পঞ্চাশ বছর ধরে শত্রু নিধন করে আসছে। বাকি লোকেদের হাতে এ কে ৪৭। গাড়ি থামল ম্যাপ রেফারেন্সে। নামল সবাই। কোনো কথা নেই। গাড়িগুলোকে একটা বালিয়াড়ির নীচে দাঁড় করানো

হল। গার্ড রইল দুজন।

রুদ্র দেখল চারদিকে। বালিয়াড়িগুলো অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়া নেই একটুও। তারার আলোতে বালি চিক-চিক করছে একটু। দশ গজের বেশি নজর যায় না। চাঁদ উঠতে এখনো দেরি আছে। সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। আহাদ ফোন লাগাবার চেষ্টা করল। ফোন বেজে গেল।

দূরে একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ। এদিকেই আসছে মনে হয়। আহাদ হাঁচড়-পাঁচড় করে একটা বালিয়াড়ির ওপর উঠেই শুয়ে পড়ল। দূরে হেলিকপ্টারের সার্চলাইট দেখা যাচ্ছে। কাছে আসছে হেলিকপ্টারটা। আহাদ যেখানে, সেখান থেকে তিনশ' মিটার মতো দূরে নামল। চোখে নাইট গ্লাস লাগাল আহাদ।

ইতিমধ্যে রুদ্র আর মুর্তজা দুজনেই উঠে এসেছে। রুদ্র নিজের নাইট ভিশন গ্লাস দিয়ে দেখছে। মনে হচ্ছে কতগুলো তাঁবু রয়েছে। লোকেরা চলাফেরা করছে এটা বোঝা যাচ্ছে। একটা আগুন জ্বালানো হল। আগুন দেখে ওদের তিনজনেরই খেয়াল হল যে বেশ ঠান্ডা পড়েছে। মরুভূমির এখানে তাপমাত্রা দিনে ৬০ ডিগ্রিতে ওঠে, আবার রাত্রে শূন্যতে নামে। জ্যাকেটের জিপটা বন্ধ করল রুদ্র। মুর্তজা আর আহাদ, দুজনের পরনেই জেল্লাবা, আর মাথায় ঘোত্রা। ওদের ঠান্ডা লাগবে না।

কয়েকজন লোক আর একজনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে মনে হল। তার মিনিট পাঁচেক পরেই একটা শিহরণ জাগানো চিৎকার। আওয়াজ শুনেই আহাদ উঠে পড়েছিল, টেনে নামাল মূর্তজা। আহাদ আরবিতে গালাগাল দিয়েই যাচ্ছে। রুদ্র মূর্তজার হাতে হাত রাখতে মূর্তজা বলল, 'গলাটা হালিমের। হালিমকে টর্চার করছে। প্রতিশোধ নিতেই হবে।'

চাপা গলায় রুদ্র বলল ,'প্রতিশোধও নেব, আর বাগরামিকেও দেখে নেবো। এখন নীচে এসো।' বালিয়াড়ির ঢাল দিয়ে স্লিপ করে নেমে এল ওরা। গ্রুপের বাকিরাও হালিমের চিৎকার শুনেছে, রক্ত গরম। সবাই তাকাচ্ছে রুদ্রর দিকে। বেদুইন ওরা। যে টাকা খরচা করছে, সে-ই মালিক।

রুদ্র সবাইকে নিয়ে গেল যেখান থেকে হালিমের গলা শোনা গিয়েছিল, সেইদিকে। হালিমের চিৎকার এখনো শোনা যাচ্ছে, তবে আওয়াজ ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

বালিয়াড়িগুলোর পিছন দিক দিয়েই আন্দাজে হালিমের কাছাকাছি পৌঁছল। বুকে ভর করে বালিয়াড়ির ওপর উঠল। একটু নীচে কালো কী একটা। এখন আর কোনো শব্দ নেই।, তবে ফুট তিরিশেক দূরে একটা লোক। তাঁবুগুলোর দিকে মুখ করে সিগারেট খাচ্ছে। মূর্তজা গ্রুপের একজনকে ইশারা করতে যাচ্ছিল, রুদ্র থামাল। লিডার হিসাবে প্রথম মারটা ওর।

সেন্ট্রি বুঝতেও পারল না ওর পিছন দিক থেকে কেউ আসছে। রুদ্রর কম্যান্ডো কোর্সের সাথীরা বলত, যতক্ষণ না রুদ্র তোমার গলায় ছুরি বসাচ্ছে, তুমি বুঝতেও পারবে না যে তুমি আর একলা নেই। জঙ্গলেই হোক বা মরুভূমিতে, রুদ্রর চলা দেখে কোর্স ইন্সট্রাক্টররা ওকে 'ঘোস্ট হু ওয়াকস' বলে ডাকত।

তিরিশ সেকেন্ডও লাগল না গলাটা কাটতে। সেন্ট্রি আওয়াজ করার কোনো সুযোগই পেল না। কম্যান্ডো নাইফটা বেল্টে ঢুকিয়ে আবার হামাগুড়ি দিয়ে যেখানে অন্য বডিটা পড়ে আছে, সেই অবধি পৌঁছল।

ততক্ষণে আহাদ আর অন্যান্যরা হালিমের বডির কাছে পৌঁছে গেছে। হালিমের অবস্থা দেখে রুদ্ররও মাথা একটু গরম। রুদ্র সৈনিক। শত্রুকে মারতে অসুবিধা নেই, কিন্তু সে তো পরিষ্কার – ক্লিন – মারা। টর্চার করে মেরে আনন্দ পাওয়া নয়।

হালিমকে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়েছে ওরা। বুকটা রক্তাক্ত। তার ওপর নুন ছড়িয়ে দিয়ে রেখে গেছে অমানুষগুলো। এরকম কাজ আর-এক জায়গাতেই দেখেছে রুদ্র। আফগানিস্তানের মেয়েরা এইভাবে স্বামীর হত্যাকারীকে শাস্তি দেয়।

রেপিস্টদেরও একই সাজা, শেষে জ্যান্ত অবস্থাতেই পুরুষাঙ্গ কেটে মুখে ঢুকিয়ে দেয়।

আহাদ ভেজা ভেজা গলায় বলল , 'ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। অনেক আশা ছিল ওর ওপরে। ভীষণ হাসি-খুশি। আমাকে সাহায্য করতে এসেছিল। এই একজনের বদলে এদের সবাইকে শেষ করব।'

কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। বালিয়াড়ির ওপর এতগুলো কালো ছায়া দেখে ফেললেই গোলমাল। আস্তে আস্তে সবাই আবার বালিয়াড়ির পিছন দিকে চলে গেল। দলে সব মিলিয়ে ন-জন। তিনভাগে ভাগ করল রুদ্র। ওর সঙ্গে দু-জন, আর বাকি দুটো গ্রুপকে আহাদ আর মূর্তজা লিড করবে। বাগরামির তাঁবু কোনটা জানা নেই, তবে আন্দাজ করা যায় সব থেকে বড়োটা ওর। ওটা রুদ্রর টার্গেট।

তিন দিক থেকে অ্যাটাক করা হবে। বাগরামি যার ভাগেই পড়ুক, হাতে বা পায়ে গুলি চালাতে হবে, কেটেও দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ না মুখ খুলছে। বাকিরা সায় দিল, মুখ কীভাবে খোলাতে হয় ভালোই জানা আছে। আহাদ শুধু একটা কথা বলল, 'হালিমকে যে বা যারা মেরেছে, তারা আমার।' কেউ

আপত্তি করল না। এই অধিকার আহাদেরই। রুদ্র আর-একটা অর্ডার দিল, যথাসম্ভব ছুরি দিয়ে কাজ সারতে হবে। একেবারে দরকার না-হলে ফায়ারিং চলবে না। আক্রমণ যতটা নিঃশব্দে হয় ততই ভালো। আর বাগরামি ছাড়া আর একজনকে টার্গেট করতে হবে। সে পাইলট। তাকে হয়ত হেলিকপ্টারের আশে-পাশেই পাওয়া যাবে। কোনোমতে যেন বাগরামি পালাতে না-পারে। মাথা নাড়ল মূর্তজা। পাইলটের মহড়া ও-ই নেবে।

* * * *

পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল মিনিট পনেরোর মধ্যে। পাইলটের গলাই কেটে দিয়েছে মুর্তজা।

বাগরামিকে পাওয়া গেল সব থেকে বড়ো তাঁবুটার ভিতরেই। ঘুমোচ্ছিল। তাঁবুর বাইরের গার্ড দু-জনকে সাবাড় করতে লেগেছে মিনিট তিনেক। তারপর তাঁবুর কাপড়ের তলা দিয়ে ঢুকে ভিতরের চাকরকে শেষ করতে আরো মিনিট খানেক। সাইলেন্সড ব্রাউনিং দিয়ে বাগরামির দু-পায়েই গুলি করেছে রুদ্র, আর বাগরামির মুখের ওপরে আর কিছু হাতের কাছে না-থাকায় বালিশ চাপা দিয়েছে। তবে বাগরামির হাতের তলায় যে একটা ছোরা ছিল সেটা খেয়াল করেনি। বাগরামি শোওয়া অবস্থাতেই ছোরাটা ওপর দিকে চালিয়েছে। রুদ্র নীচু হয়েছিল বলেই বোধহয় – বুকের পাশ দিয়ে চলে গেছে। তবে কেটে গেছে অনেকটা, আর বাঁ হাতটাও জখম হয়েছে ভালোমতো। রুদ্রর সাথীরা, রুদ্র কিছু বলার আগেই বাগরামির হাত দুটো বেঁধেছে ওরই ঘোত্রা দিয়ে। তারপর দুজনে মিলে বাগরামিকে টেনে নিয়ে গেছে বাইরে।

আহাদ আর মূর্তজাকে গুলি চালাতে হয়নি। সেজন্য মনে বেশ দুঃখ। ক্যাম্পে গোটা পনেরো লোক ছিল। এখন বাকি আছে গোটা সাতেক। তারা এখন বালিতে বসে, হাত মাথার পিছনে। বেঁচে থাকার আশা কারোরই নেই। যদি দয়া করে গুলি করে মারে বা সোজা গলাটা কেটে দেয়, তাহলেই ধন্য হয়ে যাবে। আহাদের টিমের একজন আর মূর্তজার দুজন, ঘায়েল। দুজন মারাত্মক রকম, বাঁচানো যাবে না, আর তৃতীয় জন হয়ত বেঁচে যাবে, যদি তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়। এখানকার পাট যত শীঘ্র শেষ করা যায় ততই ভালো।

বাগরামিকে মাটিতে ফেলে চারটে খুঁটির সঙ্গে হাত-পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বন্দিদের মধ্যে থেকে যারা হালিমকে মেরেছে তাদের আলাদা করার দায়িত্ব আহাদের। সবকটা লোককে বন্দুকের খোঁচা দিয়ে বালিয়াড়ির ওপাশে নিয়ে গেছে হালিম। রুদ্রই বলেছে। আহাদ যা করবে সেটা রুদ্রর না- দেখলেও চলবে। শুনতে তো পাবেই।

ফিল্ড প্যাক থেকে স্টিকিং প্লাস্টার বার করে রুদ্রর বুকে আর হাতে লাগিয়ে দিয়েছে মূর্তজা। তবে স্টিচ করতে হবে বেশ কয়েকটা। রক্ত এখনো বন্ধ হয়নি।

রুদ্রকে পাশে বসিয়ে জেরা শুরু করল মূর্তজা। হাতে বেদুইন ছুরি, মাঝে মাঝে অন্য একটা ছুরির ওপর সেটা ধার করে নিচ্ছে। আরবিতেই কথাবার্তা ।

-এই সায়েব যা জানতে চাইবে তার উত্তর দেবে।

বাগরামি থুতু ফেলল মূর্তজার গায়ে। মূর্তজা ছুরি দিয়ে ওর ঠোঁট দুপাশে হাল্কা করে কেটে দিল।

-পরের বার থুতু ফেলতে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য কেটে দিলাম। যদি বলো, তোমার মুখের হাঁ আরো বড়ো করে দিতে পারি। যদি আমাকে দেখতে অসুবিধা হয় তাহলে তোমার চোখটাও বড়ো করে দিতে পারি। দেব ?'

মিহি সুরে কথাগুলো বলল মূর্তজা। 'তোমরা আমার ভাইকে খামখা মেরেছ। বুঝতেই পারছ আমি তোমাকে কত ভালোবাসি।' একটু থেমে, 'এখন বলো, ইন্ডিয়াতে যে মাল পাঠিয়েছ, তা কোথায় পেলে।'

'কোন মাল?' উত্তরে গলার জোর নেই।

'মনে পড়ছে না ? আচ্ছা, মনে করিয়ে দিচ্ছি।' এক টানে বাগরামির জেল্লাবার সামনেটা কেটে দিল মূর্তজা। মুখে

বলল, 'সব কথা তো পেটে চেপে রেখেছ। তাহলে তোমার পেটকেই মনে করাই?' ছুরি দিয়ে বাগরামির পেটে ইন্ডিয়া লিখল মূর্তজা। লাল দাগে ভরে গেল চামড়াটা, 'এখনো যদি মনে না- পড়ে তাহলে চামড়া একটু সরিয়ে দেব, যাতে কথাটা চট করে বেরিয়ে আসতে পারে।' আবার বাগরামির পেটে ছুরি ঠেকাল মূর্তজা।

'আমাকে মেরে ফেললেও বলব না।' দাঁতে দাঁত চেপা বাগরামির। রুদ্র ভাবছে, মরদ কা বচ্চা। মুখ থেকে পেট থেকে, রক্ত বেরিয়েই যাচ্ছে লোকটার।

মূর্তজার গলায় আবার সেই মিহি সুর, 'তুমি মরতে চাও ? তা কীভাবে মরবে বলো ? তোমার মতো শুয়োরের বাচ্চাকে গুলি করে আমার গুলির অপমান করতে চাই না। তাহলে তোমার পায়ে আগুন-ই দিয়ে দিই। পকেট থেকে লাইটার বার করে বাগরামির শার্টের কিছুটা ছিঁড়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দিল মূর্তজা। বাগরামির পায়ের তলায় ধরল কাপড়টা। বাগরামি ছটফট করছে, কিন্তু পা তো বাঁধা।

-এবার মনে পড়েছে?

পায়ের তলাটা পুড়ে মাংস পোড়ার গন্ধ বেরতে শুরু করেছে।

-বলছি, বলছি। পাকিস্তান থেকে এসেছিল। নর্থ কোরিয়ার মাল। দোহাই, আমি আর কিছু জানি না। আমাকে বলেছিল বালসারে সমুদ্রের ধারে পৌছে দিতে। আমি তা-ই দিয়েছি।

জ্বলন্ত কাপড়টা একটু সরাল মুর্তজা।

-ক-বার পাঠিয়েছ মাল?

-দুবার।

'ঠিক?' কাপড়টা আবার বাগরামির পায়ের তলায়।

'বিসিওর সচ্।' বাগরামি যে আসলে আফগান, সেটা এতক্ষণে বোঝা গেল।

-টাকা কে দিয়েছিল ?

-কাদের টাকা, জানি না। আমি অন্য মাল কিনেছিলাম এক চীনা কোম্পানি থেকে,পাকিস্তান থেকে বলে দিয়েছিল ওভার-ইনভয়েসিং করে দিতে। তাই দিয়েছিলাম।

-মুম্বাইয়ের ফোন তোমার অফিসে কে রিসিভ করে ?

-আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি, মামুদ। পাকিস্তানি। পাকিস্তান থেকে যে খবর আসে, অর্ডার আসে, ও-ই নেয়।

-সে কোথায়?

-আমার সঙ্গেই তো আজ এসেছিল, বেঁচে আছে কিনা জানি না।

রুদ্রর দিকে তাকাল মূর্তজা। 'আর কিছু?' , মাথা নাড়ল রুদ্র। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। রক্ত পড়েই যাচ্ছে। বন্ধ হয়নি।

বাগরামির দিকে তাকাল মূর্তজা। উঠে দাঁড়াল। 'তুমি যা করেছ, দোজখেও তোমার জায়গা হবে না। তবে বলা তো যায় না, আগে সেখানে চেষ্টা করে দ্যাখো।' পকেট থেকে পিস্তল বার করে বাগরামির মাথায় গুলি করল। খুলিটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

রুদ্রকে আস্তে আস্তে ধরে তুলল।

-আপনাকে তো ঠিক হতে হবে সায়েব। কপ্টার আপনাকেই তো চালাতে হবে। নইলে দিলাওয়ারকে বাঁচানো যাবে না।

-আমার ফিল্ড প্যাকে ব্র্যান্ডি আছে। দাও।

ব্র্যান্ডি বার করে দিল মূর্তজা। একটু খেয়ে ধড়ে যেন প্রাণ এল। প্যাক থেকে বেঞ্জেড্রিনের ছোটো শিশি বার করে পকেটে পুরল। একটু পরে কাজে লাগবে।

-দিলওয়ারকে কপ্টারে তোলো। আমি আসছি।

একটু টলতে টলতেই হেলিকপ্টারের দিকে এগোল রুদ্র। অনেকটা রক্ত গেছে। প্লাজমা প্যাক লাগানো উচিৎ। তবে প্লাজমা লাগিয়ে তো আর কপ্টার চালানো যাবে না, বেঞ্জেড্রিনের ওপরেই ভরসা করতে হবে। মূর্তজা গেল সব ব্যাবস্থা করতে। আহাদকেও বলতে হবে। মামুদ যদি বেঁচে গিয়ে থাকে, তাহলে কথা বার করার আগে যেন ওকে শেষ না-করে। আহাদ আর বাকিরা গাড়ি করেই ফিরবে। দুজন শুধু যাবে রুদ্র আর মূর্তজার সঙ্গে, দিলওয়ারকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

* * * *

সালালাহ পৌঁছে, দিলওয়ারকে হাসপাতালে দিয়ে (বেদুইনদের মধ্যে মারামারিতে প্রায়ই লোক ঘায়েল হয় - পুলিস কিছু বলে না, বলে লাভও নেই), নিজের স্টিচ করিয়ে, চার্টার প্লেনে মাস্ক্যাট পৌঁছতে দিন গড়িয়ে গেল। মূর্তজার কথামতো রাতটা হোটেলেই কাটাবে ঠিক করল রুদ্র। কাজের মধ্যে সন্ধ্যাবেলা মূর্তজার লোক এসে একটা মোবাইল দিয়ে গেল রুদ্রকে। মামুদের মোবাইল। একবার দেখে নিজের গ্রিপের মধ্যে পুরে ফেলল। ওটার থেকে যা বার করার, সান্টাই করবে। মাথা খাটিয়ে লাভ নেই। শরীর আর দিচ্ছে না। খাবার ইচ্ছে নেই। কোনোমতে বিছানায়।

এখন
চতুর্থ দিন
বিষ্ণুপ্রয়াগ
রাত ৮:০০ – পরদিন সকাল ৮:০০

বিজয়ের পৃথিবীটা খুব ছোটো হয়ে এসেছে। রাইফেলের নাইট স্কোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বিজয়ের পরনে কালো পুলওভার, কালো জিনস। পায়ে কালো ডেজার্ট বুট । মাথায় কালো সাফারি ক্যাপ। মুখে আর হাতে কালো ক্যামুফ্লাজ পেইন্ট লাগানো। রাইফেলের যন্ত্রপাতি সবই কালো। কালো ঝোপের মধ্যে মাটিতে একটা কালো গ্রাউন্ড-শিটের ওপর শুয়ে।

বিজয় কোয়ালিফায়েড স্নাইপার। লক্ষ্যভেদকারী অর্জুনের মতো, নাইট স্কোপের বাইরে কোনোকিছুতেই ওর মন নেই। ধৈর্য আর কনসেন্ট্রেশন না-থাকলে স্নাইপার হওয়া যায় না।

বিজয় তাক করে আছে নদীর ওপারে, তপোবনে। একটা পায়ে চলা পথের থেকে একটু চওড়া রাস্তায়, যেটা প্রায় ধৌলিগঙ্গার পাড়ে এসে ঠেকেছে। বিজয় নদীর এপারে। নদী এখানে দুশ মিটারের বেশি চওড়া নয়, আর বিজয়ের রাইফেল অনায়াসে আটশ মিটার অবধি গুলি চালাতে পারে। এখন সাইলেনসার আর ফ্ল্যাশ সাপ্রেসর লাগানো আছে, তাই রেঞ্জ একটু কম। নইলে বারোশ মিটার অবধি গুলি চালানো যায়। ড্রাগুনভ এস ভি ডি।

ঘড়ি দেখল বিজয়। আটটা । একটা ছোটো নীল রঙের ট্রাক, ঘন্টাখানেক আগে বিষ্ণুপ্রয়াগের মোড় থেকে তপোবনের দিকে ঘুরতে দেখা গেছে। ট্রাকের পিছন দিকটা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। এমনিতে সন্দেহের কিছু ছিল না, কিন্তু ট্রাকটা পিছনের রাস্তা দিয়ে পুলিস চৌকি এড়িয়ে তপোবনের রাস্তায় পড়েছে।

সারভেইলান্স ড্রোন সেটা দেখেছে। আই টি বি পি-র কন্ট্রোল রুম থেকে বিজয়কে খবর দেওয়া হয়েছে। বিজয় আধ ঘন্টা আগে এসে জায়গা পছন্দ করে, ঘাঁটি গেড়েছে।

অবশ্য এই জায়গাটা ছাড়া নদীর কাছে পৌঁছবার অন্য রাস্তাও আছে। তবে সেগুলো কোনোটাই বড়ো রাস্তার কাছে নয়, আর ট্রাক নিয়ে নামাও মুশকিল। তবুও এই রাস্তার আগে আর পরে দু- জায়গায় ঘাঁটি গাড়া হয়েছে। সেগুলো অবশ্য দুপুর থেকেই। একটাতে সুস্মিতা দুজন মহিলা কম্যান্ডোর সঙ্গে, আর অন্যটাতে। দুজন আরো। ওরা সবাই অন্য পারে। ওই রাস্তাটা থেকে দুশ মিটারের মধ্যে।

বড়ো রাস্তায় প্লেন ড্রেসে পুলিস আছে। ট্রাক পাস করলে ওয়ারলেসে খবর দেবে। ফায়ারফাইট হবারই সম্ভাবনা বেশি, তাই পুলিসদের আর আটক করতে বলা হয়নি।

আতংকবাদীদের আটকানো সাধারণ পুলিসের কর্ম নয়।

একটু পরে মেসেজ এল – ট্রাক সুস্মিতাদের পজিশন

পেরিয়েছে, সুস্মিতার গ্রুপ এগিয়ে আসছে নদীর পাড় দিয়ে।

* * * *

জগতার আর মোখতার কর্ণপ্রয়াগ অবধি ঠিকই এসেছে। দু-বার পুলিস চৌকিতে আটকেছিল, কাগজ দেখে ছেড়ে দিয়েছে। ইচ্ছা করেই পুলিসের ডিউটি বদলের সময় ধরে ধরে এসেছে। পুলিস ঢিলে দিয়েছে। কর্ণপ্রয়াগের পর পিছনের রাস্তা ধরেছে। বিষ্ণুপ্রয়াগের মোড় ঘুরতেই একটু এগিয়ে আর-একটা ব্যারিকেড। এখানে একটু কড়াকড়ি। জগতার ভাবল, আগে এন টি পি সি-র কমপ্লেক্স আছে, হয়ত সেজন্যই । ব্যারিকেডে পুলিস কম্যান্ডো। হাতে মেশিন পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে। একজন কম্যান্ডো ট্রাকে উঠে ড্রামগুলো দেখল। ওপরের ক্যাপ খুলে টর্চ দিয়ে দেখল ভিতরটা। মোবিল অয়েল। ভাগ্যিস ড্রামগুলো সরাবার চেষ্টা করেনি। দুশ' লিটারের ড্রামের ওজন দুশ' কিলোর কাছাকাছি হওয়া উচিত। জগতারের ড্রামগুলোর ওজন প্রায় তিনশ। রেডিওঅ্যাক্টিভ ওয়েস্ট খুব ভারী। তাছাড়া সিসার লাইনিং রয়েছে।

দুটো ব্যারিয়ার আরো পেরোতে হল তপোবনের আগে। আগের ব্যারিয়ারের লোকেরা ছাপ মেরে দিয়েছে কাগজে।

এই দুটোতে আর বেশি চেকিং হল না। আল্লার মেহেরবানি। মাঝপথে একটা ছোটো চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চা খেল। এখনো একটু আলো আছে। একটু দেরি করাই ভালো। ছোটো রাস্তার বাঁকটা চট করে চোখে পড়ার মতো নয়। মোখতার চোখ রাখছিল অনেকক্ষণ থেকে। অবশেষে...
ট্রাকটা আস্তে করে বাঁ-দিকে ঘোরাল জগতার। বেশ খাড়াই। এবড়ো-খেবড়ো। এঁকেবেঁকে নীচে নেমেছে। খুব সাবধানে নামাতে হবে গাড়ি। হেডলাইট জ্বালানো চলবে না। চারপাশে কোথাও আলো নেই। হেড জ্বালালে এক কিলোমিটার দূর থেকেও চোখে পড়বে।
ফার্স্ট গিয়ারে গাড়ি নামছে। আলো না-থাকায় মোখতার এখন রাস্তায়। ট্রাকের সামনে সামনে চলেছে। হাতে একটা লাঠি। রাস্তার এপাশে-ওপাশে কী আছে দেখার সময় নেই, সুযোগও নেই। জগতার ড্যাশবোর্ডের তলা থেকে একটা এ কে বার করে সিটের ওপর রেখেছে। কুর্তার পকেটে একটা পিস্তলও আছে। একটা পিস্তল মোখতারের কাছেও। সাবধানের মার নেই।
চারদিকে যাকে বলে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ওপারের পাহাড়েও কোথাও কোনো আলো নেই। শব্দের মধ্যে শুধু ধৌলিগঙ্গার জলের আওয়াজ। পাহাড়ি নদীর জলোচ্ছ্বাস। সেই শব্দ অন্য সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে। জগতার ভাবল, এ-ও ভালোই। ইঞ্জিনের আওয়াজও মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।
মাঝে মধ্যে ফোয়ারার মতো জলের ফেনা ওপরে উঠছে, অন্ধকারের মধ্যে একটু সাদা ভাব। নদী থেকে একটা কুয়াশা মতো আস্তে আস্তে উঠছে। এটাও জগতারেরই পক্ষে।
ট্রাক এতক্ষণে প্রায় আড়াইশ মিটার নীচে নেমে এসেছে বড়ো রাস্তা থেকে। এক জায়গায় ট্রাক দাঁড় করালো জগতার। একটু দেখতে হবে। রাস্তা যদিও আরো নীচে নেমে গেছে, কিন্তু এই অন্ধকারে সেখানে ট্রাক ঘোরানো যাবে কিনা সেটা দেখা দরকার। মোখতারের সঙ্গে কথা বলল। মোখতার এগিয়ে গেল। মিনিট তিনেক পরে ফিরে এল।
-আগে রাস্তা তং হ্যায়, জগতারভাই। গাড় ইয়েহিঁ ঘুমানা পড়েগা।'
-'ঠিক হ্যায়। দরিয়া কিতনা দূর?'
-ডেড়সো মিটার আউর হোগা।
-তো মাল ইয়াঁ হি উতারতে হ্যাঁয়। হাঁথ লগাও।
ট্রাকের পিছনের ডালা খুলে দুজনে মিলে একটা কাঠের পাটাতন লাগাল। ড্রামগুলোকে গড়িয়ে গড়িয়েই নামাতে হবে। একটা একটা করে দুটো ড্রাম গড়াল। এই শীতেও ঘাম ঝরছে দুজনের। মোখতার বসে পড়ল পাটাতনটার ওপরে। জগতার দাঁড়িয়েই একটা সিগারেট জ্বালাল। এ কে ৪৭-টা এখন ওর কাঁধে।

* * * *

বিজয় ফ্রাস্ট্রেটেড। ট্রাক যখন আস্তে আস্তে নীচে নামছিল তখনই বিজয়ের স্কোপে ধরা পড়েছে। কিন্তু আর-একটু নামার পর আর দেখা যায়নি। নদীর কুয়াশা ক্রমেই ওপরে উঠছে। ওর নাইট ভিশন স্কোপ দিয়েও কিছু দেখা যাচ্ছে না। এখানে থাকার আর কোনো মানে হয় না। উঠে পড়ল। নদীর ভয়ঙ্কর স্রোত। ওপারে যাবার কোনো রাস্তা নেই। ওর জিপ শখানেক মিটার ওপরে। জিপে বসে ড্রাইভারকে বলল, 'চলিয়ে।'

* * * *

সুস্মিতারা তিনজন পাড় দিয়ে রাস্তার কাছেই চলে এসেছে। হঠাৎ মনে হল গোঁ-গোঁ করে একটা আওয়াজ। লো গিয়ারের ইঞ্জিন। সুস্মিতা হাত তুলল। ওর পিছনের কম্যান্ডো সাথীরা দাঁড়িয়ে পড়ল।
ইশারা করল সুস্মিতা। সঙ্গী দুজন একেবারে নদীর পাড়ে নেমে গেল। দৌড়ে রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে গিয়ে রাস্তাটা পার করল। তারপর ওপরে উঠে এল আবার। সুস্মিতা এখন রাস্তার একপাশে, রাস্তা থেকে মিটার পাঁচেক দূরে। ওর সঙ্গীরা রাস্তার ওপারে । ওরাও রাস্তা থেকে মিটার পাঁচেক।
সুস্মিতার হাতে একটা ট্যাভর ২১ 'বুলপাপ' অ্যাশল্ট রাইফেল। ওর সাথীদেরও তা-ই। এটাই আই টি বি পি-র কম্যান্ডোদের অস্ত্র। সুস্মিতা নিজের লেজার সাইট সাথীদের দিকে ঘুরিয়ে একবার অন্‌অফ করল।উত্তরে একটা ছোটো লাল বিন্দু সুস্মিতার হাতের ওপর পড়েই নিভে গেল। তিনজনে ওপরে উঠল রাস্তাটার দু-পাশ দিয়ে। ট্রাকের সাইড লাইট এখন দেখা যাচ্ছে।
এখন আরো সাবধানে এগোতে হবে। ঘন অন্ধকারে কিছুই প্রায় দেখা যায় না। ট্রাকের সাইড লাইট এখনো জ্বলছে। দুটো লোক দুটো ড্রাম ট্রাকের সামনে এনে রেখেছে। নীচে নিয়ে যাবার মতলব। সুস্মিতা ঠিক করল, যদি লোকদুটো ট্রাকটাকে না-ঘুরিয়েই ড্রামগুলো নীচে নিয়ে যায়, তাহলে যখন ড্রাম গড়াবে, তখন অ্যাটাক করবে, নয়ত যদি ট্রাক আগেই ঘোরায়, তখন। এই সরু রাস্তায় ট্রাক ঘোরাবার সময় দুজনেরই মন থাকবে ট্রাকের দিকে, অসুবিধা হবে না। আর যদি না-ঘুরিয়েই

ড্রাম নিয়ে নীচে রওনা হয়, তাহলে যদি একটা লোক ফস্কায়ও, ট্রাক ঘুরিয়ে পালাবার সময় পাবে না।

একটা দেশলাই জ্বলল। একজন সিগারেট ধরাচ্ছে। ভালো, অন্তত দশ সেকেন্ড চোখ অন্ধকারে কিছু দেখতে পাবে না। এই সুযোগ।

সুস্মিতা এখন একটা গাছের পাশে, ওর সাথীরা রাস্তার অন্য পারে, ঝোপের পিছনে।

সুস্মিতা সিগারেটওয়ালার দশ ফুটের মধ্যে।

উঠে দাঁড়াল। ওপাশে অন্য দুজনও দাঁড়ানো।

* * * *

জগতার সবে প্রথম সুখটানটা দিয়েছে, ওর খুব কাছ থেকে মেয়েলি গলায় কে বলল,

-'হাথ উপর। হ্যান্ডস আপ।'

জবাব না-দিয়েই জগতার কোমরের এ কে-টা না উঁচিয়েই র‍্যাপিড ফায়ার করল যেখান থেকে আওয়াজটা এসেছে, সেই দিকে। উত্তরে ওদিক থেকেও ফায়ার হল, তিনবার। একটা জগতারের বুকে লাগল, একটা ডান দিকের কোমরে, তবে তৃতীয়টা সোজা মাথায়। দুটো বডি পড়ার আওয়াজ হল। মোখতার কোনো সুযোগই পায়নি। সুস্মিতার 'হ্যান্ডস আপ' শোনার সঙ্গেসঙ্গেই অন্য দুজন নিজেদের বন্দুকের ম্যাগাজিন প্রায় খালি করে দিয়েছে মোখতারের ওপর। মোখতার পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল নিজের পিস্তল বার করার জন্য। হাত পকেটেই রয়ে গেল।

কম্যান্ডো দুজন এগিয়ে এল। একজন পা দিয়ে মোখতারের বডি একপাশে সরিয়ে দিল। অন্যজন এগিয়ে গেল সুস্মিতার দিকে।

সুস্মিতা পড়ে আছে একটা গাছের পাশে। টর্চ জ্বালিয়ে দেখল, সুস্মিতার ডানপাশে গুলি লেগেছে। কোমরের একটু ওপরে। হাতেও লেগেছে বোধহয়। রাইফেলটা ছিটকে পড়েছে। কম্যান্ডো নিজের ওয়াকি-টকি অন করল।

-ইমারজেন্সি। কম্যান্ডো ডাউন। অভি পহুঁচো।

অন্য কম্যান্ডো টিম থেকে উত্তর এল, 'টেন মিনাটস্। ওয়েট।'

সুস্মিতাকে ইভ্যাকুয়েট করার আধ ঘন্টা পর আর্মির সি বি আর এন ইউনিট (কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল অ্যান্ড নিউক্লিয়ার) এসে ড্রামগুলো নিয়ে গেল।

* * * *

বেস হাসপাতালে সুস্মিতাকে দেখতে গেল বিজয়। বুকের ডান দিকে হাতে আর পায়ে গুলি লেগেছে। রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রচুর। তবে সময়মতো প্লাজমা প্যাক দেওয়ায় এখন সুস্থই আছে, যদিও ড্রিপ চলছে।

সুস্মিতার প্রথম প্রশ্ন , 'লোকটা মরেছে তো? আমি দেখতেই পেলাম না। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। সরি।'

-লোকটা তো মরেছে। তুমি বেঁচে গেছ, এটাই ভালো। নইলে রুদ্রকে কী জবাব দিতাম?'

ভুরু কোঁচকাল সুস্মিতা ,'এর সঙ্গে রুদ্রর কী সম্পর্ক ? আমি তো ডিউটি করছিলাম।'

-'না, না, রুদ্রর আর কী সম্পর্ক। টিম মেম্বার তো ? চিন্তা তো হবেই।' বিজয় সামাল দেবার চেষ্টা করল।

'হুঁঃ। ওকে বলা হয়েছে ?' একটু রাগতভাবেই বলল সুস্মিতা। রুদ্রর ব্যাপারে ও একটু বেশিই সেনসিটিভ।

-বলেছি। আজই এসে পড়বে। দেরাদুন থেকে চপার (হেলিকপ্টার) নিয়ে আসবে। তোমাকে দিল্লির হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

-কোনো দরকার ছিল না। যতসব বাড়াবাড়ি। আমি এখানে তো ভালোই আছি।

'বসের ব্যাপার, বসই জানে।' কথা ঘোরাল বিজয়, 'হয়ত কোনো কাজ আছে।'

-'হতে পারে।' দাঁড়ি টানল সুস্মিতা।

এখন
চতুর্থ দিন
বিষ্ণুপ্রয়াগ – যোগধ্যান বদরি
সন্ধ্যা ৭:০০ – রাত ১০:০০

রঘু যোশী বিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছেই বিজয়কে ফোন করেছিল, ওরা কোথায় আছে জানবার জন্য। তার একটু আগেই রুদ্রর ফোন এসেছে, রঘুকে বলা হয়েছে বিজয়কে রিপোর্ট করতে। নতুন অর্ডার। বিজয় এখন ঘটনাস্থলের টিম লিডার।
বিজয়ের সন্দেহ আতংকবাদীদের দুটো টিম থাকতে পারে, কেননা দুটো ট্রাকের রওনা হবার খবর এন আই এ থেকে পাওয়া গেছে – আর সেক্ষেত্রে অন্য ট্রাকটা হয়ত অলকানন্দার দিকে যেতে পারে। রঘুকে ওই দিকেই যেতে বলেছে বিজয়। এছাড়া বলেছে লোকাল আই টি বি পি ক্যাম্পে গিয়ে অন্তত তিনজন কম্যান্ডো জোগাড় করে সঙ্গে নিয়ে যেতে। বেস ক্যাম্পের কম্যান্ড্যান্টকে বলে দিয়েছে রঘু রিপোর্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে বিজয়কে যেন খবর দেওয়া হয়।
বিষ্ণুপ্রয়াগ পৌঁছতেই রঘুর বেজেছিল বিকাল পাঁচটা। তারপর টিম জোগাড় করে বেরোতে বেরোতে আরো ঘন্টাখানেক। এ-রাস্তাতেও পুলিস চৌকি বসানো হয়েছে, গোবিন্দ ঘাট গুরদোয়ারার সামনে। পুলিস কম্যান্ডো আছে। তাদের কাছ থেকে জানা গেল একটা ট্রাক গোটা তিনেক অয়েল ড্রাম নিয়ে ব্যারিকেড পেরিয়েছে আধ ঘন্টা আগে। রঘু ঘড়ি দেখল, সাতটা বাজে। অন্ধকার হয়ে এসেছে। রঘু হিসাব করল, বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে বদ্রিনাথ প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার। ওরা এখন প্রায় পনেরো কিলোমিটার এসেছে। আধঘন্টায় ট্রাক আরো দশ কিলোমিটার মতো এগিয়েছে। ধরে ফেলা যাবে।
দুটো জিপসিতে রঘুর টিম। ছুটল দুটোই।
জে পি পাওয়ার প্রজেক্টের এলাকা পেরোল। এখন প্রায় অন্ধকার, তবে বেশ কিছুটা আগে একজোড়া টেইল লাইট দেখা যাচ্ছে মনে হল। রাস্তার দুটো বাঁক পরেই।
জিপসির হেডলাইট অফ করতে বলল রঘু। আরো কিছুটা এগিয়ে টেইল লাইট আর দেখা গেল না। দুটো জিপসিই দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে নাইট ভিশন গ্লাস দিয়ে দেখল রঘু। একটু দূরে একটা পাহাড়ি পথ দিয়ে হেডলাইটের আলো ক্রমশ নীচে নামছে।
রঘু টিম নিয়ে দৌড়ল। রঘুর হাতে এইচ কে এম পি ফাইভ মেশিন পিস্তল। রেঞ্জ একশ মিটার। ট্রাক এখনো রেঞ্জের ভিতর আসেনি। তবে আসতে তো হবে। একটু আস্তেই নামছে সবাই। এখন হাত-পা ভাঙার কোনো মানে হয় না।

* * * *

ট্রাকটা থেমেছে। নাইট ভিশন গ্লাসে দেখা যাচ্ছে দুটো লোক। ট্রাকের পিছন থেকে ড্রাম নামাচ্ছে। রঘু ষাট-সত্তর মিটার দূরে।
-হাঁথ উপর।
লোক দুজনই হাত তুলল। রঘু এগিয়ে গেল। ওর টিম পিছনে।
'পকেট মে ক্যা হ্যায়, নিকালো', রঘুর স্বর চাপা। লোকটা পকেটে হাত দিতে যেতেই রঘু ওর মাথায় গুলি করল। মাথা ফেটে চারিদিকে রক্ত। অন্য লোকটাকেও কথা বলার কোনো সুযোগ না- দিয়ে তাকেও গুলি করল।
এই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রঘুর টিম এসে পড়েছে। একজন বলল, 'সাব, সওয়াল নেহি পুছনা থা?'
'পিস্তল নিকাল রাহা থা পকেট সে,' কথাটা বলেই পিছন ফিরল রঘু, 'চলিয়ে,ওয়াপস জানা হ্যায়।'
রঘু বিজয়কে ফোন করল, 'এলিমিনেশন কমপ্লিট।'
রঘুর টিম এগিয়ে গিয়ে ট্রাকটাকে ঘোরাল। বডি দুটো ট্রাকে তোলা হল। বডি তোলার সময় একজন কম্যান্ডো অন্যজনকে বলল, 'এর পকেটে তো পিস্তল ছিলই না। এর পিস্তল তো কোমরে।' আস্তে আস্তে আবার ওপরের রাস্তায় নিয়ে চলল।
অন্যজন উত্তর দিল, 'তো? আমাদের কী ? সালা তো আতংকবাদী থা।'
বিষ্ণুপ্রয়াগে ফিরতে বেজে গেল রাত দশটা।

এখন
পঞ্চম দিন
মুম্বই, বালসার
সকাল ৮:বিলে ৪:০০ – রাত ১০:০০

বিজয় মুম্বই পৌঁছেছে গতকাল রাতেই। রুদ্র আর সুস্মিতার সঙ্গেই চপারে দেরাদুন পৌঁছে সেখান থেকে দিল্লি

এসে আবার মুম্বইয়ের ফ্লাইট ধরেছে। চপারে বসেই রুদ্র ওকে ব্রিফ করেছে। মামুদ মুম্বইতে যার সঙ্গে কথা বলত তার নাম জালিল কোলহাপুরি। ওই নামেই মামুদের মোবাইলে সেভ করা ছিল। লোকটা ডন। মুম্বই পুলিসের নজরে আছে। ঠিকমতো টাকাও দেয় নীচের তলার পুলিসকে। মুম্বইয়ের বুকের ওপর বসেই নিজের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। পোওয়াই-এর বাইরে বাংলো। জনা দশেক বডিগার্ড সর্বদা হাজির।

রুদ্র আরো বলেছে, লোকটার কাছে গতকাল রাত্রে ফোন এসেছিল জার্মানি থেকে। যে ফোন করেছে নিজের নাম বলেছে 'জানুয়ারি', আর জালিলকে সাবধান করে দিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি হয় পালাতে। এন আই এ খবরগুলো দিয়েছে। ওরা সন্দেহ করছে, আগামীকাল লোকটা পালাবে। ছোটো-বড়ো সব এয়ারপোর্টকেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। রেল স্টেশনে পুলিস বসানো হয়েছে – ট্রেনে করে অন্য জায়গায় গিয়েও তো অন্য এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ধরতে পারে। বাকি রইল একটাই পথ – সমুদ্র দিয়ে। এন আই এ ড্রোন দিয়ে নজর রেখেছে ; কখন, কোথা দিয়ে জালিল বেরোবে, জানিয়ে দেবে। বিজয়ের দায়িত্ব জালিলকে আটকানো এবং জীবিত অবস্থায় ধরা। নইলে টাকার সোর্স বার করা যাবে না। অবশ্য ইতিমধ্যেই ব্রিগেডিয়ার 'জানুয়ারি'-র ফোন নম্বর ইত্যাদি বি এন ডি (জার্মান ইন্টেলিজেন্স)-কে পাঠিয়ে দিয়েছেন। খবর এখনো আসেনি।

বিজয় মুম্বাইয়ের হোটেলে পৌঁছেই নেভি-র সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছিল। ও 'মারকোস' (নেভি কম্যান্ডো) -এর লোক, সাহায্য চেয়ে তিনজন কম্যান্ডোর টিম পেয়েছে। অবশ্য ব্রিগেডিয়ারও বলে দিয়েছিলেন, কাজটা সহজ হয়েছে। আর কোস্ট গার্ডকে বলে ঘন্টায় ঘন্টায় কোস্টাল রাডার থেকে রিপোর্ট নেবার বন্দোবস্ত করা গেছে। প্রধানত পাকিস্তান থেকে বা গালফ থেকে কোনো ছোটো জাহাজ বা ইয়াট আসছে কিনা সেটা জেনে রাখা দরকার। জালিলের মতো লোক যে ট্রলার বা ঐজাতীয় কিছুর ওপর ভরসা করবে না, সেটা বলাই বাহুল্য।

* * * *

বিজয় সারাদিন ঘড়ি দেখেছে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফোন এল।

-টার্গেট মুভিং। নর্থ।

বিজয় নিজের টীমকে সকালেই আনিয়ে রেখেছিল। ওরা এয়ারপোর্ট সিকিউরিটিতে বসে আছে। এখানে-ওখানে বলে বিজয় একটা বড় ল্যান্ড ক্রুইজার যোগাড় করেছে। একটাই গাড়িতে ওরা চারজন যাবে।

এয়ারপোর্ট থেকে নিজের টিমকে তুলল বিজয়। একজন কম্যান্ডোর হাতে স্টিয়ারিং দিয়ে নিজে পাশে বসল। জালিলের গাড়ি থানের দিকে এগোচ্ছে। বিজয়ের সন্দেহ কোনো একটা নির্জন বীচে নৌকোয় উঠবে জালিল। কোস্টাল রাডারকে ফোন করল। রাডার জানাল অন্তত ছ-টা ছোটো জাহাজ মুম্বাইয়ের দিকে আসছে। তবে তার মধ্যে একটা একটু উত্তর দিকে, সেটার উদ্দেশ্য মনে হচ্ছে গুজরাটের কোন জায়গা। ট্র্যাক করা হচ্ছে। কোস্ট গার্ডকে বলে দেওয়া হয়েছে, ইয়াটের ওপর নজর রাখবে।

বিজয় ম্যাপ দেখল। বালসারের কিছু আগে সুরওয়াড়া বলে একটা বীচ আছে। বীচ ইসাবে খুবই খারাপ, কাদা আর জলা বেশির ভাগ। টুরিস্ট খুব কম আসে। এটা সবে অক্টোবর মাস, এখন নির্জনই থাকবে। অবশ্য এর আগেও জায়গা আছে, তবে মহারাষ্ট্রর মধ্যে পড়ে বলে

বসতি বেশি। গুজরাটের এদিকটা বসতি কম। ডিসিশন তো একটা নিতেই হবে। তবে এখনই নয়। বিজয় ঠিক করল জালিলের গাড়ি যদি মহারাষ্ট্র বর্ডার পেরোয়, তখন দেখা যাবে।

ড্রোন সার্ভেইলান্স জারি আছে। ড্রোনের ছবিগুলো লাইভ রিলে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে তিনটে গাড়ি, পরপর। বিজয় রিকোয়েস্ট করল সাইড থেকে একটা ভিউ নিতে। কথামতো ড্রোন পাশ থেকে একটা ভিউ দিল। মধ্যের গাড়িতে মনে হচ্ছে সামনে দুটো লোক আর পিছনে একটা। জালিলের গাড়ি এটাই হবে। ড্রোন আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। ওদের গাড়িগুলো থানে পেরিয়ে ভাপির দিকে ছুটছে। ভাপির পরে কিলা-পারডি, তারপর পার নদীর ওপর ব্রিজ। নদীর এপারে বসতি ভালোই আছে, রেসর্ট ইত্যাদিও আছে। আর ব্রিজ যদি পেরোয় তাহলে আর সুরওয়াড়া ছাড়া উপায় নেই।

আর একটা জিনিস জানা দরকার। অপারেশন প্ল্যান করতে সুবিধা হবে। বিজয় আবার কোস্ট গার্ডকে ফোন করল। সুরওয়াড়ার কাছে হাই-টাইড, মানে জোয়ার, আসবে রাত ন'টা নাগাদ। জালিল যদি ওখান থেকেই ওঠে, তাহলে হাই-টাইডের জন অপেক্ষা করতে হবে। ইয়াট তো আর বীচে আসতে পারবে না, ছোটো মোটর বোট আসতে পারবে বীচ থেকে পঞ্চাশ-ষাট ফুটের মধ্যে হাই-টাইডের সময়। সেটা সাড়ে নটার পরই হবে। ঘড়ি দেখল। সাতটা বেজেছে। এন এইচ ৪৮ দিয়ে গাড়ি ছুটছে।

আবারও হিসাব। জালিল নিশ্চয়ই অনেক আগে থেকে বীচে গিয়ে বসে থাকবে না। সেটা ডেঞ্জারাস। তার মানে সাড়ে নটার আগে নয়। খাবারের জন্য দাঁড়াতে পারে, সেটা আগেই করতে হবে। অবশ্য বালসার শহরেও খাওয়া যায়, তবে তিনটে পরপর এস ইউ ভি দেখলে পুলিস সন্দেহ করতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে – আগেই কোথাও দাঁড়াবে।

আলো পড়ে আসছে। জানলা দিয়ে বাইরে দেখল বিজয়। ড্রোন আর মিনিট পনেরো। রাতে ড্রোন দিয়ে কাজ হবে না।এগুলো সাধারণ পুলিসের ড্রোন। নাইট ভিশন নেই। তার আগে যদি ওরা পার ব্রিজের কাছাকাছি পৌঁছয় তবেই ভালো। বিজয়ের ভাগ্য ভালো, কিলা-পারডি শহরে যেখানে ৪৮ আর ৮৪৮বি মিলেছে সেখান থেকে ঘুরে ৮৪৮বি ধরে জালিলের গাড়ি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল হোটেল বিরামের সামনে।

জালিলকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িগুলো চলে গেল পেট্রল নিতে। দূর থেকে দেখেই বিজয়ের গাড়ি ঘুরে আবার এন এইচ ৪৮ ধরল। ওরা কোথায় যাচ্ছে সেটা এবার পরিষ্কার। এখন ওদের আগেই বীচে পৌঁছে পজিশন নিতে হবে।

গাড়ি চলতে চলতেই ইকুইপমেন্ট চেক। মারকোসরা সাধারণত ট্যাভর কারবিনে ব্যাবহার করে, কিন্তু আজ দুজন নিয়ে এসেছে এইচ কে এম এস জি ৯০, আর ক্রসবো। বিজয়ের নিজের জন্য ট্যাভর আর হাই-পাওয়ার ব্রাউনিং পিস্তল। আর টিমের চতুর্থ জনের কাছে কে বি পি- এ জি এস গ্রেনেড লঞ্চার। কম্যান্ডো নাইফ আর বেরেটা পিস্তল তো স্ট্যান্ডার্ড। সবারই গায়ে নাইট ক্যামুফ্লাজ স্যুট। কালো আর গাঢ় সবুজের ছোপ। সঙ্গে আনা ক্যামুফ্লাজ পেইন্টের টিন খুলে কালো জুতোর কালির মতো পেইন্ট লাগাল সবাই হাতে, মুখে, আর মাথায়। মাথায় কালো কাপড়।

একটা কাজ করেছে বিজয়। শহরের পুলিস চেক পোস্টে বলে এসেছে ওই তিনটে গাড়ি শহর থেকে বেরলেই খবর দেবে, তবে ওদের গাড়ি আটকাবে না। ওরা মরিয়া। আটকালে খামখা গুলি চালাবে, আর পুলিস কন্সটেবলদের প্রাণ যাবে। ওরা তো আর সেই হিসাবে ট্রেইন্ড নয়।

* * * *

হাইওয়ে থেকে নেমে যে রাস্তাটা বীচের দিকে গেছে, সেটা অন্তত এক কিলোমিটার। বীচের কাছে এল যখন, ঘড়িতে সওয়া নটা। হিসেব মতো, খাওয়া সেরে জালিলের এখানে আসতে আসতে অন্তত নটা চল্লিশ হবে। সমুদ্রের জল বেশ কিছুটা ওপরে এসেছে। কোস্টাল রাডার খবর দিয়েছে ইয়াট এদিকেই আসছে, এখন বীচ থেকে দুই নটিক্যাল মাইলের মতো। বীচের কাছাকাছি আসতে মিনিট দশেক।

বিজয়ের গাড়ির রঙ কালো। আর এখন অন্ধকার ভালোই। সমুদ্রের ফেনার সাদাটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে, আর তাতেই বীচের অন্ধকার আরো গাঢ় মনে হচ্ছে। বিজয়ের ড্রাইভার সাবধানের মার নেই ভেবে বীচের ওপর দিয়ে প্রায় দুশো মিটার এগিয়ে গেল। বিজয়রা ফিরে এল যেখানে রাস্তা শেষ হয়েছে সেখানে। গাড়িটা আর দেখাই যাচ্ছে না।

পজিশন নেওয়া হল। ধরে নেওয়া যেতে পারে ওরা কোনো রকম পুলিস অ্যাকশন আশংকা করছে না। তবুও যদি করে ভেবে একজন স্নাইপার আর একজন গ্রেনেড লঞ্চার নিয়ে রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে থাকবে, রাস্তা থেকে অন্তত চল্লিশ ফুট দূরে আর রুদ্র আর

চতুর্থজন বীচের দিকে তিরিশ মিটার মত এগিয়ে, দুজনে দু'পাশে – দুজনে মধ্যে দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ ফুট। বিজয়ের হাতে একটা ক্রসবো, আর ওর সাথীর হাতে ট্যাভর কারবাইন।

এদিকে কোনো কভার – মানে যার পিছনে লুকোনো যায়, গাছ বা বড় পাথর – নেই। মাটির ওপর শুয়ে নিজেদের শরীরের ওপর কাদা দিয়ে ঢাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। অবশ্য এতে ওদের কোনো অসুবিধা নেই। টাস্ক, টাস্ক – টাস্ক এক্সিকিউট করতে গেলে যা করতে হবে, তা করতে হবে। মাথায় এখন আর কিছু নেই।

রাস্তার ধারে আর বীচের কাছে এখন শুধু চারটে কাদার ঢিবি।

* * * *

অন্ধকারেই ঘড়ি দেখল বিজয়। সাড়ে নটা। সমুদ্রর দিকে তাকাল একবার। বীচ থেকে অন্তত পাঁচশো মিটার দূরে একটা ইয়াট এসেছে। মোটর বোট নামানো হয়েছে, তবে এখনো বীচের দিকে এগোয়নি সেটা।

রাস্তায় অনেকগুলো হেড লাইটের আলো পড়ল। তিনটে গাড়ি পরপর এসে দাঁড়াল। প্রথম গাড়ি থেকে তিনজন নামল। গাড়ির হেডলাইট অফ করে গাড়ি ঘোরানো হল। দ্বিতীয় গাড়ি থেকে নামল দুজন। একজন সাদা সাফারি স্যুট পরা, আর অন্যজন কালো ইউনিফর্ম। এরা বীচের দিকে এগিয়ে এল। বাকি তিনজন, তারাও কালো পোষাকে, এই দুজনের পিছনে। এটুকু হতে লাগল মিনিট দুয়েক।

তৃতীয় গাড়িটা এখনও রাস্তা থেকে নামেনি, আর তার থেকে কেউ নামেওনি। বিজয় নিজের ওয়াকি-টকি একবার অন-অফ করল, তিন সেকেন্ড দাঁড়িয়ে আবার দুবার অন-অফ করল।

* * * * *

প্রথমবার অন-অফ করার পাঁচ সেকেন্ড পরে একটা গ্রেনেড ফায়ার হল, তৃতীয় গাড়ির দিকে। কেউ কিছু বোঝার আগেই একটা বিরাট বিস্ফোরণ। পেট্রল ট্যাংকে তাক করে মারা হয়েছে।

আরো একটা বিস্ফোরণ। এটা দ্বিতীয় গাড়িটায়।

সামনের পাঁচজন কিছু করবার আগেই বিজয়ের সাথী নিজের কারবাইন থেকে রাপিড ফায়ার শুরু করেছে। তিনজনের মধ্যে দুজন পড়ে গেল। তৃতীয় জন কিছু বুঝতে না-পেরেই চারদিকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে।

একটা শট। একটা তীব্র চিৎকার করে তৃতীয় জন ধরাশায়ী।

বিজয় অতক্ষণ অপেক্ষা করেনি। প্রথম বিস্ফোরণ হবার সঙ্গেসঙ্গে ক্রসবো শ্যুট করেছে। ওর একটাই টার্গেট – সাদা সাফারি পরা লোকটা। বিজয়ের ক্রসবোর বোল্ট (তীর) লোকটার থাইতে লেগেছে। স্টিলের ভারী বোল্ট। লোকটা পড়ে গেল, অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে কালো রক্ত গড়াচ্ছে।

বিজয় দেখল, লোকটা পকেট থেকে পিস্তল বার করার চেষ্টা করছে। বিজয় কিছু করল না। যেভাবে রক্ত গড়াচ্ছে, আধ মিনিটের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে যাবে।

জালিলের সঙ্গের চতুর্থ লোকটা ইতিমধ্যে বীচ দিয়ে দৌড়েছে তৃতীয় গাড়িটার দিকে। গাড়িটা স্টার্ট নিয়ে এদিকে আসছে।

চতুর্থ লোকটা গাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে দরজা দিয়ে উঠতে যাবে, মাথাটা চৌচির হয়ে ফাটল। বিজয়ের স্নাইপার নিজের রাইফেলের সদ্ব্যবহার করেছে।

ড্রাইভার বেগতিক দেখে স্পিডের মাথায়ই গাড়ি আবার ঘুরিয়ে বীচের ওপর দিয়েই গাড়ি চালাল। কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না। গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ি পুরো ঘুরবার আগেই স্নাইপার ড্রাইভারকে তাক করে ফায়ার করেছে। ওর রাইফেলে নাইট-স্কোপ লাগান, কোনো অসুবিধাই হয়নি।

* * * *

উঠে দাঁড়াল বিজয়। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে তিন-চার মিনিটও লাগেনি। ওর টিম মেম্বাররাও একে একে উঠে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে এল সবাই। প্রথম কাজ নিজের টিমকে দেখা। সবাই ঠিকই আছে। শুধু বিজয়ের উল্টোদিকে যে ছিল, তার হাতের ওপর দিকটায় গুলি লেগেছে ; তবে পাশ কেটেই বেরিয়ে গেছে, ভিতরে ঢোকেনি। হাতে একটা ক্ষত হয়েছে মাত্র। রক্ত পড়ছে। অন্যজন তাড়াতাড়ি একটা ফিল্ড-প্যাক লাগাল। ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। একটা স্লিং বানিয়ে হাতটা ঝুলিয়ে দিল।

এবার জালিলের পালা। বিজয় যা আশা করেছিল তা-ই। অজ্ঞান হয়ে গেছে। রক্ত একটু বেশিই বেরিয়েছে। ওকে একটা প্লাজমা প্যাক দেওয়া হল, আর হাতে হাতকড়া। পা বেঁধে লাভ নেই। দাঁড়াতেই তো পারবে না, যদি জ্ঞান ফিরেও আসে। জালিলের পকেট সার্চ করে বেরোল দুটো

পিস্তল। মুশকিল হল নিয়ে যাওয়া। ওদের তিনটে গাড়িই তো নষ্ট হয়ে গেছে।
বিজয় কোস্ট গার্ডকে ফোন করল। বেস থেকে চপার চাইল একটা। আধ ঘন্টা লাগবে। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। বিজয়ের কাজ জালিলকে সেফ জায়গায় নিয়ে ফেলা। তারপর ব্রিগেডিয়ার যা করেন।

এখন
সপ্তম দিন
দিল্লি
রাত ৮:০০ – ১১:০০

সুজন সিং পার্কে এজেন্সির সেফ হাউসে। রাত আটটায় ব্রিগেডিয়ার টিমকে ডেকেছেন। অপারেশনের পুরোটা কেউ-ই জানে না, তবে বেশিরভাগটা জানে রুদ্র। আজকের ব্রিফিং-এ সেজন্য ব্রিগেডিয়ারেরই মুখ্য ভূমিকা। আর একটা রহস্যও আছে যেটা রুদ্র আর ব্রিগেডিয়ার ছাড়া কেউ জানে না।
কেয়ারটেকার সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। চা, কফি, ড্রিঙ্কস, স্ন্যাকস্ সবই রেখে গেছে। একবার মিটিং শুরু হলে আর কেউ ঘরে আসতে পারবে না। এখন পর্য্যন্ত রুদ্র-ই শুধু এসেছে। সুস্মিতাকে বিজয় নিয়ে আসবে। সুস্মিতার এখনো পায়ে, হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা, বডিতেও। আসতে বারণ করেছিলেন ব্রিগেডিয়ার। শোনেনি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত যা হল তাতে সুস্মিতারও একটা ভূমিকা রয়ে গেল।
সুস্মিতা আর বিজয় ঘরে ঢুকল। সুস্মিতা ক্রাচে ভর দিয়ে। ওকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে, যদিও আর অ্যান্ড আর হাসপাতালে গতকাল যেরকম দেখে এসেছিল তার থেকে ভালো। সুস্মিতা একটা সোফাতে বসলে পর রুদ্র একটা স্টুল এনে সুস্মিতার পা-টা তার ওপর তুলে দিল। সুস্মিতা হাসল একটু। তারপর একটা শাল নিয়ে এসে সেটা সুস্মিতার কোলের ওপর রাখল। বিজয়ের দিকে দেখল একবার। বিজয় ড্রিংক বানাচ্ছে। চট করে শালের নীচে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট ০.৩২ ক্যালিবারের পিস্তল গুঁজে দিল সুস্মিতার হাতে। সুস্মিতা অবাক হয়ে রুদ্রর দিকে চাইল একবার, কিছু বলল না। রুদ্রর হাতে একটু চাপ দিল শুধু।
রঘু ঘরে ঢুকেছে। রুদ্রর দিকে তাকিয়ে, 'হাই বস্', বলে সাইডবোর্ডের দিকে গেল। গিয়ে বিজয়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।
ব্রিগেডিয়ার এলেন।
'হ্যালো পিপল্,' বলে একটা সোফায় গিয়ে বসলেন। 'বিজয়, ইফ ইউ ডোন'ট মাইন্ড...'

'ইয়েস, অফ কোর্স স্যার, অ্যান্ড ফর ইউ, সুস্মিতা ? কফি?'
সুস্মিতা মাথা নাড়ল।
রঘু নিজের ড্রিংক নিয়ে বসেছে অন্য একটা সোফাতে। সুস্মিতার উলটো দিকে, ব্রিগেডিয়ারের দিকে একটু তেরছা হয়ে। রুদ্র এসে সুস্মিতার পাশের চেয়ার দখল করল। বিজয় ব্রিগেডিয়ারের অন্য পাশে।
ব্রিগেডিয়ার নিজের গেলাস তুললেন, 'হিয়ার'স টু দ্য টিম। থ্যাংক ইউ অল। তবে ব্যাপারটা এখনো শেষ হয়নি। আমরা নদীর জলে আরো রেডিঅ্যাক্টিভ ওয়েস্ট ফেলা বন্ধ করতে পেরেছি, যদিও সবকটা পার্প (পারপেট্রেটর, অর্থাৎ কুকর্মকারী) মারা গেছে। অন্তত একটা বেঁচে থাকলে আমাদের একটু সুবিধা হত।'
গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আতংকবাদীদের সাপ্লায়ার মারা গেছে, যদিও যথেষ্ট ইনফরমেশন আমাদের হাতে এসেছে। এছাড়া দেশের ভিতরে যে এই সব কাজ করত, সে-ও আমাদের কব্জায়।'
রঘু যেন একটু চমকে উঠল মনে হল। তবে রুদ্রর চোখ

এড়ায়নি।
ব্রিগেডিয়ার লক্ষ্য করেছেন কিনা বোঝা গেলো না। উনি বলেই চলেছেন, 'ওরা ফাইনান্সিং কোথা থেকে পাচ্ছিল সেটাও আমরা জানতে পেরেছি – একটু আগেই বার্লিন থেকে খবর পেয়েছি – কে ফাইনান্স করছিল তার নামধাম সব বেরিয়ে গেছে, ধরা বাকি; তবে সেটাও আজ রাত্রেই হবে আশা করছি।'
গেলাসে আর একটা চুমুক দিলেন। খালি গেলাস বাড়িয়ে দিলেন বিজয়ের দিকে। বিজয় উঠে গেল সাইডবোর্ডের দিকে। বিজয় গেলাস নিয়ে এলে সেটা হাতে নিয়ে বললেন, 'থাংকস, বিজয়। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, যেটা বাকি রয়ে গেছে সেটা শেষ করে নিই। লোকাল কো-অর্ডিনেটর কে, আমরা জানি, আর তাকে ধরবার জন্যই আজকের মিটিং। তবে এখানে রুদ্র, তুমি আর তোমার টিম ছাড়া আর একজনকে ক্রেডিট দিতে হবে। লেডি এ্যান্ড জেন্টলমেন, লেট মি ইন্ট্রোডিউস ইউ টু অ্যাসিস্টেন্ট কম্যান্ড্যান্ট রঘু যোশী, দ্য রিয়াল রঘু যোশী।' হাত বাড়িয়ে বেল টিপলেন। ঘরে ঢুকল মাঝারি হাইটের একজন। পেটানো চেহারা। কম্যান্ডো যে, সেটা দাঁড়াবার ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে।
সবাই অবাক হয়ে তাকাতেই, সোফায় বসা 'রঘু' উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতে পিস্তল।
-নোবডি মুভ। কেউ নড়বে না। ব্রিগেডিয়ার, আজ আপনারও খেল খতম। আমি তো ওপরে যাবই, আপনাকেও নিয়ে যাব।
যেন শুনতেই পাননি, শান্তভাবে নিজের গেলাসে আর-এক চুমুক দিলেন ব্রিগেডিয়ার। সুস্মিতা ভাবল, নার্ভ বটে ব্রিগেডিয়ারের। চুমুক দেওয়া শেষ হলে বললেন, 'এর সঙ্গে তোমাদের আলাপ হয়েছে ছদ্মনামে। এর আসল নাম মাল্কিয়ত সিং, খালিস্তানি একটা গোষ্ঠির মেম্বার। আগে থেকেই আমাদের সন্দেহ ছিল, কিন্তু কতটা ইনভলভড্, সেটা আমরা জানতাম না। ওকে এক্সপোজ করার জন্যই এত কাণ্ড। ওর বিরুদ্ধে এত প্রমাণ আছে যে ...' কথাটা শেষ করতে দিল না মাল্কিয়ত, 'আপনার প্রমাণ আপনিই দেখবেন – ওপরে গিয়ে।'
ট্রিগারে আঙুল পড়েছে কি পড়েনি, সুস্মিতা ফায়ার করল, শালের ভিতর দিয়ে। গুলিটা লাগল মাল্কিয়তের গলায়। একটা অস্ফুট চিৎকার বেরল গলা দিয়ে, কিন্তু পিস্তলের হাত তখনো নামেনি। ফায়ার করল, কিন্তু গুলিটা লাগল জমিতে, আর ততক্ষণে আসল রঘু যোশীর হাতের পিস্তল মাল্কিয়তের কপালে একটা লাল ফুল এঁকে দিয়েছে। রুদ্রর হাতেও পিস্তল উঠে এসেছে, কিন্তু ফায়ার করতে হল না।
রঘু যোশী একটু হেসে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল ,'সরি ফর

দ্যাট, বস্, বাট দ্য অনার ওয়াজ মাইন। হি টুক মাই নেম।' রুদ্রও একটু হাসল প্রত্যুত্তরে।
ব্রিগেডিয়ার নিজের জায়গা থেকে একটুও নড়েননি। গেলাসের বাকি হুইস্কি শেষ করে গেলাস আবার বাড়িয়ে দিলেন বিজয়ের দিকে। বিজয় একবার বসের দিকে তাকাল, তারপর এগিয়ে গেল গেলাসটা নিতে। রুদ্র বেল বাজালে কেয়ারটেকার এসে একবার বডিটা দেখল, তাকাল রুদ্রর দিকে।
'ডিসপোজাল,' ঠান্ডা গলায় রুদ্র বলল। মাথা ঝাঁকিয়ে বডিটা টানতে টানতে নিয়ে গেল কেয়ারটেকার। এজেন্সির স্পেশ্যাল ইউনিট আছে। তারা এসে বডি নিয়ে যাবে। তিন ঘন্টার মধ্যে মাল্কিয়ত তিন কিলো ছাইতে পরিণত হবে। সেটা কোনো ফুলগাছের বেডে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। সেটা রাস্তার ধারের ফুলগাছের বেডও হতে পারে।
সবাই আবার বসলে ব্রিগেডিয়ার বললেন, 'আসলে এই গল্পটা অনেক পুরনো। ১৯৭৬-এ পাকিস্তানিরা নন্দাদেবী আর নন্দাকোটে আমাদের যে যন্ত্র ছিল চীনেদের ট্রান্সমিশন ট্যাপ করার জন্য, তার প্লুটোনিয়াম চুরি করতে এসেছিল। তবে যন্ত্রগুলো আমরাই খুঁজে পাইনি, ওরা কোথা থেকে পারবে। আর ওদের মহড়া নিয়েছিল একজন ইয়ং অফিসার, মেডেলও পেয়েছিল।'
'কে স্যার?' রঘু জিজ্ঞাসা করল।
মুচকি হাসলেন ব্রিগেডিয়ার, 'ক্যাপ্টেন পরমজ্যোৎ সিং।

যাক, সে পুরনো কথা। তবে চিন্তার ব্যাপার এই যে, যারা এই জিনিস একবার করেছে, তারা আবারও করতে পারে। পাহাড়ে আমাদের সার্ভেইলান্স বাড়াতে হবে। তবে সেটা আমাদের কর্তব্য নয়। থ্যাংক গড।' রঘুর দিকে তাকিয়ে তারপর সবাইকে বললেন, 'মাল্কিয়ত একটা ভুল করেছিল। রঘু একটা এন এস জি-র অপারেশনে গুরুতর ঘায়েল হয়ে ছ-মাসের ওপর হাসপাতালে ছিল। নিজের নামও মনে করতে পারেনি কিছুদিন। আর সেই সময় রঘুর ট্রান্সফার – আমাদের ইউনিটে পেন্ডিং ছিল। সেই সুযোগ নিয়ে মাল্কিয়ত আমাদের ইউনিটে ইনফিল্ট্রেট করেছিল। জানত যে আমরা কেউ রঘুকে চিনি না। আমরা সন্দেহ করেছিলাম প্রথম থেকেই, তবে রঘুর কাগজপত্র এদিক-ওদিক হয়ে যাবার ফলে আসল রঘুকেও ট্রেস করতে আমাদেরও সময় লেগেছে। ব্যুরোক্রেসি। আমাদের ভাগ্য ভালো যে মাস তিনেকের মধ্যেই রঘুর স্মরণশক্তি আবার ফিরে আসে। তখন আমরা পুরো ব্যাপারটা জানতে পারি।'

'বেগ পার্ডন স্যার। কিন্তু যখন জানতে পারলেন তখনি কেন অ্যাকশন নিলেন না?', বিজয় জানতে চাইল।

'আমি আন্দাজ করেছিলাম যে এই ইনফিল্ট্রেশনটা করা হয়েছে কোনো একটা নিশ্চিত প্রজেক্টের উদ্দেশ্যে। সেটা কী জানতে পারার জন্যই এত কান্ড। তার কারণ, মাল্কিয়তও নিশ্চয়ই জানত যে খেলাটা বেশিদিন চলবে না। তার মানে, মাল্কিয়ত যা করেছে বা করতে পারত, সেটা শর্ট টার্ম। আসল রঘু জয়েন করার পর থেকেই মাল্কিয়তের পেছু নিয়েছে। সব সাক্ষ্য প্রমাণ যা পেয়েছে, ইনক্লুডিং ওর বাড়িতে ঢোকা, ওর আলমারি হাতড়ে কোথা থেকে কবে টাকা পেয়েছে তার হিসাবের ফটো নেওয়া, আর শেষ পর্যন্ত, মাল্কিয়তের সঙ্গে আই টি বি পি কম্যান্ডো সেজে যাওয়া, সবই ও করেছে।' একটু থেমে বললেন, 'আর মোক্ষম প্রমাণ, মাল্কিয়ত জেনে-বুঝেই ওর দুজন সাথীকে খতম করেছে, আর তার সাক্ষী রঘু।'

'ইট ওয়াজ মার্ডার। আমি কম্যান্ডো সেজে ওর সঙ্গেই ছিলাম। আমিও ওকে সেখানেই শেষ করতে পারতাম, আমার প্ল্যানও তা-ই ছিল – ফায়ারফাইটের সময় ওকে সাবাড় করব। কিন্তু সুযোগ পেলাম না,' রঘু জুড়ে দিল।

'লাস্ট কোয়েশ্চেন, স্যার। সান্টা আমাদের বলেছিল যে, রুদ্রকে যারা কিডন্যাপ করেছিল তারা জিহাদি নয়। তাহলে এর মধ্যে পাকিস্তান, চায়না, খালিস্তানি, এতসব কোথা থেকে এল?'

-'হাঙ্গেরি থেকে খবর গিয়েছিল চায়নায়। চায়না পেমেন্ট করেছে নিউক্লিয়ার ওয়েস্টের, চাইনিজ কোম্পানির থ্রু দিয়ে। সেটা আমরা জানি। পাকিস্তান শুধু একটা কন্ডুইট। আর খালিস্তানিদের – বিশেষত মাল্কিয়তকে ঢোকানো শুধুমাত্র জল ঘোলা করার জন্য। যদি প্ল্যান লিক হয়,বা আমরা মাল্কিয়তকে অ্যারেস্ট করে কোনোরকম পাব্লিক ট্রায়াল করি, সেক্ষেত্রে বিদেশের শিখদের খেপিয়ে তোলা যাবে।'

বিজয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'ব্লাডি হেল্'।

বাকি হুইস্কি শেষ করলেন ব্রিগেডিয়ার। সুস্মিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আই মাস্ট সে, ইয়ং লেডি, যে তুমি কোনো কাজ আধাআধি করো না। সেদিন জগতার সিং ওরফে সেলিম, আর আজ মাল্কিয়াত।'

সুস্মিতা হাসল ,'নেভার কুড সি দ্য পয়েন্ট, স্যার।'

ব্রিগেডিয়ার উঠে পড়লেন। 'গুড নাইট, অল্।'

উনি যখন দরজার কাছে, সুস্মিতা বলল, 'স্মল পয়েন্ট, স্যার। মাল্কিয়ত যখন আপনাকে থ্রেট করছিল, আপনি অত ঠান্ডা ছিলেন কী করে?

ব্রিগেডিয়ার হেসে নিজের জামা একটু ফাঁক করে দেখালেন, তলায় নাইলন আর টাইটানিয়ামের বুলেট-প্রুফ ভেস্ট।

'পরমজ্যোৎ সিং-কে অত কাঁচা ভেবেছ?' মুচকি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

উনিশ শতকে কলকাতার মেয়েরা

সুস্নাত দাশ

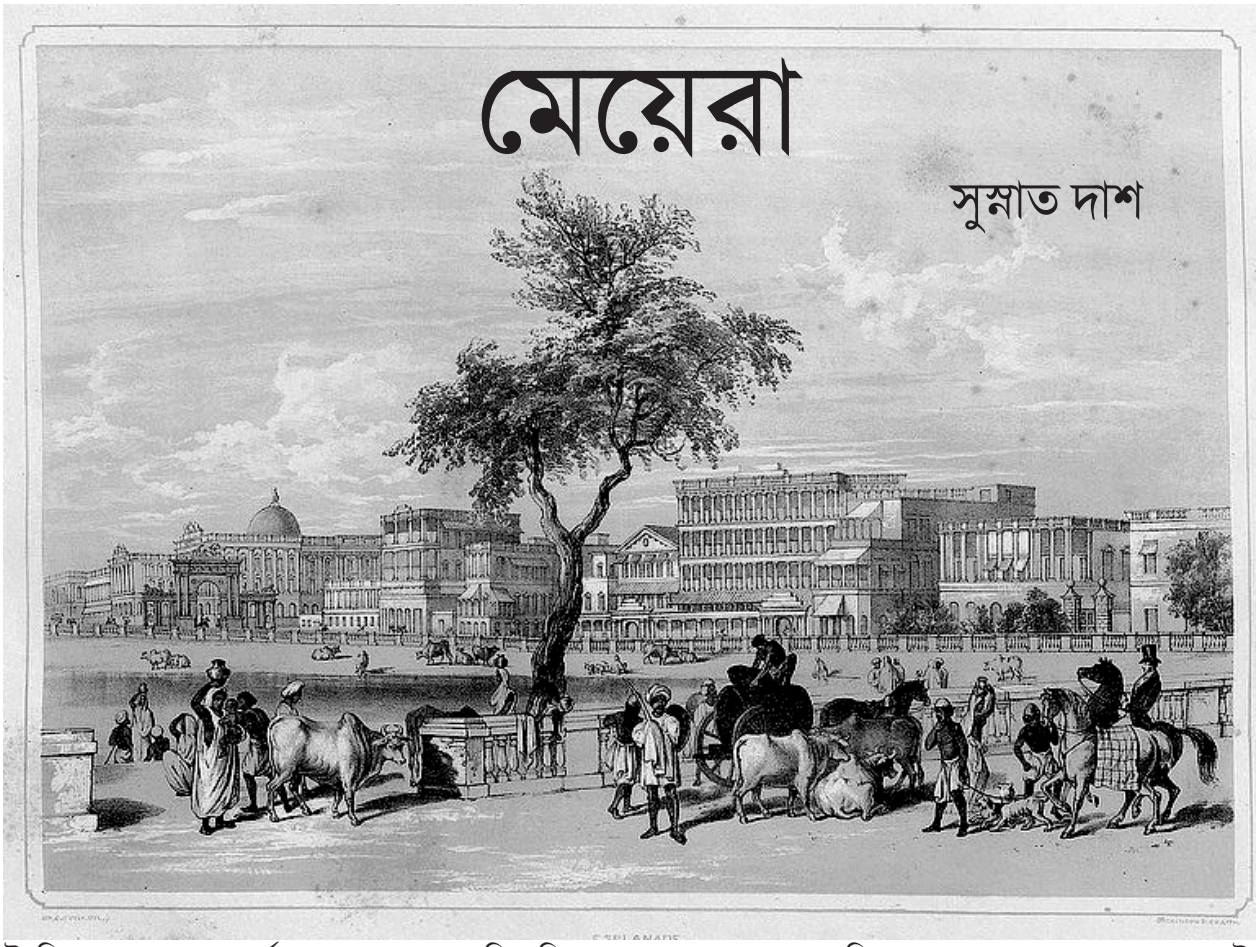

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে সাধারণত ভদ্র বাঙালি পরিবারের মেয়েরা কোনো অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতেন না। অন্দরের অবরোধের জীবনের সঙ্গে সদরের বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যোজন ব্যাপী ব্যবধান ঐতিহ্যাশ্রিত সম্পন্ন বা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের বৈশিষ্ট্য। যদিও সহস্র গৃহবধূ সূর্যোদয়ের আগে থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত অবিশ্রান্ত কর্মব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু তা শুধুই গৃহস্থালির কাজ। অর্থ আয় তো করতেনই না, কোনো অর্থনৈতিক ভূমিকাও পালন করতেন না। কিন্তু সামাজিক ইতিহাসের আধুনিক ধারণা অনুযায়ী গৃহবধূর কর্ম অনুৎপাদক নয়। তবে গৃহবধূর শ্রমকে আর্থিক মানদণ্ডে বিচার করার দাবি একেবারে সাম্প্রতিক। সুতরাং, প্রায় দুশো বছর আগে এই ভাবনার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। অতএব গৃহস্থালির কর্ম উপার্জনহীন বলে পরিগণিত হত। সাধারণত সেযুগেও নিম্ন শ্রেণির মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করতেন। শ্রমজীবীদের মধ্যে মহিলারা গৃহপালিত জন্তুদের খাইয়ে, গোরু দুইয়ে, ধান ভেনে, মাছ বিক্রি করে, ফসল রোপণ করে ও কেটে, মৃৎ শিল্পে, ঠোঙা তৈরি করে অনেকেই অর্থনেতিক কার্যে পুরুষদের সহায়তা করতেন। (১) অর্থাৎ নগদ অর্থ আয় করুন বা না-ই করুন, নিম্নশ্রেণির মহিলারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ভূমিকা

পালন করতেন। কিন্তু সম্ভ্রান্ত ঘরের কোনো গৃহবধূ তখন রোজগার করার কথা চিন্তাও করতে পারতেন না, এবং তাঁদের কোনো জীবিকাও ছিল না। তবে অবরোধ ও সম্ভ্রম রক্ষার সূত্রে মেয়েদের এই উপার্জনহীনতা শুধু বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভদ্রঘরের নিম্নবিত্ত মহিলারা অতি সীমিত পরিসরেও রোজগারের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকতেন। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত ছিল চরকায় সুতো ও পৈতে কাটা। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত জানাচ্ছেন, বহু গৃহিণী চরকায় সূতো কেটে তার দ্বারা উপার্জন করতেন। মহেন্দ্রনাথ দত্তও প্রাচীন কলকাতার বর্ণনা প্রসঙ্গে একই মত পোষণ করেছেন।(২) স্বামী দেশত্যাগী হলে বিদ্যাসাগরের পিতামহী দুর্গাদেবীও এই ভাবেই যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করেছেন। এছাড়া, কোনো কোনো মহিলা সুদে টাকা ধার দিয়েও কিছু উপার্জন করতেন। কোনো কোনো মহিলা কবিরাজি, বিশেষত বাল্য রোগের চিকিৎসায় এবং ধাত্রীবিদ্যায় যথেষ্ট খ্যাতনামা ছিলেন। ভবানীচরণ দত্তের চতুর্থ পুত্রবধূ কবিরাজি চিকিৎসায় অত্যন্ত সুনামের অধিকারী ছিলেন এবং নাবালক পুত্রকন্যা নিয়ে বিধবা হলে তিনি এর দ্বারা শুধু সংসার যাত্রাই নির্বাহ করেননি , দুর্গোৎসব ও অন্যান্য পূজা, তীর্থ দর্শন, অতিথি সেবা সবই নির্বাহ করেন। তখনও যেহেতু মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়নি, ফলে কয়েকজন ইংরেজ ডাক্তার ও বাঙালি কবিরাজই রোগ-ব্যাধিতে একমাত্র ভরসা ছিলেন। এইরকম অবস্থায় অনেক গৃহিণীই ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ পটু ছিলেন ও দুরূহ স্থলেও সহজে সফল হতেন। জনৈক 'রাজুর মা' নাপিতানি অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণতার জন্য যথেষ্ট উপার্জনশীল ছিলেন এবং এই রোজগার থেকেই তিনি ছেলেকে মেডিকেল কলেজে পড়াতে পর্যন্ত সক্ষম হন। কলকাতার সেকালের সমাজে আরেক ধরনের মহিলার কথা জানা যায় যাঁরা ভদ্র গৃহস্থ বাড়ির ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে অন্তঃপুরে পরামর্শ দিতেন , রন্ধনশালা রক্ষা করতেন ও ভাঁড়ার রক্ষার দায়িত্বও পালন করতেন। এঁরা অনেকে কুলীন মহিলা, ব্যক্তি জীবনে এঁরা সধবা ও অনেক সময়েই স্বামী সম্পর্ক রহিত হতেন। অনুষ্ঠান শেষে এঁদের প্রাপ্য ছিল শাড়ি, বড়ো সিধা এবং প্রণামী । এই আয়ে কেউ কেউ সচ্ছলভাবে জীবন নির্বাহ করতেন, এমনকি জগদ্ধাত্রী ও দুর্গা পুজাও করতেন। গ্রামেও এই ধরনের মহিলার দেখা মিলত, যাঁরা শুধু নিজ গ্রামে নন, পরিচিতির সূত্রে ভিন্ন গ্রামে গিয়েও পূজা কিংবা অন্যান্য ক্রিয়া কর্মে সাহায্য করতেন। এই মহিলাদের উপার্জনের মূলধন ছিল সাংসারিক কর্মে দক্ষতা, বিচক্ষণতা এবং শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষমতা। সেকালের কোনো কোনো মহিলার আরেকটি পেশার কথাও জানা যায়। এঁরা হলেন গল্প বলিয়ে মহিলা। অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী জানাচ্ছেন, তাঁদের বালক বয়সে সৌদামিনী নামে জনৈক বিধবা তাঁদের ভবানীপুরের বাড়িতে গল্প বলতে আসতেন। গল্প বলার বিনিময়ে তিনি পেতেন 'সিধা' - অর্থাৎ মাসকাবারি চাল-ডাল, তরিতরকারি, মশলাপাতি, নুন এবং আট আনা পয়সা। এছাড়া, পুজোর সময় তিনি পেতেন একটা করে থান। এঁদের মূলধন ছিল প্রধানত কল্পনা প্রবণতা, মধুর বাগভঙ্গি ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণী ক্ষমতা।

আবার এই সময়েই কলকাতা ছিল মহিলা কবিদলেরও জীবিকার্জনের প্রধান স্থান। ছাপাখানা আবির্ভাবের আগে সেকালের কলকাতায় কোনো কোনো গৃহস্থ দরিদ্র ঘরের মেয়ে বা বিধবা মহিলা পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি অনুলিখনের কাজ করেও জীবিকার্জন করতেন। মেয়েরা ঘরে বসেই কাজটি সম্পন্ন করতেন। এই পেশার ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত ছিল দুটি - লেখাপড়া জানা ও সুন্দর হস্তাক্ষর । এছাড়া , শিক্ষিত বৈষ্ণবীরা ভদ্র ও অভিজাত পরিবারের অন্তঃপুরবাসীনীদের গৃহশিক্ষকের কাজও করতেন। ঊনবিংশ শতকের মেয়েদের আরেকটি পেশার কথাও জানা যায় - পটচিত্র অঙ্কন। কালীঘাট মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ও নিকটবর্তী পটুয়া পাড়ায় পটচিত্র অঙ্কনের যে ব্যাপক প্রসার ছিল তাতে বহু মহিলা শিল্পীই বংশানুক্রমে নিযুক্ত ছিলেন। অঙ্কন নৈপুণ্যে ও সৌন্দর্য বিচারে নারীশিল্পীর আঁকা পটচিত্রগুলিও যথেষ্ট উচ্চমানের শিল্প চাতুর্যের পরিচয় বহন করত, ওস্তাদ পুরুষ পটুয়াদের চেয়ে তাঁরা দক্ষতায় কেউ কম ছিলেন না। ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, তখন বাংলায় ৫৭৪ জন মহিলা ধর্মীয় প্রতিনিধি ('গুরুমা') রূপে, ৬ জন জ্যোতির্বিদ হিসাবে, ২৯০ জন মহিলা কবিরাজি ও ২১৫ জন হেকিমি পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, এঁরা সকলেই এসেছিলেন মধ্য ও নিম্নবিত্ত শ্রেণি থেকে। এছাড়াও কিছু সংখ্যক মুসলমান মধ্যবিত্ত মহিলা জামাকাপড় তৈরি করে কলকাতার মুসলিম মালিকানাধীন টেলারিঙের দোকানে বিক্রি করতেন। (৩) অন্যদিকে যেসব মহিলারা ধনী বিত্তবান শ্রেণির, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবসায়িক কার্যভার সফল ভাবেই বহন করতেন। উল্লেখ্য, রানি রাসমণি , কাশিম বাজারের মহারানি স্বর্ণময়ী, পুটিয়া যোগেন্দ্র নারায়ণের স্ত্রী শরৎকুমারী দেবী পর্দানশীন হলেও স্বামীর মৃত্যুর পর যথেষ্টই সুষ্ঠুভাবে স্বামীর সম্পত্তির দেখভাল করতেন।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মহিলাদের সামনে নতুন নতুন পেশা ও কর্ম জগতের দুয়ার উন্মুক্ত হয়। এবং ক্রমশ বঙ্গনারীরা কিছু অংশে হলেও পেশা জগতে প্রবেশ করতে শুরু করেন। এইসব নতুন পেশার মধ্যে যেমন ছিল শিক্ষকতা, শিল্পবিদ্যা,

চিকিৎসা বিদ্যার মতো নতুন কাজের দুনিয়া, তেমনি আবার কোনো কোনো মহিলা সাহিত্য সেবা বা সাংবাদিকতার মতো পেশার প্রতিও আকৃষ্ট হন। ক্রমশ অধিক সংখ্যক মহিলা কেন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে শুরু করলেন, অপ্রতুল প্রমাণাদির জন্য তা বলা প্রায় অসম্ভব। অবশ্য মনে হয় যে, নারীশিক্ষা বিস্তারের ফলে এবং পরিবারের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপসহ সমাজ পরিবর্তনের ফলে ঊনবিংশ শতকের শেষ দু'দশকে মহিলারা পেশা জগতে পা রাখতে শুরু করেন।

বিশেষত শিক্ষার প্রসার হেতু শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে কতগুলো নতুন সমস্যাও দেখা দেয়। বিশেষত কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত মহিলারা এমন এক জীবনের স্বাদ পান যা পূর্বে তাঁদের অজানা ছিল। এঁরা পারিবারিক দায়িত্বের অতিরিক্ত কতকগুলো সামাজিক ভূমিকা পালন করতে চান। তদুপরি, স্ত্রীশিক্ষা, অবরোধ প্রথা, এবং বাল্যবিবাহের মতো দেশাচারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় এঁদের পক্ষে স্বামী লাভ করা কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই অনেকেই বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে চাকুরি নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই শ্রেণিতে পড়েন চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী সেন, কুমুদিনী খাস্তগীর প্রমুখ। পরবর্তীকালে বিয়ে হওয়ার পর এঁদের কেউ কেউ চাকুরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সূত্রে বঙ্গনারীর জীবনে সম্পূর্ণ নতুন এক দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হয়। প্রথমে অতি অল্প সংখ্যক মেয়ে নিজস্ব উপার্জন সম্বন্ধে উৎসাহী হলেও ক্রমে অধিক সংখ্যক মহিলা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মেয়েদের অন্তঃপুরের বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত করায় এবং পাঠ-শেষে অনেক মেয়েই অন্তঃপুরের গতানুগতিক জীবনের বাঁধাধরা ছকে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক হয়ে ওঠেন। সুতরাং অন্তঃপুর বহির্ভূত একটি অন্য জীবনের স্বাদ বজায় রাখতে তাঁরা কোনো পেশা গ্রহণে উৎসাহী হন। তাছাড়া, যাঁরা শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাঁরা কর্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে নিজের দক্ষতা প্রমাণের সূত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবেন এতেও সন্দেহ নেই। নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তাও নিশ্চয়ই অনেক মেয়ে অনুভব করেন। সর্বোপরি, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য ক্রমশ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় এবং বৃত্তিমূলক কিছু প্রকল্পও প্রবর্তিত হওয়ায় পষ্টতই মেয়েদের উপযুক্ত বহু পদের সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষিত , প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনে ইচ্ছুক মহিলারা এই পদগুলিতে নিযুক্ত হলে বঙ্গদেশে চাকুরিজীবী নারীর ভূমিকা পালনকারী একটি শ্রেণির প্রথম উদ্ভব ঘটে। কিন্তু পরিবার প্রতিপালনের জন্য মহিলাদের তরফেও জীবিকা গ্রহণ --- এই তত্ত্বটি ভদ্র বাঙালি পরিবারে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়নি। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যেও প্রথমে কিছু নারী বিভিন্ন পদে কর্ম গ্রহণ করেন - তাঁরা সাধারণত হিন্দু বিধবা। উপরোক্ত নানাকারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কিছু বঙ্গনারী বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে নিজস্ব রোজগারের স্বাদ গ্রহণ করেন। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বঙ্গীয় পুরুষদের মতোই প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে উৎসাহী এই পেশাজীবী মহিলারা নিজেদের মূল্য সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে ওঠেন। তাছাড়া, এঁরা পুরুষের বিস্তৃত কর্মজগৎ ও অন্তঃপুর নিবদ্ধ মহিলাদের ভিতর একটি মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করেন। প্রথম জীবিকা অর্জনকারী এই মহিলারা ছিলেন অবশ্যই দেশীয় খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম বা উদার হিন্দু পরিবারের সদস্য।

স্বভাবতই প্রথম যে বিভাগে মেয়েরা জীবিকা গ্রহণ করেন তা হল শিক্ষা বিভাগ। ১৮৬০-এর দশকে মেয়েরা প্রথম এই বিভাগে কর্মে নিযুক্ত হতে থাকেন। এসময়ে স্ত্রী-শিক্ষার দ্রুত প্রসার সাধারণ শিক্ষিত এবং বিবাহিত মহিলাদেরকে সবেতনে অথবা বিনাবেতনে শিক্ষকতা গ্রহণে উৎসাহিত করে। পুরুষেরাও ততদিনে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মহিলা শিক্ষক জোটাতে না পারলে স্ত্রী-শিক্ষা যথেষ্ট জনপ্রিয় হবে না। এর ফলে শিক্ষকতা গ্রহণের জন্য শিক্ষিত মহিলাদের

ওপর যথেষ্ট চাপ পড়ে। ১৮৬০-এর দশকে বিভিন্ন নর্মাল স্কুল অথবা বিভিন্ন স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক সভা পরিচালিত স্কুলে মেয়েরা কেউ কেউ কর্ম গ্রহণ করেন।

সম্ভ্রান্ত ঘরের কোনো বৌ ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোলেন, তা-ও আবার কাজে যোগ দিতে --- বাঙালি সমাজে এমন ঘটনা প্রথম ঘটল ১৮৫৭ সালে। তাও 'কলির নতুন রাজধানী' কলকাতায় নয়, মফঃস্বল শহর বর্ধমানে। ২৪ জুলাই, ১৮৫৭ সালের 'এডুকেশন গেজেট' থেকে জানা যাচ্ছে - বর্ধমান নগরাধিপতির স্থাপিত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত রমাপতি মুখোপাধ্যায়ের পত্নী আচার্য্য পদে নিযুক্ত হয়েছেন। (৪) এর কয়েক বছর পরে পাবনার হরিশচন্দ্র শর্মার পত্নী বামাসুন্দরী মাসিক ২০ টাকা বেতনে পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হন। (৫) সম্ভবত ঢাকার রাধামণি দেবীই প্রথম মহিলা যিনি সবেতনে একটি চাকুরি গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৬৬ সালে মাসিক ৩০ টাকা বেতনে শেরপুর স্ত্রী শিক্ষা বিধায়িনী সভায় এই চাকুরি পান। (৬) একজন বাঙালি মেয়ে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন জেনে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর আশ্চর্য হয়ে যান। তিনি ঢাকার কমিশনারকে রাধামণির একটি ছবি তুলে বিলেতে পাঠাবার নির্দেশ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এইসব স্কুলে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেওয়ার জন্য প্রচুর শিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দেয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষিকা চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করে। (৭) এইসব বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে সাহস করে যে সব মেয়ে ঘরের বাইরে পা রেখেছিলেন, তাঁদের সকলের নাম পরিচয়, আজকে জানার আর উপায় নেই। তবে উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকা থেকে চাকুরিজীবী কিছু মেয়ের খবরাখবর জানা যায়। কৃষ্ণকামিনী দেবী, মনোরমা মজুমদার, মোহিনী খাস্তগীর, মুক্তকেশী চৌধুরানি প্রমুখ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তী দশকে রাধারানি লাহিড়ী , রাজলক্ষ্মী সেন, মহামায়া বসু প্রমুখ কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত মহিলা নর্মাল বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। (৮) তবে রাধারানি লাহিড়ীকে ১৮৭৮-এ মাসিক ৬০ টাকা বেতনে ঢাকার অ্যাডাল্ট ফিমেল স্কুলে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এই অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করায় ১১.৭.১৮৭৮ তারিখে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়ে লেখে - আশা করি এই চাকরি গ্রহণ করে তিনি এদেশের মেয়েদের সামনে অনুকরণযোগ্য এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরবেন। (৯) সামাজিক পরিবেশের এই পরিবর্তন হেতু ক্রমে মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়েও কর্মে নিযুক্ত হতে থাকেন। ১৮৮০-এর পর থেকে মেয়েরা বেথুন স্কুল ও কলেজে কর্মে নিযুক্ত হন। রাধারানি লাহিড়ী, চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী সেন, কুমুদিনী খাস্তগীর প্রমুখ প্রথম দিকে এবং পরে হেমপ্রভা বসু, সুরবালা ঘোষ, সুরবালা মিত্র প্রমুখ বেথুন স্কুল ও কলেজে কর্মগ্রহণ করেন। রাধারানি লাহিড়ী ১৮৮০ সাল নাগাদ বেথুন স্কুলে শিক্ষকতার পদে যোগদান করেন। এবং ১৮৮৬ - ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের প্রধান অধ্যক্ষা ছিলেন। তবে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ চাকুরি পান চন্দ্রমুখী বসু। ১৮৮৪ সালে তিনি বেথুন কলেজে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তাঁর প্রারম্ভিক বেতন ছিল ৭৫ টাকা। তখনো পর্যন্ত কোনো বাঙালি মহিলা এত বেশি বেতনের চাকুরি করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বামাবোধিনী পত্রিকা এর সমালোচনা করে দাবি করে যে, চন্দ্রমুখী বসু একজন এম. এ. তাই তাঁর বেতন অন্তত ১০০ টাকা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেকালে বোধহয় একজন এম. এ. পাশ এরকমই বেতন পেতেন, তাই এধরনের দাবি করা হয়। অর্থাৎ পত্র-পত্রিকাগুলি কেবল মেয়েদের চাকুরির বিষয়েই নয়, মেয়েদের ন্যায্য বেতনের দাবিতেও সোচ্চার হল, যা খুবই উল্লেখযোগ্য। তবে ১৮৮৬-তে তিনি বেথুনের তত্ত্বাবধায়ক হন এবং তাঁর বেতন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। পরে তিনি বেথুনের অধ্যক্ষও হন। কামিনী সেনকে ১৮৮৬ সালে বেথুন স্কুলের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এবং পরবর্তীকালে তিনি বেথুন কলেজের প্রভাষক হন। কুমুদিনী খাস্তগীর ১৮৯০ সালে বেথুন স্কুলের শিক্ষক, ১৮৯১ সালে সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ১৮৯৬ সালে প্রভাষক নিযুক্ত হন। ১৯০১ সালে চন্দ্রমুখী বসু অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর নিলে ১৯০২ সালে তিনি বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ হন, ও পরে ১৯০৭ সাল নাগাদ তিনি একজন পুরোপুরি প্রফেসর হন। তাঁর আগে কেবল চন্দ্রমুখী বসুই এ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। (১০) এভাবেই যতদিন গেছে বেথুন স্কুল ও কলেজে মেয়েদের চাকুরি গ্রহণের সংখ্যা ততই বেড়েছে। অন্যদিকে শিক্ষার গুণে প্রথম বড় সরকারি চাকুরি পান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মনোমোহিনী হুইলার। ১৮৭৯ সালে তিনি বিদ্যালয়সমূহের মহিলা পরিদর্শক নিযুক্ত হন। (১১) এভাবেই ১৮৮০-র দশক থেকে মহিলাদের জন্য ভালো বেতনের সরকারি চাকরির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

এসময়ে অনেক মহিলাই অন্তঃপুরে শিক্ষা দানের জন্য গৃহ শিক্ষয়িত্রী হিসেবেও নিযুক্ত হন। তাঁদের মাসিক বেতন ৭ টাকা থেকে ৪০ টাকার মধ্যে ছিল। অনেক সময়ে এধরনের শিক্ষয়িত্রীরা শিক্ষা দানের জন্য দূরবর্তী স্থানেও যেতেন। প্রয়োজন হলে তাঁদের থাকবার উপযুক্ত ব্যবস্থাও করা হত। (১২) কোনো কোনো শিক্ষিত মহিলা উত্তম বেতনের

চাকরিতে যোগ দিতে দূরবর্তী প্রদেশেও যেতেন। নয়ের দশকের শুরুতে শরৎ চক্রবর্তী অমৃতসরে, পরে ১৮৯৪ সালে কুমুদিনী খাস্তগীর মহীশুরের মহারানির বালিকা বিদ্যালয়ে সহশিক্ষিকার পদে যোগ দেন এবং একবছর পরে সরলাদেবী কুমুদিনীর ছেড়ে যাওয়া পদে যোগ দিয়েছিলেন। মধ্যবর্তী কোনো সময়ে সরলা মাসিক ৪৫০ টাকা বেতনে বরোদার মহারানির প্রাইভেট সেক্রেটারির দায়িত্বও পালন করেন, যা ছিল সেকালের কোনো মহিলার পক্ষে অকল্পনীয়। ইতিমধ্যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নারীশিক্ষায় উৎসাহী সদস্যদের চেষ্টায় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা সমাজ পাড়ায় (পরে বিভিন্ন স্থানে এবং শেষে স্থায়ীভাবে আপার সার্কুলার রোডে) ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ও তৎসংলগ্ন মেয়েদের বোর্ডিং স্থাপিত হলে শিক্ষিত মেয়েরা নানাভাবে বিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্যে নিযুক্ত হন। এই প্রসঙ্গে প্রথম দিককার মহিলাদের মধ্যে সরলা রায়, লাবণ্যপ্রভা বসু, কামিনী রায়, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, অবলা বসু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। (১৩) অবলা বসু ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা শিল্পভবন, বিদ্যাসাগর বাণীভবন, নারীশিক্ষা সমিতি, - সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর মত ছিল, মেয়েদের শিক্ষা যেন জীবিকার সন্ধান দিতে পারে ; তাই তিনি জোর দিয়েছিলেন হাতের কাজ শেখার ওপর। (১৪) তাঁর দিদি সরলাও মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপার্জনের ওপরও জোর দিয়েছিলেন। মেয়েদের কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্যে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলে শুধুমাত্র শিক্ষয়িত্রীই নিয়োগ করা হত। মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরলা অনেক কাজ করেছিলেন। গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজ তারই স্বাক্ষ্য। সুষ্ঠভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সেনেটের সদস্যা করে। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম সেনেটের সদস্য হন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী নির্মলা সোম ও বেথুন কলেজের লেডি সুপারিন্টেন্ডেন্ট কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এন্ট্রান্স পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। (১৫) ঘটনাটি সমকালে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে অবলা বসু দুঃস্থ মেয়েদের জন্য মহিলা শিল্পভবনে তাঁতের কাজ, রঙ করা, সুতো কাটা, ছুঁচের কাজ প্রভৃতি শেখানোর ব্যবস্থা করেন। হিরন্ময়ী দেবী এরকমই একটি শিল্পভবন স্থাপন করেন কলকাতায়, তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রিও করা হত। (১৬) লীলাবতী মিত্রও মেয়েদের স্বনির্ভরতার বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন এবং এবিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনাও করেন। তিনি বিভিন্ন কারিগরি ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের উপার্জনের নানা নতুন পথের সন্ধান দেন। (১৭) যেমন - বই বাঁধানো, কাগজের ঠোঙা তৈরি, চিত্রশিক্ষা, বেতের বাস্কেট, কাপড়ের ফুল তৈরি, ইংলন্ড থেকে যন্ত্র আনিয়ে তার সাহায্যে নানা ধরনের মোজা তৈরি করে বিক্রি করা, অথবা টাইপরাইটিং, ছবি বাঁধাই, ফটোগ্রাফি, টেলারিং, কার্ড বোর্ডের বাক্স তৈরি, অ্যাপ্লিক বা পশমের শিল্পদ্রব্য তৈরি, জরি ও রেশমের কাজ, ক্রোশের সেলাই, টিনের বাক্স রঙ করা ইত্যাদির এক দীর্ঘ তালিকা পেশ করেন তিনি এবং মনে করেন যে, এসবের সাহায্যে মেয়েরা সহজেই ঘরে বসে রোজগার করতে পারবেন। অন্তঃপুরের শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা রমণী, ভদ্র মধ্যবিত্ত গৃহের অনাথিনী কিংবা দরিদ্র গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা যাতে ঘরে বসেই অর্থকরী শিল্প দ্বারা দু-পয়সা উপার্জন করতে পারেন, তার উপায় করিয়ে দেওয়াই তাঁর সামাজিক কর্তব্য বলেও তিনি মনে করতেন। এভাবেই উনিশ শতকের শেষের দিকে পত্র-পত্রিকাগুলির বেশির ভাগ সংখ্যা খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, অনেক মহিলাই ক্রমে মেয়েদের অর্থনৈতিক ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও দায়-দায়িত্বের কথা তুলে ধরতেন।

উনিশ শতকের শেষ দিকে কোনো কোনো মহিলা ফোটোগ্রাফি চর্চায় উৎসাহিত হন। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের তৃতীয় মহিষী মনোমোহিনী প্রথম ফোটোগ্রাফিতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। ইন্দিরা দেবীর একটি চিঠি থেকে জানা যায়, জ্ঞানদানন্দিনীও ছবি তুলতে শিখেছিলেন এবং ঠাকুরবাড়ির এমন সব মহিলার ছবি তুলেছিলেন যাঁদের অন্যত্র ছবি তুলতে যাবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ফোটোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে প্রথম গ্রহণ করেন সরোজিনী ঘোষ। ১৮৯৮-এর জানুয়ারির মধ্যেই তিনি ৩২, কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে 'মহিলা আর্ট স্টুডিও' মারফৎ তাঁর পেশা ব্যাপক দক্ষতার সঙ্গে চালাতে শুরু করেন। এক বছর পরে তাঁর স্টুডিওতেই সিল্কের উপর ফোটোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি

গ্রহণের ব্যবস্থা হয় এবং ফটোগ্রাফির কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদিও বিক্রি হতে থাকে। পরবর্তী কালে অন্নপূর্ণা দত্ত, চঞ্চলাবালা দাসী প্রমুখ মহিলারা ফটোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালিত 'নারী শিল্প শিক্ষালয়' (স্থাপিত ১৯১৬) নামক প্রতিষ্ঠানে টাইপরাইটিং, ঘড়ি মেরামতি, ফ্রেট ওয়ার্কস্ ও ফটোগ্রাফি শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও ছিল। (১৮) এমন কী সংবাদপত্রে চিত্রশিল্পীর কাজেও অনেক মহিলা যোগদিতে এগিয়ে এসেছিলেন। (১৯)

মেয়েদের আরেকটি পেশার পথ উন্মুক্ত হয় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ধাত্রীবিদ্যা পাঠক্রম চালু হবার পর। সমাজের একটি স্বল্প সুবিধাভোগী সম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দু বিধবাদের মধ্যে এই পেশা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল মাঝারি, প্রশিক্ষণ কাল ছিল ডাক্তারির তুলনায় কম এবং চাকুরি পাওয়াও ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রথম পাশ করা এই ধাত্রীদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মফস্বল থেকে বহু সম্ভ্রান্ত বিধবা মহিলাও এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আসেন এবং অর্থোপার্জন প্রয়োজন এমন মহিলাদের ব্রাহ্মরা ধাত্রীবিদ্যায় প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত করেন। কলকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলও ১৮৮০ এর দশকের প্রথম দিকে মহিলাদের জন্যে একটি সেবিকা ও ধাত্রীবিদ্যার পাঠক্রম চালু করে। সেবিকা ও ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক পাঠক্রমের প্রতি এত বেশি মহিলা সাড়া দেবেন আগে কেউই আশা করেননি। এভাবেই অনেক মেয়ে সফল ভাবে এই ট্রেনিং সমাপ্ত করে ভালোভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করেন এবং প্রশিক্ষিত সেবিকা ও ধাত্রীরা তাঁদের পেশাদারি কাজ আরম্ভ করলে, গর্ভাবস্থায় ও সন্তান প্রসব কালে সাহায্য করার জন্য তাঁদের ডাকা হত। এ প্রসঙ্গে কলকাতার যে কয়েকজন ধাত্রী বিশেষজ্ঞর নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ এবং থাকমণি রায়, কলেজ স্ট্রিটের নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায়, ঠনঠনিয়ার থাকমণি ঘোষ, বিডন স্ট্রিটের মনোমোহিনী রায়, পাথুরিয়াঘাটার বসন্তকুমারী দত্ত প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অনেকেই মফঃস্বলেও যেতেন। (২০)

ধাত্রীবিদ্যা ছাড়াও ডাক্তারি পড়ার আগ্রহও মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ বোধ করেন। প্রথমদিকে অবলা দাস ও অ্যালেন ডি আব্রু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করতে চাইলেও কলকাতা মেডিকেল কলেজ ছাত্রীকে চিকিৎসাবিদ্যা পড়াতে সম্মত হয়নি। ফলে ১৮৮২ সালে বাংলা সরকারের বৃত্তি নিয়ে এঁরা দুজনেই মাদ্রাজের মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তবে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় চিকিৎসাবিদ্যা পড়তে আগ্রহী হলে বাংলার ছোটলাট স্যার রিভার্স অগস্টস টমসন কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক সভার আপত্তি অগ্রাহ্য করে সরকারি নির্দেশবলে কাদম্বিনীকে ঐ বছরই কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দেন। (২১) এবং এই নির্দেশে আদেশ দেওয়া হয় যে, যথাযোগ্য যোগ্যতা থাকলে মহিলাদেরও মেডিকেল কলেজে ভর্তি করতে হবে। এরপর থেকেই বহু ছাত্রী মেডিকেল কলেজে পড়তে যান ও চিকিৎসক হন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি ১৮৮৩ সালে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলেও মহিলাদের জন্য ডিগ্রি পাঠক্রম চালু হয়। মেয়েদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সরকার পরের বছর এই পাঠক্রমে অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রীকেই বৃত্তি দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। বিভিন্ন দূরের জেলা থেকেও মেয়েরা ভর্তি হতে আসেন এবং পাঠশেষে নিজ নিজ শহরে ফিরে গিয়ে বৃত্তিতে নিযুক্ত হন। ঢাকা মেডিকেল স্কুলেও এই ব্যবস্থার আগে পূর্ববঙ্গের মেয়েরাও এখানে পড়তে আসতেন। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে প্রথম উপাধি দেওয়া হত এইচ. এ. বা হসপিটাল অ্যাসিস্টেন্টস, পরে এল. এম. পি. উপাধিও দেওয়া হয়েছে। (২২) ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল থেকে ডিপ্লোমা পাওয়া ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন শরৎকুমারী মিত্র, বসন্তকুমারী গুপ্ত, কৈলাসবাসিনী গুহ, ক্ষীরোদাসুন্দরী রায়, হেমাঙ্গিনী দেবী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে প্রথম স্থানীয় শরৎকুমারী মিত্র কলিকাতার কলেজ স্ট্রিটে চিকিৎসাকার্য আরম্ভ করেন। (২৩) ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কলকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হেমবতী সেন অনার্স পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করায় পাঁচটি রৌপ্য পদক পুরস্কার পান। (২৪) ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল থেকে উত্তীর্ণ ৫৫ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৫ জন ছাত্রী ও এই ৫ জন ছাত্রীর মধ্যে লতিফন্নেসা নাম্নী এক মুসলমান ছাত্রী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।(২৫) ।

কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রথম যে দুজন মহিলা গ্রাজুয়েট হন, তাঁরা হলেন বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র, - এঁরা দুজনেই ছিলেন দেশীয় খ্রিস্টান। ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ভাগলপুরে চিকিৎসাকার্য করতে যান। কিন্তু পরে স্বাধীনভাবে কাজ করবেন বলে কলকাতায় চলে আসেন। এর পূর্বেই কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৮৯ খিস্টাব্দে দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলেও কলেজ থেকে তাঁকে জি. বি. এম. সি উপাধি দেওয়া হয়। ফলে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিলেতে যান।

এডিনবরা থেকে এল. আর. সি. পি. ও এল. আর. সি. এস. এবং গ্লাসগো থেকে ডি. এফ. পি. এস. ডিগ্রি অর্জন করে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। (২৬) ১৮৯৩ সালে কাদম্বিনী ডাফরিন হাসপাতালে ৩০০ টাকা বেতনে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করতেন তিনি। তাঁর চেম্বার ছিল কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিট অঞ্চলে। ১৮৯৪ সালে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্রীদের স্ত্রীরোগ বিষয়ে শিক্ষাদানের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। তাঁর আগে এদেশের কোনো মহিলা চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেবার সুযোগ পাননি। (২৭) ১৮৯০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে মাত্র একজন বাঙালি মহিলা - কামিনী সেনের ছোটো বোন যামিনী সেন - -- মেডিকেল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হন। বিধুমুখী বসুর ছোটো বোন বিন্ধ্যাবাসিনী কলেজের মেধাবী ছাত্রী হয়েও কোনো অজ্ঞাত কারণে লেখাপড়া বন্ধ করেন। ১৮৯৭ সালে এল. এম. এস. পাশ করে যামিনী স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করতে শুরু করেন। কিন্তু এইকালে মেয়ে ডাক্তারকে লোকে চট করে ডাকত না, বা ডাকলেও তাঁকে ফি দিতে ইতঃস্তত করত। এইসব কারণে প্রাইভেট প্র্যাকটিস ছেড়ে তিনি চাকরিতে যোগ দেন। ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বরে কাঠমান্ডুতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের হাসপাতালের দায়িত্ব নিয়ে তিনি নেপালে যান। (২৮) তিনি উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরেও চিকিৎসক হিসেবে চাকুরি করেন। দেখা যায় যে, তখনো পর্যন্ত বেশির ভাগ লোকই কাদম্বিনী অথবা বিধুমুখী বসুর মতো উত্তীর্ণ চিকিৎসকের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। এর কারণ স্পষ্ট নয়। কাদম্বিনীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে রক্ষণশীল হিন্দুদের জনপ্রিয় সাময়িকী 'বঙ্গবাসী'-তে তাঁর সম্পর্কে কুৎসা প্রচার করা হয়, শেষ পর্যন্ত এ গোলযোগ আদালত অব্দি গড়ায়। কাদম্বিনী মামলায় জয়ী হন। পত্রিকার সম্পাদকের ২ মাসের জেল এবং ১০০ টাকা জরিমানা হয়। (২৯) সেকালে একজন মহিলা চিকিৎসকের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা কেমন ছিল তার এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিলেন ডাক্তার হৈমবতী সেন, ১৮৯৫ সালে লেখা তাঁর দিনালিপিতে : I would get up every dayat four in the morning, prepare a breakfast for my husband and children,and go downstairs with hot water and edibles for the patients.I would first help the patients wash...I would

finish this chore of helping them wash and give them a piece of 'batasha' or candied sugar as their snack...wher there were children staying with the mother I would make some 'halua' (semolina sweet) and give them small quantities of it. It would take me a little over an hour to attend to the patients and come back. I would go back home , have a wash, wake up the children, give them breakfast, arrange for my husband's meal, get dressed,have something to eat and then go back to the hospital.This was my daily routine.' (৩০)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার লাভের ফলে কিছু কালের মধ্যেই কোনো কোনো বঙ্গমহিলাকে পর্দার আড়াল ভেদ করে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। আরো বেশ কিছুদিন পরে পত্রিকায় মেয়েদের লেখার সুযোগ করে দেয় বামাবোধিনী সভা। তাঁরা বলেন , 'বামাবোধিনী সভাতে স্ত্রীলোকদিগের লেখা সমাদর পূর্ব্বক গৃহীত হইবে এবং যোগ্যবোধ হইলে পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইবে লেখিকাগণ সম্পাদকের নিকট স্বনাম-ধাম সম্বলিত পত্রপ্রেরণ করিবেন।' (৩১) কাজেই বামাবোধিনী পত্রিকার (১৮৬৩) কাছে মহিলাদের ঋণ খুব সামান্য ছিল না। এছাড়া, মহিলাদের লেখার সুযোগ করে দেয় 'অবলাবান্ধব' (১৮৬৯) , 'বঙ্গমহিলা' (১৮৭৫) 'ভারতী' (১৮৭৭), 'অনাথিনী' (১৮৭৫), 'খৃষ্টীয় মহিলা' (১৮৮১), 'অন্তঃপুর' (১৮৯৮) ইত্যাদি পত্রিকা। তখন নাম গোপন রাখার প্রথা ছিল, তাই অনেক মহিলা সাহিত্যিকের পরিচয়ই হারিয়ে গেছে। প্রার্থনা, শোক এবং কখনো কখনো মিলনানন্দ ও বিরহ মহিলাদের লেখায় স্থান পেত। নারীজাতির আদর্শ, কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে এবং কখনো সমকালীন সমস্যা নিয়েও কেউ কেউ প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি লিখতেন। পত্র- পত্রিকায় আবদ্ধ না থেকে, উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের বছরগুলি থেকে তাঁরা গ্রন্থ রচনাতেও এগিয়ে আসেন। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের কৃতিত্ব কৃষ্ণকামিনীর প্রাপ্য। ১৮৫৬ সালে তাঁর লেখা 'চিত্ত বিলাসিনী' নামক একটি কাব্য গ্রন্থ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। 'চিত্ত বিলাসিনী'-র প্রকাশকাল থেকে পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে (১৮৫৬-'৬৬) আরো সাতজন গ্রন্থলেখিকার সন্ধান পাওয়া যায়। বামাসুন্দরী দেবী, হরকুমারী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, মার্থা সৌদামিনী সিংহ, রাখালমণি গুপ্ত, কামিনীসুন্দরী দেবী, বসন্তকুমারী দাসী - এই সাতজন লেখিকা বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এর থেকে স্পষ্ট যে, নিজেকে প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষা শুধু শহর কলকাতা বা তার আশপাশের শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছড়িয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তের জেলাগুলিতেও। সব ধরনের লেখালেখিতে অভ্যস্ত হলেও উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েরা কবিতার জগতেই বেশি স্বস্তি বোধ করতেন। উনিশ শতকের কবিদের মধ্যে কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, বা গিরীন্দ্রমোহিনীর নাম একালেও অতিপরিচিত। এঁরা ছাড়া যাঁদের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে প্রসন্নময়ী, ভবসুন্দরী, বসন্তকুমারী, অন্নদাসুন্দরী, হেমাঙ্গিনী, কুন্দকুমারী, বিরাজমোহিনী, হেমন্তকুমারী, নবীনকালী, নগেন্দ্রবালা , অম্বুজাসুন্দরী, কৃষ্ণপ্রিয়া, মৃণালিনী, মোহিনী, উমাসুন্দরী, মহামায়া, তরঙ্গিনী প্রমুখের নাম প্রায় বিস্মৃতই হয়ে গেছে। এই কবিরা শুধু কল্পজগতেই বিচরণ করেননি, সমকালীন দেশ-কাল, সমাজ-রাজনীতি বিষয়েও তাঁরা কতটা সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ মিলবে তাঁদের লেখাগুলিতেই। ১৮৬১ সালে কালীঘাটের হরকুমারী দেবী লেখেন 'বিদ্যা দারিদ্র দলনী' কাব্যটি, ১৮৬৪ সালে বসন্তকুমারী দাসীর লেখা 'কবিতা মঞ্জরী' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধের কবি মানকুমারী বসু কবিতা লেখার পাশাপাশি ছোটো গল্প রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মোক্ষদা দেবীর কথাও ভোলার নয়, যিনি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালীর মেয়ে' নামক কবিতার প্রত্যুত্তরে ১৮৮২ সালে লেখেন 'বাঙালীবাবু' কবিতাটি । সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এ 'মুখোপাধ্যায় মহাশয়ার' কবিতার মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা ছিল। কিন্তু তারই সঙ্গে আরো একটি মন্তব্য ছিল, ' স্ত্রীলোকের কবিতার প্রশংসা করিতে আমরা বড় ভয় পাই, পাছে উৎসাহ দিলে গৃহিণীর দল গৃহকর্ম ছাড়িয়া সকলেই কাগজ কলম লইয়া বসেন। তাহা হইলে গরীব পুরুষের দল একমুঠা অন্ন পাইবে না ...” ।(৩৩) এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, পুরুষ সমাজের মনে তখনও আশঙ্কা ছিল যে, মহিলারা আর্থ-সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করলে গৃহকর্মে অনীহা জাগবে।

অল্প হলেও ক্রমে বাঙালি মেয়েরা কাব্যের জগতের বাইরেও পা রাখতে শুরু করলেন। এমনকি চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনাতেও কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। মেয়েদের মধ্যে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে প্রথম শুরু করেন ঠাকুরানি দাসী। তাঁর প্রথম লেখাটি ১৩.৪.১৮৫৮ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখাটি মেট্রোপলিটন কলেজের শিক্ষক নন্দলাল প্রকাশের জন্য 'সংবাদ প্রভাকর'-এ পাঠান। লেখাটির সঙ্গে পাঠানো চিঠিতে নন্দলাল দাস ঠাকুরানি সম্পর্কে জানান, ' a lady of a family –she is a widow,and is occupied

with nothing but reading and writing' . (৩৩) উনিশ শতকের মধ্যভাগেই শুধুমাত্র লেখাপড়া নিয়ে থাকার মতো মানসিকতাও যে কোনো কোনো বাঙালি নারীর গড়ে উঠেছিল, ঠাকুরানি দাসীই তার প্রমাণ। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত বামাসুন্দরীর ' কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে ?' বাঙালি নারীর লেখা প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ। বামাসুন্দরীর উদাহরণ অনুসরণ করে ১৮৬৩ সালে ' হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' ও ১৮৬৫ সালে 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' - এই দুখানি বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে কৈলাসবাসিনী দেবী সাহিত্যকে পেশা ও নেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। কলকাতার চোরাবাগানের শরৎকুমারী চৌধুরানি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর প্রথম রচনা ' কলিকাতার স্ত্রী সমাজ' ১২৮৮ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হয়। তাঁর একমাত্র 'শুভবিবাহ' ছাড়া আর কোনো রচনা বই হিসাবে প্রকাশিত হয়নি। এর সামাজিক চিত্রখানিই বঙ্গসাহিত্যে লেখিকাকে একটি বিশিষ্ট আসন দান করেছিল। এর সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ' এমন সজীব সত্যচিত্র বাংলা কোনো গল্প বইয়ে আমরা দেখি নাই।' (৩৪)

মেয়েদের মধ্যে নাটক লিখতে প্রথম এগিয়ে আসেন শিবপুরের কামিনীসুন্দরী। ১৮৬৬ সালে তাঁর প্রথম নাটক 'ঊর্বশী' প্রকাশিত হয়। নাটকটি প্রকাশ কালে 'দ্বিজতনয়া' নামের আড়ালে আত্মগোপন করেন তিনি। কিন্তু ১৮৭১ সালের 'ঊষা' নাটকটি তিনি নিজের নামেই প্রকাশ করেন। (৩৫) পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে নাটক রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। ১৮৭০ সালে প্রকাশিত মনোমোহিনী দেবীর 'সপত্নী শত্রু' নাটক মেয়েদের লেখা প্রথম সামাজিক নাটক। কামিনীসুন্দরী বা মনোমোহিনী যেসব নাটক লিখেছিলেন সেগুলি অভিনয়ের উপযুক্ত ছিল না। প্রথম যে নারীর লেখা নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, মঞ্চ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয় অভিনেত্রী গোলাপ 'শরৎ সরোজিনী' নাটকে সুকুমারীর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করার পর, সবাই তাঁকে 'সুকুমারী' নামে ডাকতে থাকে। উনিশ শতকে লক্ষ্মী , নিতম্বিনী, হেমাঙ্গিনী, সরলাসুন্দরী, নয়নতারা, মণিমোহিনী, স্বর্ণলতা প্রমুখ অনেক মহিলাই নাটক লিখতেন। (৩৬) কাব্য-নাটকের পাশাপাশি গল্প উপন্যাসও লিখতে শুরু করেন মেয়েরা। এই কালে যাঁরা গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শিবসুন্দরী, হেমাঙ্গিনী, কুসুমকুমারী, বসন্তকুমারী, শতদলবাসিনী প্রমুখ অনেকেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন। তবে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন স্বর্ণকুমারী দেবী। বঙ্গমহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম যোগ্যতার সঙ্গে গল্প, গান, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, এমনকি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধও রচনা করেন।

কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ ইত্যাদির বাইরে আরো নানা বিষয়ে কলম ধরতে উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েরা পিছপা হননি। অন্যের জীবন কাহিনি যেমন তাঁরা লিখেছেন (মার্থা সৌদামিনী সিংহ – 'নারীচরিত', কুমুদিনী ঘোষ –'স্বর্ণময়ী') তেমনই এগিয়ে এসেছেন নিজের জীবনের কথা সকলের সামনে প্রকাশ করতে ('আমার জীবন' - রাসসুন্দরী দেবী)। মহিলাদের মধ্যে প্রথম আত্মজীবনীকার নিরুপার্জন রাসসুন্দরী দেবী জীবনের শেষ প্রান্তে স্বরচিত 'আমার জীবন' (১৮৭৬) –এর সাহায্যে আর্থিক আয় করতেও সক্ষম হন। এবং নিজস্ব অভিলাষ অনুযায়ী সেই আয়ের বন্টন একটি 'ইচ্ছাপত্র'ও প্রস্তুত করেন। তাঁর ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী তাঁর আত্মকথার বিক্রয় বাবদ লভ্যাংশ সঞ্চিত থাকবে এবং এই অর্থের সাহায্যে প্রতিবছর গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ মদন গোপালের উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। (৩৭) এভাবে গ্রন্থ বিক্রয়ের দ্বারা আয়ের সম্ভাবনার পথও তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য উন্মোচিত করে যান। মেয়েদের জীবনকথাও যে শোনবার বা শোনাবার মতো হতে পারে, সে কথা রাসসুন্দরীর আগে কেউ ভাবতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। পরবর্তীকালে অনেক মহিলাই আত্মকথা রচনার মধ্য দিয়ে সমাজকে দেখেছিলেন খুব খুঁটিয়ে।

উনিশ শতকের কলকাতার কয়েকজন বঙ্গনারীর আত্মকথার তালিকা (৩৮)

নাম	আত্মকথা
সারদা সুন্দরী দেবী (১৮১৯-১৯০৭)	আত্মকথা
কৈলাস বাসিনী দেবী (মিত্র) (১৮২৯-১৮৯৫)	জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী
সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯০০)	পিতৃস্মৃতি
জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪০)	পুরাতনী
প্রফুলময়ী দেবী (১৮৫২-১৯৪০)	আমাদের কথা
সুদক্ষিণা সেন (১৮৫৯-১৯৩৪)	জীবন স্মৃতি
শরৎ কুমারী দেব (১৮৬২-১৯৪১)	আমার সংসার
বিনোদিনী দাসী (অভিনেত্রী) (১৮৬৩-১৯৪১)	আমার কথা
ইন্দিরা দেবী (১৮৬৩-১৯৩৯)	আমার খাতা
কৃষ্ণ ভাবিনী দাস (১৮৬৪-১৯১৯)	জীবনের দৃশ্যমালা
লীলাবতী মিত্র (১৮৬৪-১৯২৪)	জীবন কথা
সুনীতি দেবী (১৮৬৪-১৯৩২)	অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস
অবলা বসু (১৮৬৫-১৯৫১)	বঙ্গ মহিলার পৃথিবী ভ্রমণ
কমলা বসু (১৮৬৬-১৯৩৯)	কমলার আত্মকথা
হেমলতা সরকার (১৮৬৮-১৯৪৩)	নেপালে বঙ্গনারী
মৃণালিনী দেবী (১৮৭১- ?)	পৌরাণিকী
সরলা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫)	জীবনের ঝরাপাতা
বিনয়িনী দেবী (১৮৭৩-১৯৩১)	কাহিনি
হেমলতা দেবী (১৮৭৩-১৯৬৭)	স্মৃতি চারণ এবং পুরাতন স্মৃতি
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০)	হারানো অতীত
তিলোত্তমা দাসী (১৮৭৭-১৯০৯)	আক্ষেপ
মোহিত কুমারী দেবী (১৮৮১-১৯৩১)	সাধুমার আত্মকথা
অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮)	জীবনের শ্রুতিলেখা
পূর্ণশশী দেবী (১৮৮৫- ?)	মনে পড়ে
পূণ্যলতা চক্রবর্তী (১৮৮৯- ১৯৭৪)	একাল যখন শুরু হল এবং ছেলেবেলার দিনগুলি
উমা দেবী (১৮৯২-১৯৭৮)	বাবার ছবি
প্রতিমা দেবী (১৮৯৩-১৯৬৯)	নির্বাণ এবং স্মৃতিচিত্র
শা তা দেবী (১৮৯৩- ?)	পূর্বস্মৃতি
মীরা দেবী (১৮৯৪-১৯৬৯)	স্মৃতিকথা
হেম ত বালা দেবী (১৮৯৪-১৯৭৬)	পুরানো দিনের কথা
সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪)	সেদিনের কথা এবং নানারঙের দিনগুলি

অনেক মহিলা পাঠ্য পুস্তক – অর্থ পুস্তক রচনায় (কামিনীসুন্দরী দেবী - বালাবোধিকা, ব্রহ্মময়ী রায় - বর্ণবোধ ১, হালিমন্নেষা খাতুন - সরল আদিশিক্ষা) যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অন্যদিকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী দুখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক 'টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্' (নাটিকা), 'সাত ভাই চম্পা' (নাটিকা) রচনা করেন। অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করার কাজে এসময়েই এগিয়ে এসেছেন নির্মলা সোম, চারুশীলা গুপ্ত, সরস্বতী রায় প্রমুখ।

নিজেদের লেখা প্রকাশ করেই সন্তুষ্ট হননি তাঁরা, এযুগে সম্পাদনাকেও অনেক মেয়ে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। এভাবেই সম্পাদনার জগতেও মেয়েদের ক্রমেই দেখা মিলতে থাকে। মহিলা সম্পাদিত প্রথম বাংলা পত্রিকার মর্যাদা 'বঙ্গমহিলা'-র প্রাপ্য।

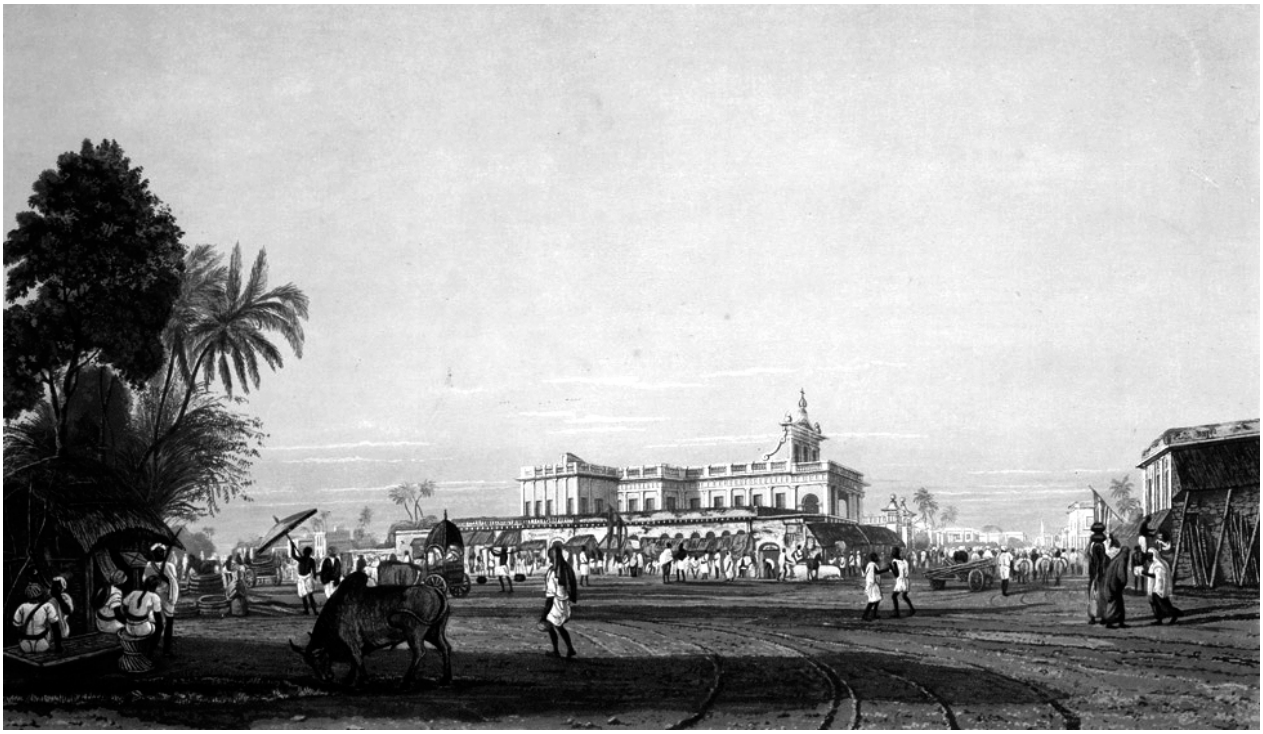

নিজের নাম প্রকাশে কুণ্ঠা ছিল সম্পাদকের, তাই তিনি 'জনৈক মহিলা' নামের আড়ালে আত্মগোপন করে থেকেছেন। তবে গবেষকরা মনে করেন, ইনি হলেন মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। অবশ্য পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে পুরুষদের ওপর নির্ভরশীলতার কথা স্বীকার করতে ইতঃস্তত করেননি মোক্ষদায়িনী। পুরুষের সাহায্য না নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করার সাহস প্রথম দেখান থাকমণি দেবী। ১৮৭৫ সালে ধুলিয়ান থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় প্রথম মাসিক পত্রিকা পত্রিকাটির গুরুত্ব আছে, কারণ এটি কলকাতা নয়, ধুলিয়ান থেকে প্রকাশিত। শুধু শহর কলকাতা নয়, মফঃস্বলের মহিলারাও যে তখন যত দিন যাচ্ছিল পত্রিকা সম্পাদনা করতে সক্ষম হয়ে উঠছিলেন এই পত্রিকাটি তারই নিদর্শন। স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকাটি বাংলায় মহিলা কর্তৃক পত্রিকা সম্পাদনার ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১৮৭৭ সালে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে শুরু করলেও ১৮৮৪ থেকে দীর্ঘ ১৪ বছর স্বর্ণকুমারী ও তাঁর দুই কন্যা এর সম্পাদনা করেছিলেন। লেখকদের পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রথা প্রথম প্রবর্তন করে সরলা দেবী পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে এক নতুন নজির সৃষ্টি করেন। 'ভারতী' পত্রিকা শুধু মেয়েদের জন্য প্রকাশিত হত না। সাধারণ পাঠকদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ নয়, তাঁদের সমমর্যাদা দান করেছিলেন সম্পাদকেরা। সমসাময়িক কালে 'পরিচারিকা' নামে আরেকটি মহিলাদের পত্রিকা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ সালে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ মোহিনী দেবী তার সম্পাদক হন। তাঁর মৃত্যুর পর কেশবচন্দ্রের দুই কন্যা সুচারু দেবী ও মণিকা দেবী পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল কুমারী কামিনী শীলের সম্পাদনায় 'খৃষ্টীয় মহিলা' নামে একটি মহিলা পত্রিকা। এখানে শুধু মহিলাদের রচনাই প্রকাশিত হত। ১৮৮৪ সালে 'সোহাগিনী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় সর্বপ্রথম বাল্য পাঠ্য পত্রিকা 'বালক' ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। ছোটদের জন্য আরম্ভ হলেও পরে এই পত্রিকায় বড়দের জন্য লেখাও প্রকাশিত হত। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা 'পুণ্য' (১৮৯৭)। পত্রিকাটি তিনি ১৯০১ সাল পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, রন্ধন প্রণালী আবার ধর্মচিন্তার কথাও এই পত্রিকাটিতে পরিবেশিত হত। সমসাময়িক এরকম আরো কয়েকটি পত্রিকার মধ্যে রয়েছে - 'সুগৃহিণী' (মাসিক) - প্রথম প্রকাশ ১৮৮৭ তে। এটি শিলং থেকে মহিলাদের জন্য হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত

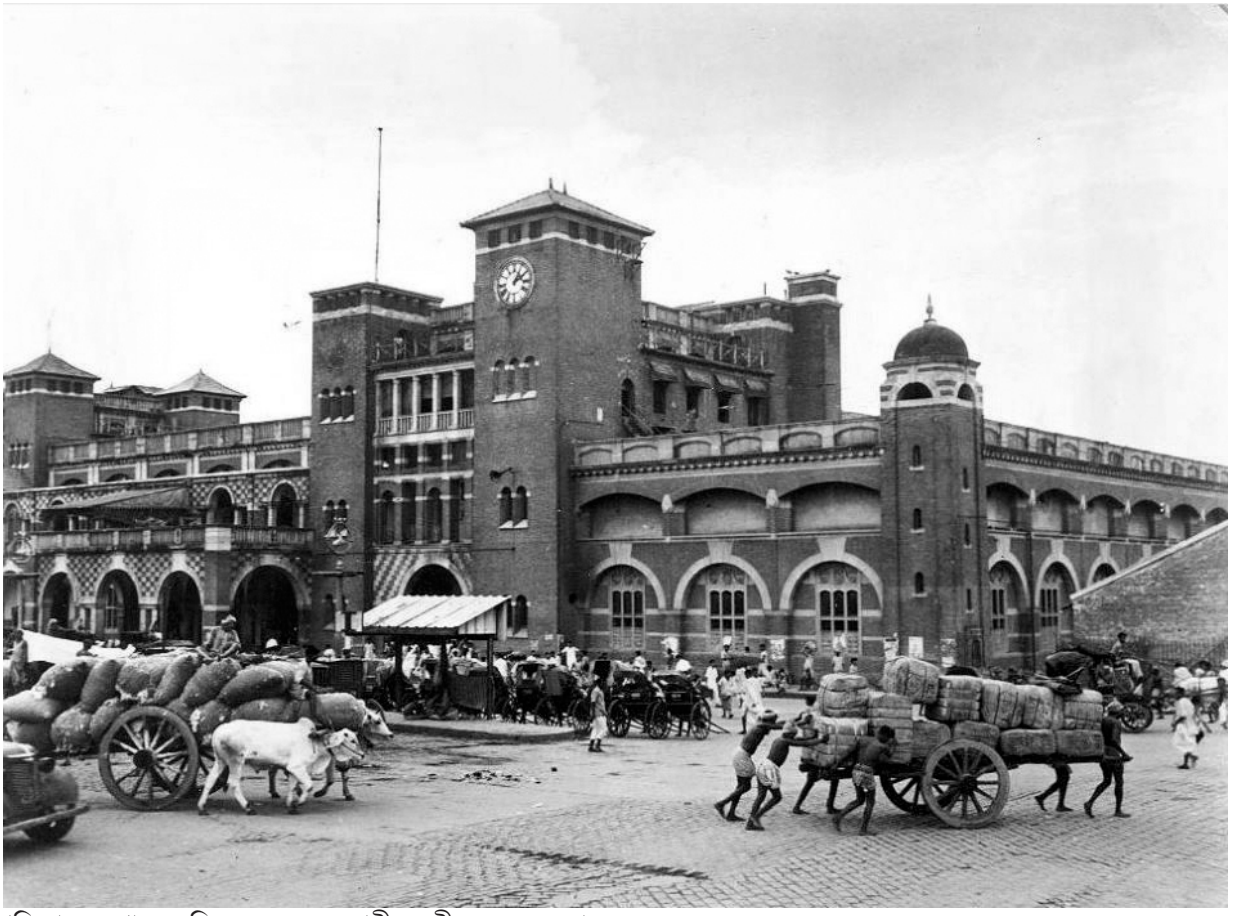

পত্রিকা; সম্পাদক ছিলেন হেমন্তকুমারী দেবী। ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত সুশীলা দেবী সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'বিরহিনী' মহিলাদের নিয়ে গল্প প্রকাশিত হত। লাহোর থেকে ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয় হরদেবী সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'ভারত ভগিনী'। ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'মুকুল' প্রথম দিকে শিবনাথ শা ত্রী পরিচালনা করলেও ১৯০০ সাল থেকে তাঁর কন্যা হেমলতা দেবী এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 'অন্তঃপুর' নামে কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত আরেকটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদিকা ছিলেন বনলতা দেবী। মহিলাদের সমস্যা ও তাঁদের উন্নতি বিধানের জন্য জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই পত্রিকায় আলোচনা প্রকাশিত হত। হেমন্তকুমারী দেবী, কুমুদিনী মিত্র, লীলাবতী মিত্র এবং শুকতারা দেবী বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। এছাড়াও ষোড়শীবালা গুপ্তর সম্পাদনায় ১৩০৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'গৃহিণী' পত্রিকা, ১২৯০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা 'বঙ্গবাসিনী', সরযূবালা দেবী সম্পাদিত 'ভারত মহিলা', শান্তিময়ী সেন সম্পাদিত 'গৃহলক্ষ্মী', কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত 'সুপ্রভাত', গিরীন্দ্রমোহিনী সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রিকা প্রভৃতির নামও করা যায়। প্রসঙ্গত, ১৮৭০-১৯১০ সালের মধ্যে ২৬ জন মহিলা সাংবাদিক রূপে ২৫টি সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। (৩৯) এই সব তথ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, বঙ্গ মহিলারা ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের নিজস্বতা নিয়ে। নারীরা নিজেরাই নিজেদের আবিষ্কার করেছিলেন – তাঁদের সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ছিল তাঁদের চিন্তা ও কর্মের ধারক-বাহক। পুরুষ সম্পাদিত পত্রিকাগুলির সঙ্গে এখানেই তাঁদের পার্থক্য। এই ভাবেই বঙ্গনারীরা সম্পাদনার ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি তাঁদের যাত্রা শুরু করেছিলেন।

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে জানা যায়, উনিশ শতকে মহিলাদের আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রের জগৎ উন্মোচিত হয়। যেমন - বরিশালের সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরে শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদার আচার্যের কার্যভার পান। বহু সংখ্যক পুরুষ মণ্ডলীর মধ্যে বেদিতে বসে তিনি যে ভাবে গাম্ভীর্য, উৎসাহ, আন্তরিক ভক্তি ও বিনয়ের সঙ্গে এই কার্য সম্পন্ন করেন, তাতে চমৎকৃত হবার কথা। ১৮৭৫ সালের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা থেকে

কলিকাতা শহরে টিকাদানে নিযুক্ত এক মহিলার কথা জানা যায়। বিগত বর্ষে তিনি শহরের ১০৭ জন পুরস্ত্রীকে টিকা দেন। (৪০) সভা সমিতির কার্য পরিচালনা করে আবার ছাত্রী নিবাসের তত্ত্বাবধানের ভারও (শ্রীযুক্তা বিরাজমোহিনী ভট্টাচার্য, সুশীলা মজুমদার, কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য প্রমুখ) নেওয়ার মাধ্যমে অনেক মহিলা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। (৪১)

এই ভাবে নানাদিকে ভদ্র বাঙালি মেয়েদের জন্য উপার্জনের পথ উন্মুক্ত হতে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ পরিবারই মেয়েদের জীবিকা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন, অনেক ব্রাহ্মও এর মধ্যে ছিলেন। কামিনী সেনের পিতা চন্ডীচরণ সেন কামিনীর বেথুনে চাকুরি গ্রহণের প্রবল বিরোধী ছিলেন। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন মনের অন্ধকার দূর হবে বলে। অনেক মেয়ে তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হবে বলে। অবশ্য তিনিও পরে মত বদলেছেন : 'তোমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছি, চাকরী করিয়া খাইবে বলিয়া নহে। তুমি চাকরী করিবে একথা আমার মনে করিতেও ক্লেশ হয়। কিন্তু আমি নিজে চাকরী ছাড়িয়াছি, এতকাল তোমাকে যে ভাবে রাখিয়াছি, আর সে ভাবে রাখিতে পারি, এমন সাধ্য হইবে না; তোমার কোনো অভাব দেখাও কষ্টকর হইবে। কাজেই আর তোমার চাকরী করা সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারিতেছি না। তুমি নিজের আয়ে অন্ততঃ নিজের অভাব সকল দূর করিতে পারিবে।' (৪২) তিনি এটা প্রত্যাশা করেননি যে, পরিবারের ভরণ পোষণের জন্যে কামিনীর উপার্জন দিয়ে তাঁর আয় বাড়াতে হবে। কামিনীর জীবনের আদর্শ ছিল - কিছু কাজ করার মধ্য দিয়ে জীবনকে অযথা নষ্ট হতে না দেওয়া ; অর্থাৎ অধ্যয়ন শেষে অন্তঃপুরে নিষ্কর্মা জীবন যাপনের সম্ভাবনা তাঁর কাছে নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। সরলাও তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে, তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর চাকরি গ্রহণ করার প্রশ্নে দারুণ বিরোধিতা করেন। তবে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সম্মতি প্রদান করেন। সরলা দাবি করেন যে, তাঁর পুরুষ আত্মীয়দের মতো স্বাধীন ভাবে উপার্জন করার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যেই তিনি চাকরি নেন, তবে উপর উপর অতি প্রবল সখও ছিল তাঁর। (৪৩) দেখা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বি. এ. পাস করা কন্যা শান্তা দেবীর স্কুলে চাকরি নেওয়ায় আপত্তি করেন। প্রকৃত পক্ষে, তখনো স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের ধারণা ব্যাপক ভাবে বাঙালি মহিলাদের চিন্তায় দানা বাঁধেনি এবং জনমতও ছিল এ ধারণার পরিপন্থী।

মহিলারা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হননি। যেমন – আলোকপ্রাপ্ত এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত কৃষ্ণভাবিনী দাসের মতো মহিলাও মেয়েদের অর্থনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি ইংল্যান্ড ও আমেরিকার কর্মজীবী মহিলাদের প্রশংসা করেন এবং দাবি করেন যে, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ মহিলাদের স্ত্রী - সুলভ গুণাবলী আদৌ বিনষ্ট করেনি; বরং উচ্চশিক্ষার গুণে এই মহিলাদের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে , ১৮৯২ সালে প্রকাশিত এক রচনায় তিনি স্পষ্টতই অস্বীকার করেন যে, সকল শিক্ষিত মহিলাকেই চাকরি করে জীবিকা অর্জন করতে হবে। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, উপার্জনক্ষম পুরুষ আত্মীয় নেই এমন মহিলারা যদি নিজেদের পরিবারের জন্য উপার্জন করতে পারেন তাহলে অনেক অসম্মান ও হীনতা থেকে তাঁরা বাঁচতে পারেন। শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত রাধারানি লাহিড়ীও বলেন যে, পুরুষ আর নারীর চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন , সমাজে তাঁদের ভূমিকাও ভিন্ন, তাঁরা কখনো সমান হতে পারেন না। বরঞ্চ এঁদের থেকে অনেক বেশি অগ্রবর্তী ছিলেন বেগম রোকেয়া। মেয়েদের সমস্যা সমাধানের জন্যে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন ' কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নব ত্র উপার্জন করুক।' (৪৪) আসলে সে যুগের সামাজিক পরিবেশ নারীদের পক্ষে এতটাই প্রতিকূল ছিল যে, নারীদের নিজেদের অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ উন্নতির জন্য মাঝে মধ্যেই তাঁদের এধরনের স্ববিরোধী বক্তব্য পেশ করতে হত।

আবার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, এই সময় কিছু শিক্ষিত মেয়ে স্বেচ্ছায় অবিবাহিত থাকেন। যেমন - হেমপ্রভা বসু, যামিনী সেন, লজ্জাবতী বসু, রাধারানি লাহিড়ী, সুরবালা ঘোষ, বিধুমুখী বসু, বিন্ধ্যবাসিনী বসু প্রমুখ। আবার যে সমস্ত শিক্ষিত মহিলা বিবাহ করেন, তাঁরা বেশি বয়সে বিয়ে করেন এবং তাঁদের মধ্যে আবার অনেকে বিয়ের পর চাকুরি ছেড়ে দেন, এসবের কারণ খুব স্পষ্ট নয়। যেমন - কামিনী সেন ৩০ বছর বয়সে, ইন্দিরা ২৬ বছরে, সরলা ৩৩এ, কুমুদিনী খাস্তগীর ৩২-এ, চন্দ্রমুখী ৪১ বছরে, ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র ৩৬ বছর বয়সে বিয়ে করেন। হয়তো এর কারণ এই যে, পুরুষরা তখনো বিশ্বাস করতেন যে, এই মহিলারা স্ত্রী হিসেবে যথেষ্ট নম্র ও বাধ্য হবেন না। কিংবা আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী মহিলারা এতই উদ্ধত হবেন যে, আদর্শ স্ত্রী হতে পারবেন না। তবে শিক্ষিত মহিলারা বাকি বাঙালি মহিলাদের থেকে একটা জায়গাতেই স্বতন্ত্র ছিলেন তা হল এঁরা ছিলেন কর্মজীবী । সম্ভবত এটাই তাঁদের বিবাহের ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি করত। কারণ যাই থাকুক, পরবর্তী প্রজন্ম থেকে দেখা যায়, কোনো কোনো মহিলা পরিবারের দায়িত্ব পালন সূত্রে অবিচ্ছিন্ন পেশা জীবন যাপন করেন ও অবিবাহিত থেকে যাচ্ছেন।

অবশ্য মহিলাদের চাকরি গ্রহণের বিরুদ্ধে ঐতিহ্যিক সমাজের প্রবল প্রতিকূল মনোভাব সত্ত্বেও পূর্বোক্ত কর্মজীবী মহিলাদের দৃষ্টান্ত ক্রমশ মেয়েদের পেশাভিত্তিক জীবন সম্বন্ধে উৎসাহিত করে। ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বঙ্গদেশে ১,১৫৬ জন মহিলা শিক্ষক এবং বিভিন্ন ধরনের (ডিপ্লোমা, লাইসেন্স ও সার্টিফিকেটধারী) চিকিৎসক ছিলেন। (৪৫) এই মহিলাদের মধ্যে ইউরোপীয়দের সংখ্যা কত তা জানা না গেলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, পূর্বের তুলনায়, কর্মজীবী বাঙালি মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তবে একটা বিষয় পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তখনো মহিলারা কেবল শিক্ষকতা এবং চিকিৎসক বৃত্তির মতো 'সম্মান জনক' কাজই গ্রহণ করছিলেন।

যাই হোক, এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালি মেয়েরা বহুবিধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ক্রমশ জড়িত হন এবং নিজস্ব উপার্জনের সাহায্যে অনেকে খানিকটা অর্থনৈতিক স্বয়ম্বরতা অর্জন করেন।

তথ্যপঞ্জি

১. ঊষা চক্রবর্তী - 'কন্ডিশন অফ বেঙ্গলি উইমেন অ্যারাউন্ড দ্য সেকেন্ড হাফ অফ দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ; কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৯১।

২. গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত - স্পন্দিত অন্তর্লোক ; আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা ; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ; কলকাতা ; ১৯৯৯ , পৃ. ১৫১।

৩. ঊষা চক্রবর্তী - 'কন্ডিশন অফ বেঙ্গলি উইমেন অ্যারাউন্ড দ্য সেকেন্ড হাফ অফ দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি , পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২ ।

৪. স্বপন বসু (সঙ্কলিত) - সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ; খণ্ড - ২, , ২০০৩ পৃ. ৫১৯।

৫. ঐ, পৃ. ৫১৯।

৬. বামাবোধিনী পত্রিকা ; ফাল্গুন ১২৭২ বঙ্গাব্দ ; পৃ. ২১৬।

৭. স্বপন বসু - সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ; খণ্ড - ২,পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫৮ - ৬৬২।

৮. বামাবোধিনী পত্রিকা ; জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৬ - ৫৮।

৯. স্বপন বসু - সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ; খণ্ড - ২,পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮।

১০. গোলাম মুরশিদ - নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী ; নয়া উদ্যোগ ;
কলকাতা ; ২০০১; পৃ. ৭৮।

১১. বামাবোধিনী পত্রিকা ; ভাদ্র ; ১২৯১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬৪।

১২ স্বপন বসু - সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ; খণ্ড - ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭২ - ৬৭৩।

১৩. গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত - স্পন্দিত অন্তর্লোক ; আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫।

১৪. চিত্রা দেব – অন্তঃপুরের আত্মকথা; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ; ১৯৮৪ ; পৃ. ১১০।

১৫. স্বপন বসু - সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ; খন্ড - ২,;পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৩।

১৬. ঊষা চক্রবর্তী -'কন্ডিশন অফ বেঙ্গলি উইমেন অ্যারাউন্ড দ্য সেকেন্ড হাফ অফ দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

১৭. লীলাবতী মিত্র - 'স্ত্রীলোকদিগের অর্থকরী শিল্পশিক্ষা'; চিত্তব্রত পালিত ও পূর্ণিমা মুখার্জি (সম্পাদিত) - অন্তঃপুরের আত্মপ্রকাশ ; অন্তঃপুর পত্রিকার রচনা সংকলন (১৮৯৮-১৯০৬), সুজন পাবলিকেশনস্ , কলকাতা, ২০০৫, পৃঃ ৯২ - ৯৫।

১৮. গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত - স্পন্দিত অন্তর্লোক ; আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬।

১৯. স্বপন বসু - সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ; খণ্ড – ২ ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৩।

২০. স্বপন বসু - সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের

বাঙালি সমাজ ; খণ্ড – ২ ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৫, ৬৭৭।
২১. সুপর্ণা গুপ্ত (সম্পাদিত) - ইতিহাসে নারীশিক্ষা ; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ; কলকাতা ; ২০০১, পৃ. ৫৯।
২২. গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত – স্পন্দিত অন্তর্লোক ; আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬।
২৩. স্বপন বসু - সংবাদ সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ; খণ্ড ২ ; পূর্বোক্ত, , পৃ. ৩৬৭।
২৪. ঐ, পৃ. ৩৭৫।
২৫. স্বপন বসু - সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ; খণ্ড ২ ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬।
২৬. ঊষা চক্রবর্তী -'কন্ডিশন অফ বেঙ্গলি উইমেন অ্যারাউন্ড দ্য সেকেন্ড হাফ অফ দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।
২৭. স্বপন বসু - সংবাদ সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ; খণ্ড- ২,ঐ, পৃ. ৬৯২।
২৮. 'ডাক্তার কুমারী যামিনী সেনের জীবনচরিত' - অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী (সংকলিত) কামিনী রায়ের অগ্রন্থিত গদ্যরচনা ; দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ; ২০০৫, পৃ. ৬৩।
২৯. বামাবোধিনী পত্রিকা,- শ্রাবণ, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ; পৃ. ১০৬।
৩০. জেরাল্ডিন ফোর্বস - উইমেন ইন মডার্ন ইন্ডিয়া; কেম্বিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস; নিউ ইয়র্ক, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৭ ; (প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮) ; পৃ. ১৫৭।
৩১. নীতা সেন সমর্থ - তিনশো বছরের কলকাতা ; নারীদের ভূমিকা; দেশ পত্রিকা; ১৭ মার্চ; ১৯৯০; পৃ. ৩৪ - ৩৫।
৩২. ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - বঙ্গ সাহিত্যে নারী; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; কলকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪।
৩৩. স্বপন বসু - সংবাদ সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ; খণ্ড - ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০১।
৩৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স পাদিত) - শরৎকুমারী চৌধুরানির রচনাবলী; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; কলকাতা ; ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।
৩৫. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত - বঙ্গের মহিলাকবি ; দেজ পাবলিশিং ; কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, (প্রথম প্রকাশ ১৯৩০) ; পৃ.৪৬।
৩৬. স্বপন বসু - সংবাদ সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ; খণ্ড - ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০-৬১।
৩৭. গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত – স্পন্দিত অন্তর্লোক ; আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩।
৩৮. চিত্রা দেব – অন্তঃপুরের আত্মকথা; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩-১৫৩।
৩৯. ঊষা চক্রবর্তী - 'কন্ডিশন অফ বেঙ্গলি উইমেন অ্যারাউন্ড দ্য সেকেন্ড হাফ অফ দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।
৪০. স্বপন বসু - সংবাদ সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ; খণ্ড - ২,পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২২।
৪১. ঐ পৃ. ৩৭০।
৪২. অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী (সংকলিত) - কামিনী রায়ের অগ্রন্থিত গদ্যরচনা ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।
৪৩. গোলাম মুরশিদ - নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।
৪৪. চিত্রা দেব - অ তঃপুরের আত্মকথা; পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯।
৪৫. গোলাম মুরশিদ - নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

গল্প

কাটাকুটি

কৌস্তুভ দাস

এক

দমটা আর একটু হলেই আটকে যেত! কিছুতেই নিশ্বাস নিতে পারছিলেন না অখিলেশবাবু, ভাগ্যিস তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল!

এ এক অদ্ভুত স্বপ্ন রোগে পেয়েছে হরিমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক অখিলেশবাবুকে। দুটি চোখের পাতা এক করার জো-টি নেই একেবারে। তাও দিনের বেলা অফ পিরিয়ডে বা বাড়ি ফেরার সময় ট্রেনে সিট পেলে একটু-আধটু ঢুলতে পারেন, কিন্তু রাতে যে নিশ্চিত হয়ে একটু ঘুমিয়ে বাঁচবেন, সেটি আর হচ্ছে কই!

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে মাস খানেক হল। সবে স্কুলের প্রথম পর্বের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সেদিন স্কুলে গার্জেন মিটিং ছিল, যেখানে অভিভাবকদের হাতে প্রগতি পত্র তুলে দেওয়ার রীতি আছে। সেদিনই অখিলেশবাবু প্রথমবার ঐ ভয়ংকর স্বপ্নটা দেখেন।

চারিদিকে কেমন যেন এক অদ্ভুত রকমের মসৃণ দেওয়ালওয়ালা একটা কুয়োর মতো জায়গায় আটকা পড়েছেন অখিলেশবাবু, আর উপরে আকাশ থেকে ঝর্নার মতো জল পড়ছে তীব্র বেগে। জল ক্রমশ বাড়ছে। তিনি হাঁক পাঁক করে দেওয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু এত মসৃণ আর পিছল দেওয়াল, যে কিছুতেই উঠতে পারছেন না। আর এদিকে জল বেড়েই চলেছে। হাঁটু, কোমর, বুক, গলা ছাড়িয়ে ক্রমশ ডুবজল হয়ে গেল!

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু হাত-পাগুলো কেমন যেন অসাড় ও ভারী হয়ে আসছিল! তাও প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ে চলেছিলেন অখিলেশবাবু।

জলের মধ্যে ডুবে থাকা অবস্থায় ঝর্নার জল পড়ার শব্দ যেন দামামার মতো কানে আর বুকে বাজছিল, আর মাঝে মাঝেই হাত পা ছেড়ে তলিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময়েই যেন দমটা প্রায় বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল!

ঠিক তখনই ঘুমটা ভেঙে যায়। আর অখিলেশবাবু জেগে উঠে দেখেন, তিনি নিজের ঘরের বিছানাতে শুয়ে থরথর করে কাঁপছেন, সারা শরীর ঘামে সপসপে ভিজে, বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে! সে রাতে আর ঘুম আসেনি।

শুধু সে রাতে কেন, তার পর থেকেই প্রতিটা রাত জেগে কাটাচ্ছেন অখিলেশবাবু, ঐ একই স্বপ্নের জন্য। ঘুমোলেই ঐ স্বপ্নটা আসবে! এই আশঙ্কায় আর ঘুমোতেই পারেন না।

আর তার ফলেই যা হওয়ার নয় তাই হল!

গত বারো বছরের শিক্ষকতা জীবনে যা কোনোদিন হয়নি, সেই ঘটনাই ঘটে গেল...

সেদিনও সকাল সাড়ে পাঁচটার পর কিছুক্ষণের জন্য দু-চোখের পাতা এক করেছিলেন। তারপর দু-ঘণ্টার মধ্যেই উঠে তৈরি হতে শুরু করে দিলেন রোজকার মতো।

অখিলেশ সমাদ্দার অকৃতদার। বাবা ছোটোবেলাতেই প্রয়াত হয়েছেন। মা চলে যাওয়ার পর থেকেই একা থাকেন। বাজার সারেন স্কুল থেকে ফেরার পথে স্টেশন চত্তর থেকে। আর রান্না করে খেয়েদেয়ে ঠিক সময় মতো স্কুলে পৌঁছে যান। দায়িত্ববান ও কড়া শিক্ষক হিসেবে ওঁর বেশ নামডাক আছে স্কুলে।

এ হেন অখিলেশবাবু কিনা এক হতচ্ছাড়া স্বপ্নের জন্য ক্লাস চলাকালীন ক্লাসের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন!

ছেলেগুলো বিশেষ হইচই করার সুযোগ পায়নি, কারণ সেদিন তিনি ক্লাসে সারপ্রাইজ টেস্ট নিচ্ছিলেন, সবাই মন দিয়ে অঙ্ক করছিল, ওঁর ঢুলে পড়া খেয়াল করেনি।

এমনিতেই ওঁর ক্লাসে বিশেষ দুষ্টুমি করার চেষ্টা করে না কেউ খুব একটা; আর ওঁর বড়জোর মিনিট দুই-তিন চোখটা লেগে গিয়েছিল।

পড়বি তো পড়, ঠিক ভূগোলের দেবাশিসবাবুর নজরেই পড়ল! উনি বোধহয় বাইরে বেরোচ্ছিলেন কোনো কাজে, ক্লাসের বাইরে থেকে গলা চড়িয়ে, 'একটু আসবো। স্যার?' বলে গম্ভীরভাবে ঢুকে, ছাত্রদের দু-একটা অপ্রয়াজেনীয় কথা বলে অখিলেশবাবুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে চলে গেলেন। তারপর থেকেই স্টাফরুমে ওঁকে নিয়ে আলোচনা, টীকাটিপ্পনি আর পরামর্শের সুনামি বইতে শুরু করে দিল, যা এখনো চলছে।

দুই

ছোট্টু এখন মাঝেমাঝেই বায়না করে স্কুলে যাবে না। এমনিতে পড়াশুনায় খুব একটা খারাপ নয়। বাংলা আর ইতিহাসে তো গতবারেই হায়েস্ট পেয়েছিল। শুধু অঙ্কের নাম শুনলেই কেন জানি না ওর গায়ে জ্বর আসে। এমনিতে প্রতিবারই টেনেটুনে পাস নম্বরটুকু পেয়ে যায়, কিন্তু স্কুলে না যাওয়ার বায়না এর আগে কোনোদিন করেনি এভাবে! এবছর নতুন ক্লাসে ওঠার সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই প্রায়ই এই বায়না ধরছে, মা, আজ আর স্কুলে যাব না। বাড়িতেই পড়ি না, প্লিজ!

তার ওপর প্রথম পর্বের রেজাল্ট বেরিয়েছে। অঙ্কে খুবই খারাপ করেছে। অবশ্য সেটা খুব একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারও নয়! সবাই স্কুলে বলাবলি করছিল, এবার নাকি এ এস স্যার, মানে অখিলেশ সমাদ্দার স্যার ওদের ক্লাস টিচার। উনিই প্রশ্ন করছেন, এমনই খবর ছিলো। আর এ এস স্যারের কঠিন প্রশ্ন আর সেইরকম কড়া খাতা দেখা নিয়ে ভীতি ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে প্রায় মিথের পর্যায়ে চলে গেছে!

উনি মানুষ বেশ কড়া ধাঁচের। ছাত্রদের অঙ্ক শেখাতে, যাকে বলে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেউ ক্লাসে বুঝতে না পারলে স্কুল ছুটির পরও ডেকে বুঝিয়ে দেন, কিন্তু অঙ্ক না শিখে নিস্তার নেই! আর যতই আইন করে ছাত্রদের মারধর করা বারণ হোক না কেন, অঙ্ক ভুল করে ওঁর হাতের কানমলা খায়নি, এমন ছাত্র এ স্কুলে বিরল।

এহেন এ এস স্যার এবং তাঁর অঙ্ক ক্লাসের ভয়েই বোধ হয় পরিমলবাবুর একমাত্র ছেলে পরীক্ষিৎ, ওঁদের আদরের ছোট্ট, সপ্তাহের প্রথম তিনদিন স্কুলে যেতে চায় না।

প্রথম পর্বের পরের গার্জেন মিটিংয়ে এবার বলা হয়েছিল গার্জেনদের সঙ্গে ছাত্রদেরও নিয়ে যেতে হবে। সেদিনই রেজাল্ট দেওয়ার সময় এ এস স্যার পরীক্ষিতের নামে অনেক অভিযোগ করেন। শুধু যে অঙ্কে খুব খারাপ নম্বর পেয়েছে তাই নয়, ক্লাসের নাকি সাধারণ যোগ-বিয়োগ করতেও ভীষণ ভুল করে! ক্লাসে নাকি প্রচণ্ড অমনোযোগী এবং অবাধ্য!

এই কথাটা কিন্তু ছোট্টুর মা, মানসী দেবী ঠিক হজম করতে পারেননি! এত বছর হয়ে গেল, অবাধ্যতার অভিযোগ এর আগে কেউ কোনোদিন করেননি। ওঁর আদরের ছোট্টু অঙ্কে দুর্বল, একটু খেয়ালিও আছে, কিন্তু অবাধ্য হতে তো দেখেননি কখনো!

সেদিন রাতেই ধুম জ্বর আসে ছোট্টুর। দুদিন স্কুলেও যেতে পারেনি। বাড়িতে পরিমলবাবু বা মানসী দেবী কেউই ওকে বকাবকি করেননি রেজাল্ট নিয়ে বা স্যারের অভিযোগ নিয়ে। তবু সেদিনের পর থেকেই ছোট্টু যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে! স্কুলে না যাওয়ার বায়নাটাও বেড়ে যায় সে দিনের পর থেকেই।

রাতে ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে চমকে জেগে উঠে বসে পড়ে!

তিন

ঝর ঝর করে অবিশ্রান্ত ধারার মতো জল ঝরছে, কিন্তু কোথা থেকে তা বোঝার উপায় নেই। পায়ের নিচের মাটি হারিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এখন হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে থাকার প্রবল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অখিলেশবাবু, আর ঐ আকাশ থেকে পড়তে থাকা জলের ধারা আরো পাশে চলে এলে, ছিটকে আসা জলের ফোঁটার তীব্র আঘাতে চোখ খোলা রাখাই দায়।

দম ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টায় মধ্যে একমাত্র আশার কথা, বা আশার আলো হিসেবে যা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তা হল এই মসৃণ কুয়োর উপরিতলের রোদ ঝলমলে বৃত্তাকার আকাশ। জলের স্তর যত বাড়ছে ততই মনে হচ্ছে যেন কুয়োর জল তাকে ওপরের দিকে ঠেলে তুলছে।

পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে আর ওই পিছল আর মসৃণ দেয়ালের দিকে যাওয়ার চেষ্টাই করছেন না অখিলেশবাবু। কিন্তু ও কি? ফুরিয়ে আসা দম নিয়ে যে আলোর দিকে চেয়ে কোনোরকমে ভেসে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন অখিলেশবাবু, সেই আলোকে ঢেকে দিয়ে উপর থেকে কী যেন একটা নেমে আসছে! চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

কোনোরকমে কোমর আর পায়ের চাপে মাথা তুলতে গিয়ে এক মিশমিশে কালো দেয়ালে মাথা ঠেকে গেল। সেই কুয়োর দেয়ালের মতো মসৃণ পিছল শক্ত একটা ছাদ মাথার উপর এসে বসেছে। চারিদিকে আরো কাছে সরে এসেছে আরো একটা দেয়াল। আর ওই নেমে আসা ছাদ ও অখিলেশবাবুর হাঁসফাঁস করতে থাকা নাকমুখের মধ্যে বোধহয় আর চার ইঞ্চি ফাঁক রয়েছে। হাওয়াটুকুও ফুরিয়ে গেলেই...

কিছু ভাবার আগেই হাত-পা অবশ হয়ে এল অখিলেশবাবুর। উনি গাঢ় কালো অন্ধকারের মধ্যে ভারী পাথরের মতো ডুবে যেতে থাকলেন। আর ডুবতে-ডুবতে জেগে উঠে বসলেন ঘামে ভেজা বিছানার উপর।

মাথার উপর পাখা ঘুরছে বনবন করে কিন্তু ঘরের খাটে শুয়ে ঘেমে চান করে গেছেন অখিলেশবাবু। কদিন মাঝে স্বপ্নটা আসেনি বলে গতরাতে ইউক্লিডের জ্যামিতির উপর লেখা একটা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তারপরেই আবার সেই স্বপ্ন। আরো ভয়ানক ভাবে এসে হাজির হল। বিছানায় বসে বেশ চিন্তিত লাগছিল অখিলেশবাবুকে। এতদিন স্বপ্নে হাবুডুবু খেতে খেতেও মুখের গোলাকার আলোটুকুই যেন কিছুটা শান্তির দূত হয়ে দেখা দিত। আজ তো আবার সেই জায়গায় নেমে এল গাঢ়, ভয়ানক অন্ধকার।

চার

ছুটির ঘন্টা পড়ে গেছে অনেকক্ষণ। সবাই বাড়ি চলে গেছে একে একে। অখিলেশবাবু শুধু বসে আছেন স্টাফ রুমের চেয়ারে। কিছুটা অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন বিজ্ঞানের মনোজবাবুর কথা শুনে।

একজন শিক্ষক, তাও আবার বিজ্ঞানের! তিনি কীভাবে তান্ত্রিকের বিজ্ঞাপন করতে পারেন! আবার বললেন নিজেও নাকি উপকার পেয়েছেন, এই চাকরিটাও নাকি ওই তান্ত্রিকের যজ্ঞের ফলেই পেয়েছিলেন।

আজকে ওঁর কথা শুনে অবশ্য সেটা অখিলেশবাবুরও মনে হচ্ছে। এইরকম কুসংস্কারগ্রস্ত একজন মানুষ কি আর স্বাভাবিকভাবে নিজের যোগ্যতায় বিজ্ঞানের শিক্ষক হতে পারেন? যাকগে!

অনেকে অনেক রকম কথাই বলল, তাঁর কালকের স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে। এমনিতে ব্যাপারটা সকলের গা সওয়া হয়ে গেছে। উনিও আর ইদানিং বেশ কিছু বলতেন না, জিজ্ঞাসা করলেও।

কালকের অদ্ভুত পরিণতির জন্যই স্বপ্নের কথাটা আজ বলেছিলেন দু-একজনকে। আসলাম স্যারই একমাত্র বললেন মনের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা। বাকিরা কেউ টোটকার নিদান দিলেন। কেউবা ঠাট্টা করলেন। একজন তো আবার বিয়ে করার পরামর্শও দিলেন।

যত্তসব!

'স্যার আসব?'

হঠাৎ দারোয়ান রথীনের ডাকে ভাবনার জালটা ছিঁড়ে গেল অখিলেশবাবুর।

ও কী! দারায়োনের সঙ্গে তো ক্লাস সেভেনের সেই ফাঁকিবাজ ছেলেটা!

কী যেন নাম? ও হ্যাঁ, পরীক্ষিৎ। ও আবার কী করছে এখন, এখানে!

'হ্যাঁ। বলো, কী হয়েছে?'

'স্যার, এই ছেলেটা আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে এসেছে।' দারোয়ান বলল।

'সে তো আসতেই পারে। তা তোমায় নিয়ে এল কেন?'

'না স্যার, আমায় ও আনেনি আমি দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করতে করতে আসছিলাম, লক্ষ্য করলাম ও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। জিজ্ঞাসা করতে বলল আপনি নাকি মনে মনে আঁক কষছেন, তাই ও আপনাকে ডেকে বিরক্ত করেনি।'

মুখে হাসি ফুটল অখিলেশবাবুর।

আঁকই বটে! তবে এই অঙ্ক তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন অঙ্ক, মনে হচ্ছে না নিজের চেষ্টায় মেলাতে পারবেন বলে।

‘বলো, কী বলবে! এদিকে এসো। এত জড়োসড়ো হয়ে আছ কেন? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক? তোমায় কি খেয়ে ফেলব?’

‘স্যার, একটা জিনিস বানিয়েছি। তাই সেটা ঠিক হল কিনা আপনাকে দেখাতে নিয়ে এলাম।’

‘কী বানিয়েছ?’

‘এই যে স্যার সেদিন আপনি বই থেকে দেখাচ্ছিলেন না, (a + b) হোল স্কোয়ার সূত্রটা কীভাবে বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র দিয়ে বোঝা যায়? সেটা কাগজ কেটে বানিয়েছি।’

‘তুই বানিয়েছিস এটা? দেখি! ঠিক বলছিস? তুই নিজে বানিয়েছিস?’

কাগজের টুকরোগুলো হাতে নিয়ে অবাক ও উত্তেজিত হয়ে বললেন অখিলেশবাবু।

‘হ্যাঁ, স্যার আজ শেষ পিরিয়ডে খেলা ছিল, তখন কাগজ নিয়ে খেলতে খেলতে বানাতে ইচ্ছে করল, তাই...’

‘তবে ক্লাসে ওরকম ভ্যাবলা কার্তিকের মত চেয়ে বসে থাকিস কেন? আর এত কামাই করিস কেন?’

কোনো উত্তর নেই।

‘কীরে! বল!’

‘স্যার, খুব ভয় করে যে!’

‘কাকে? আমায়?’

‘দু’জনকেই!’

‘দুজন মানে? আরেকজন আবার কে?’

‘আপনি, আর, ওই... মানে... অংক।’

রথীন জানলা দরজা বন্ধ করতে করতে অবাক হয়ে শুনছিল অখিলেশ স্যারের উদাত্ত কণ্ঠের হাসি। এ তো আর নিয়মিত শোনা যায় না!

‘আজ স্টাফ রুমের দরজাটা না হয় পরেই বন্ধ করব।’ ভাবল স্কুলের বহুদিনের দারোয়ান সবার রথীন দা।

স্যার বেশ কদিন ধরে মনমরা, আর ক্লান্ত ও লাগে। আজ ওই বাচ্চাটার সঙ্গ পেয়ে বেশ খুশি খুশি লাগছে ওঁকে।

পাঁচ

ছোট্টু ফেরার পর থেকে বাড়ি মাথায় করে রেখেছে একেবারে। মানসী দেবী খুব খুশি, আবার একটু অবাকও বটে, গত দু মাস যাবৎ হাসিখুশি ছেলেটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল! এতদিনের জমা হাসি-মজা-আনন্দ সব বোধহয় একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে, বাঁধভাঙা স্রোতের মতো।

গত সপ্তাহেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তারবাবুও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন ওর লক্ষণ দেখে। এত ছোট বাচ্চাকে ঘুমের ওষুধ দিতে চাননি। একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতেও বলেছিলেন, পরিমলবাবু তো বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। মানসী দেবী বোঝালেন যে মানসিক সমস্যা সবারই হতে পারে। আর সাইকিয়াট্রিস্ট মানে পাগলের ডাক্তার নয়। আগামীকাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া আছে, আর মধ্যেই আজ ছোট্টুর এই পরিবর্তন দেখে একটু আশাবাদী হয়ে উঠলেন মানসী দেবী। দেখা যাক আজকের রাতটা দুগ্গা দুগ্গা বলে কেমন কাটে!

‘কীরে ছোট্টু? আজ স্কুলে কী করলি?’

‘অঙ্ক, আর মজা।’ বলেই ছেলে জামা ছেড়ে সোজা মাঠে।

‘অংক! ঠিক শুনলাম তো?’ মানসী দেবী আরাে অবাক হলেন।

অঙ্কের, বিশেষ করে অংক স্যারের নাম শুনলেই কেমন যেন শুকিয়ে আমসি হয়ে যেত যে ছেলে, সে বলে কিনা অঙ্ক আর মজা!

যাক গে যা হয় ভালোর জন্যই হয়।

ছয়

‘কী অখিলেশদা? আজকে কি হল আপনার মউত কা কুঁয়া-তে?’

স্টাফ রুমে ঢুকতে না ঢুকতেই টিপ্পনী কাটল দেবাশিস। আর বাকিরা সবাই হেসে উঠল।

অখিলেশবাবু বললেন, ‘তোমার জন্যই আজ বেঁচে গেলাম, ভাই দেবাশিস।’

‘মানে?’ অবাক হয়ে বলল দেবাশিস, ‘আমি আবার কী করলাম?’

‘কাল তুমিই তো আমার স্বপ্নে এসে দড়ি নামিয়ে আমাকে বাঁচালে! তবে মুশকিল হল গিয়ে, শেষমেশ শেষ রক্ষা হল না।’

‘মানে? আপনি দড়ি ধরেও উঠতে পারলেন না?’

‘আমি তো উঠলাম, তুমি পড়ে গেলে! আর ঝনঝন শব্দে তোমার পকেট থেকে পড়ল সপ্তর্ষি মিত্রবাবু আর হীরক।

‘ঝনঝন করে পকেট থেকে পড়লাম আমরা?’ সপ্তর্ষি অবাক হয়ে বলল, ‘সে আবার কী?’

ডাস্টারটা দেয়ালে ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অখিলেশবাবু বললেন, ‘ পকেট থেকে স্টিলের চামচে পড়লে অমনই আওয়াজ হয় ভাই!’

স্টাফ রুমে আবার হাসির রোল উঠল আরেক দফা। ড্রয়িং স্যার আসলামবাবু বলে উঠলেন, ‘যাক বাবা অনেক দিন পর অখিলেশকে মুডে পাওয়া গেল। বাড়তি পাওনা হল তিন-তিনটে চামচ, তাও আবার স্টিলের!’

এই কথা শুনে আরেকদফা হাসির রোল উঠল, এবং তাতে দেবাশিস, সপ্তর্ষি ও মিত্রবাবুরাও যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন,

তবে ব্যাপারটা যে ওঁদের হজম হয়নি সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

সাত

ছুটির সময় মানসী দেবী আর পরিমলবাবু এলেন অখিলেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে, ছেলেকে নিয়ে।

'স্যার, আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব!'

'ধন্যবাদ যে আজ কে কাকে দেবে সেটাই বোঝা শক্ত।' ললেন অখিলেশ বাবু।

'ছোট্টু এখন পুরো আগের মতোই সুস্থ। কিন্তু আজ যে ওর ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সেটা কী করব?'

'নিয়ে যাবেন অবশ্যই, এবং সব কথাই বলবেন। দেখি,পারলে আমিও যাব। ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং।' বললেন অখিলেশবাবু।

'আপনার কিনা ইন্টারেস্টিং লাগছে! আমরা তো ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। আমি আর ছোট্টুর, মানে পরীক্ষিতের বাবা, দুজনেই আরশোলার ভয় পাই বটে কিন্তু তার জন্য কেউ রোজ রোজ কেন একই স্বপ্ন দেখবে?' বললেন মানসী দেবী, চানের বালতিতে কিনা আরশোলা পড়ে রয়েছে আরও কল চালিয়ে দিয়েছে, আরশোলাটা ডুবেও ডুবছে না—এই স্বপ্ন কেউ রোজ রোজ দেখবে কেন?'

পরিমলবাবু বলে উঠলেন, 'বিশেষ করে যেদিন ও জল বাড়ছে দেখে মগ দিয়ে আরশোলাটাকে চাপা দিয়ে ধরেছিল, সেদিন তো ঘুম ভেঙে উঠে কাঁপছিল থর থর করে, আর বারবার বলছিল, 'বাবা, ও মরে যাবে না তো?'

অখিলেশবাবু পরীক্ষিত কে কাছে ডেকে বললেন, 'কী? আর্কিমিডিস? কাল আর স্বপ্নটা দেখনি তো?'

'দেখেছি স্যার, না দেখলে চলত না।' পরীক্ষিত উত্তর দিল।

'সে কী?' চমকে উঠলেন মানসী দেবী, 'তুই যে বললি, সকালে উঠে সব ঠিক হয়ে গেছে!'

'সে তো ঠিক হয়েই গেছে। বালতিটা উল্টে সব জল ফেলে দিলাম, আর আরশোলাটাও উড়ে বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে।'

অখিলেশবাবু মনে মনে ভাবতে ভাবতে আবার ঘেমে উঠলেন, ভাগ্যিস উড়ে গেল! নর্দমার পাইপে ঢুকলেই হয়েছিল আর কী!

বড়ো গল্প

বটতলার বকেরা

নিবেদিতা ঘোষরায়

কিছু করার নেই কোথাও যাওয়ার নেই। একটা হতচ্ছাড়া দুপুর ভীষণ অনিচ্ছায় অনেকক্ষণ সময় নিয়ে বিকেল হল। মাঘের শেষ দিন। দুপুরটা আজ থেকেই একটা ফাল্গুন-ফাল্গুন চেহারা নিয়েছে। সেই সব হাওয়ারা ঘুরছে যারা বেকার লোকেদের উল্টোপাল্টা প্ররোচনা দিয়ে এসেছে। তিনটের পর থেকে গাছগুলো যথারীতি বদলেছে, চকচকে ফেস পাউডারের মতো অন্যরকম আলো মেখে। ঈষৎ গরম লঘু তরল। মিহি একটা ছ্যাবলা হাওয়া প্রাজ্ঞ শীতল হাওয়ার চারপাশে ইয়ার্কি মারার ভঙ্গিতে চক্কর কাটছে। যারা এসব রং বদলা-বদলি পর্যবেক্ষণ করে থাকে তাদের ডিমের ডেভিল ভাজা দেখা ছাড়া কী বা করার থাকে! মানিকতলায় অনেকক্ষণ ব্লাউজের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মধু। মাথার ওপর ডেভিলের গন্ধমাখা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে সুবর্তুল লাল সাদা গোলাপি ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার। ব্লাউজের ঘেরাটোপে অন্ধকার কোন থেকে মধুকে মাঝেমধ্যে মাপছে মাঝবয়সি দোকানদার। আশেপাশে অনেকেই অকারণে কাশছে, নাক ঝাড়ছে, লম্বা শ্বাস ছাড়ছে, আআআঃ শব্দ করে চা খাচ্ছে। মধুর উপস্থিতিই এইসব তেলখেজুরির জন্ম দিচ্ছে। মধুর অবশ্য এখন থাকার কথা শিয়ালদায়, সাকসেসের ঘুপচি দোতলায়। সাকসেস হল সরকারি চাকরির পরীক্ষায় পাশ করানোর পেষণখানা। যন্ত্রণাদান কক্ষ। সারাদিন সেখানে বেঁটে, লম্বা-চৌকো, টেকো,ক্ষয়া, বলশালী উদ্যমী সব লোকেরা নানা অঙ্গভঙ্গি করে বোঝায় সরকারি চাকরি একটা হলুদ পাকা ন্যাসপাতির ন্যায়। শুধু ছিঁড়ে নেওয়ার অপেক্ষা। কেউ কেউ বোর্ডে একটা মাছের চোখ এঁকে ফেলে গম্ভীর হয়ে যায়। মধু ভাবে তীর-ধনুক হাতে অর্জুনও আঁকবে নাকি!

এফোর্ট ওনলি এফোর্ট...

বলে হাসিমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে তারা। সবাই তাদের স্যার, ম্যাডাম বললেও এরা নিজেদের বলে মোটিভেটর। হতাশ্বাস, মন খারাপ, অন্যমনস্কতা, কান চুলকানো, ঘুম পাওয়া এসব কঠিনভাবে নিষেধ এখানে। মধু কোণের চেয়ারে বসে মোটিভেটরের গোঁপের ওপর আঁচিল দেখছিল। জিকে আর জেনারেল ইন্টেলিজেন্সের ক্লাস হচ্ছিল চারদিকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নিতান্ত সাধারণ মধুর চোখ চলে যাচ্ছিল জানলা দিয়ে।

বৈকাল হ্রদের উচ্চতা কত? চোখ ঘুরছে সবার মুখের ওপর। মধু দেখছিল বাইরে একটা দুরন্ত খরস্রোতা দুপুর

বৈকালে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। রংহীন খরখরে প্লাস্টিকের দেয়ালের উপর পল্লবী বস্ত্র বিপণীর সাইনবোর্ড। তারের জটলা। ঠিক তার ফাঁক গলে আকাশ থেকে রুচিরা তেলেভাজার মাথার ওপরকার পাঁচিলটায় ওই হাওয়াটা ল্যান্ড করল হঠাৎ, একটা ছোট্ট দমকা দুলুনি—ব্যস হয়ে গেল, মধুর মাথার মধ্যে বোমাটা দড়াম করে ফাটল। ঝুরঝুর করে আলোর ফুলঝুরি ছিটকোতে লাগল। মনসংযোগের চেষ্টাকৃত পর্দায় অগুনতি ফুটো করে বারুদের কালো খোলটা পড়ে রইল। সহজসরল কটা সাদা মিথ্যে বলে বাইরে বেরিয়ে ২৩০ নম্বর বাসে উঠে আধ ঘন্টা হল প্রায় মাথার ওপর ব্লাউজের দুলুনি নিয়ে মধু দাঁড়িয়ে আছে। জ্বলন্ত রোদে পাকা হলুদ ন্যাসপাতিটা হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে বহু দূর। কোনো ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ তাকে গ্রাস করতে দাঁড়িয়ে নেই, চাকরি না পেলেও কেউ কিছু বলবে না, কেউ জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে না, গভীর তাচ্ছিল্য পাতলা উপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বা করুণা কিছুই ছিটকে লাগবে না, শুধু নীরব জিজ্ঞাসা থাকবে। ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে দেখে ভাবে বা যাই হোক কিন্তু তার প্রোজেকশন কোথায় ভাই? আহা ভাবুক না, চিন্তাবিদদের কি দাম নেই? এই যে টুকুনের মেসো জ্ঞানপ্রসাদ বক্সি কেবল বই পড়ে, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ডেকে চা খাওয়ায়। বহু পঠনের ঋদ্ধতা বলে একটা ব্যাপার আছে ওর। কত বক্তৃতা দেয়। আধুনিকতার আলোয় ইতিহাস চর্চা, আরো নানান আলোয় নানা চর্চার বই আছে ওর। হয় পাতায়, নয় ক্যানভাসে, নয় ক্যামেরায়, আশা স্বপ্ন কল্পনা কিছু তো বেচো; আসলে দাম চাই। মাসে একবার অন্তত চেয়ারে বসে চকচকে গেরুয়া উত্তরীয় পড়ে সম্বর্ধনা, নিদেনপক্ষে একটা চটি কবিতার বই। মধু কি বেচবে? মধু শুধু দেখে হাওয়া বদল, গরম বাতাসের ঘূর্ণি সাপের মতো কুণ্ডলী পাকানো আলস্যে শুয়ে থাকা ঠান্ডা বাতাসকে কেমন ধীরে ধীরে খেয়ে নিচ্ছে। একটা কালো কুকুর আর একটা রোগা মেয়ে পাশাপাশি বসে আছে। সামনে চটের উপর ছড়ানো কয়েকটা চটি বই, হিন্দিতে লেখা 'কান্তি সাহা কি আঙ্গুর'। হলদে তেলচিটে বিবর্ণ মলাটের ওপর উচ্ছ্বাসময় হাস্যরত মেয়েদের ছবি। এত চওড়া হাসি যেন হাসতে হাসতে খিল ধরে গেছে। 'মধুচন্দ্রিমা', 'বিবসনা', 'ভালোবাসার রাত', 'সুইটি বিশ্বাসের আগুন' এই সব বই-এর মাঝখানে লাল হলুদ মলাটে দু-দিকে হাত ছড়ানো বিপুল উদর গোপাল ভাঁড়ও আছে। দেখে মনে হচ্ছে গোপালই চারপাশের মেয়েগুলোকে কন্ট্রোল করছে। সবাই হাসছে। দারুণ একটা হাস্যময় সার্কাস হচ্ছে এখানে। কারা লেখে এই বইগুলো? কোন প্রেসে ছাপা হয়? কম্পোজ করে কে? প্রুফ দেখা হয়? একসার ছাপার অক্ষর যখন, কেউ তো লেখে। আজও কি ৪৮ নম্বর বাড়ি খুঁজছ নাকি মধুরিমা? সামনের রাস্তায় জমা জল বাঁচিয়ে ছোট্ট লাফে ফুটপাতে উঠল একটা খর্বকায় শরীর। 'দাঁড়ানো অভ্যেসটা, তোমার আর গেল না, হে হে, কিছু মনে কোরো না, সেদিন দেখলাম সবেদাবাগানে গলিতে একটা মুরগির খাঁচার পাশে দাঁড়িয়েছিলে, একদিন বাস থেকে দেখলাম ওই ও ফুটে বন্ধ সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে কী দেখছ, একটা বিহারী পেয়ারাওয়ালা তোমায় দেখছে, হে হে।' মধু দিন দশেক আগের পেয়ারাটাকে মনে করতে পারল। কেউ 'কী করছ? জিজ্ঞাসা করলে মধু আজকাল বলে, দাঁড়িয়ে থাকি এবং দেখি। রানাদা অবশ্য সে পথ মাড়াল না। ভীষণ খারাপ এবড়ো খেবড়ো জানে বলেই বোধহয়।

'আপনি এখানে কী করছেন', মধু একটু বিস্ময়ের ভান করল।

'আমি এসেছিলাম একটা ডিটেকটিভ এজেন্সিতে। ওদের একটা কেস দিলাম।' খুব স্মার্টলি বাঁ-হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জি ধরে একটু নিচু গলায় বলল, 'কিছু লোক আমার পিছু নিচ্ছে।' একটু ঝুঁকে নীচু গলায় বলল, 'কিছু লোক আমার পিছু নিচ্ছে, একটু আগে আমি গীতিকার কচুরি খাচ্ছি দুটো লোক দাঁড়িয়ে পেরাকি কিনল, কাচের বাক্সের ওপর দিয়ে আমি ঠিকই দেখেছি।'

মধু গন্ধ পেল। এখানে কিছু দৃশ্য ঘটবে। কিছু কথা গজাবে। না, ডাকটিকিট জমানো মধুর হবি-টবি নয়, সে দৃশ্য জমায়। একশো আটান্নটা দৃশ্য আছে তার। মধু আগ্রহে এগিয়ে এল। 'লোকদুটো আশেপাশে আছে এখনো?' রানা চট করে চোখ ঘুরিয়ে নিল, 'উল্টো দিকে তাকাও, সাবধানে। কাঁসার বাসনের দোকানটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সাদা হাফ শার্ট ঝুপো গোঁপ, অন্যটা ক্লিন সেভ। সাদা হাফ শার্ট মনাযোগে দিয়ে বাসের নম্বর দেখছে।'

রানা বসু মাইকেলের উপর ডকুমেন্টারি বানিয়ে দিল্লিতে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। তারপর বিনোদিনী স্মৃতি বিদ্যামন্দির ভূগোলের শিক্ষিকাকে বিয়ে করে মৌরিগ্রামে একটা বিরাট বাড়ির দোতলায় থাকত। ওদের সঙ্গে থাকত নয়ন নামে এক অন্ধ বিড়াল আর তন্ত্রসাধক শাশুড়ি। বেড়ালটা সারাদিন গদি আঁটা চেয়ারে বসে থাকত। রানা তাকে জোর করে চেয়ার থেকে নামিয়ে দিত। বেড়ালটা এখানে ওখানে ধাক্কা খেয়ে যথাস্থানে ফিরতে চাইত, ফিরতে না পারার ব্যর্থতা ভূগোল শিক্ষিকাকে উত্ত্যক্ত করত। নয়নের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ছিল মারাত্মক। এরপর নয়নকে রানা একদিন ব্যস্ত রাস্তায় ছেড়ে আসে। অনবরত সেখানে সাঁৎ সাঁৎ করে ভারী ট্রাক যায়। নয়ন মন্থর পায়ে পথ চিনে চিনে আবার ফিরে আসে। রানা বেড়াল সহ্য করতে পারে না। ওরা চোর। অকর্মণ্য, আরামপ্রিয়, সুবিধেবাদী, অকৃতজ্ঞ আর বিশ্রী উদাসীন হয়। ল্যাজে পটকা ফাটানো, জলে ডুবিয়ে রাখা (নয়ন জল পছন্দ করে না) ইত্যাদি ছাড়াও একদিন তাকে দোতলার সিঁড়ি থেকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দেয়, বিড়ালটা গড়াতে গড়াতে শেষ ধাপে ছিটকে পড়েও বেঁচে যায়।

একটাই মাত্র অ্যাওয়ার্ড উইনার বেকার রানা বসুকে এরপর ও বাড়ি ছাড়তে হয়।

'আমি এখন ডিজে বুঝলে, ডিভোর্সি জামাই, শাশুড়ি ক্লায়েন্টদের সামনে আমাকে ওই নামেই পরিচয় করায়, হেহে ডিভোর্সি জামাই! যেন ময়ূরপুচ্ছ পড়া দাঁড়কাক। শাশুড়িকে ক্লায়েন্ট ধরিয়ে দিই, ব্যর্থপ্রেম, বিদ্যাস্থানে বাধা, ভূতপ্রেত, সতীনের কবল থেকে মুক্তি, বশীকরণ, সন্দেহবাতিক, যৌনদোষ সব রকম কেস আছে। নন্দিতা আবার বিয়ে করেছে। আমি ওদের মৌরি গ্রামের বাড়িতে যাই ক্লায়েন্ট নিয়ে মাঝেমধ্যে। অন্ধ বেড়ালটা ওখানে আর থাকে না। বড়ো 'দাও মারতে পারলে ভালোই কমিশন দেয় শাশুড়ি।'

'আর আপনার আগরপাড়ার ভাড়াবাড়ি? সেটার কী হল?'

'আগরপাড়ায় কোন ভাড়া বাড়ি ছিল না তো। মিথ্যে বলতাম। ডিভোর্সি ছেলেদের কোনো বাপের বাড়ি থাকে না। যেখানে গিয়ে উঠবে। আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরে কদিন রাতে ছিলাম। ঘরে বাবা একটা ছোটো বিছানায় ঘুমায়। আমি টেবিলের নিচে কিছুটা কিছুটা খাটের তলায় ভাগাভাগি করে শরীরটা গলিয়ে দিতাম রাতে। বাবা রাতে টর্চ জ্বেলে জ্বেলে বার বার বাথরুমে যেত আমাকে ডিঙিয়ে। কিডনির অসুখ। দাদা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকত, কথা বলত না। একদিন অনেক রাতে ফিরে দরজায় প্রায় এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে রইলাম। কেউ খুলল না। কলিং বেল টিপলাম, এক ঝাঁক টিয়া পাখি ডেকে গেল। দিনের বেলা নিরীহ পাখি ডাকা বেল মধ্যরাতে কী ভয়ঙ্কর! এক ঝাঁক পাখির কর্কশ ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুধু। সুর নেই। 'কথা বলতে বলতে রানাদা একটু চমকে গেল। ছোটো ছোটো হাত দুটো পেন্ডুলামের মতো ধারে দুলছিল এতক্ষণ, কথার তালে। হঠাৎ শরীরটা শক্ত হয়ে গেল। পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেট বের করল। চঞ্চল হাওয়া আড়াল করে বিড়িটা ধরাল। নিজের হাতটা ভালো করে দেখল, 'লোমগুলো সব উঠে যাচ্ছে বুঝলে, পুষ্টির অভাব। লোক দুটো কিন্তু এ-ফুটে আসছে, রাস্তা ক্রস করছে, তোমার ভূগোলের দিদিমণি অ্যাপয়েন্ট করেছে ওদের। একদিন ওরা ট্রাকের সামনে ফেলে দেবে আমায়। এখানে আর দাঁড়ানো যাবে না। চল-ও-ও। 'অ্যাথলেটিকদের মতো স্টার্ট নিল ও। শ্যামবাজারের দিক থেকে একটা দমকা হাওয়া এ। নৌকা ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে ভাসমান জেটিতে যেমন মৃদু কম্পন টের পাওয়া যায় তেমনি ঈষৎ কেঁপে মধুর প্রজেক্টর চালু হল কিরকির শব্দে। সাদা ফ্যাটফ্যাটে, ম্যাড়ম্যাড়ে পর্দায় এবার দৃশ্য আসছে। হাওয়ার মধ্যে সেই প্ররোচনাটা ছিল উদ্দেশ্যবিহীন ভবঘুরে উড়ন্ত প্লাস্টিকের। মানিকতলা থেকে গড়পাড়ের দিকে ভেসে যেতে লাগল ও রানার পেছনে।

দরজা অর্ধেক বন্ধ। ফাঁক দিয়ে নীল অন্ধকার মেশানো আলো আসছে। ঘাড় কাত করা লেটার বক্সে কাগজ সাঁটা ১৪ নম্বর পীতাম্বর ভট্টাচার্য লেন। পুরনো রংচটা দেওয়ালে বট-অশ্বত্থের ভৌতিক ছায়া। সরু চ্যাপ্টা প্যাসেজ। ডুম জ্বলছে। প্যাসেজটা ঘুরে শেষ হয়েছে সিঁড়ির কাছে। বাঁদিকে একটা জাল লাগানো দরজা। বহুকালের পুরনো কুয়ারে মতো স্যাঁতস্যাঁতে ঠান্ডা অন্ধকার। দরজার ভেতর হলদেটে আলো। অসংখ্য ওয়ারিং-এর লাইন। তার ঝুলছে বটের ঝুরির মতো। খোঁচা খোঁচা দাড়ি একটা বুড়ো লোক রিভলভিং যন্ত্রের মতো মাথাটা ধীরে ঘোরাল। চোখে নিভন্ত বিরক্তি। রানাদা বলল, 'ছাপাখানা। এখানেই সব ছাপা হয়'। বিপ্রতীপ-এর এখানে আজ একটা সাহিত্য-আড্ডা আছে। আসতাম না, শ্যামসুন্দরবাবু আসবেন বলেই আসা। শ্যামসুন্দরবাবু পত্রিকার মালিক। আমার একটা ছবি প্রোডিউস করবে বলেছে। তাছাড়া লোক দুটোকে একটু ঘোল খাওয়ানো দরকার। একটা সুবিধে আমার কোনো ঠিকানা নেই যে গিয়ে হাজির হবে হে হে।' সিঁড়ির ধাপগুলো খুব মসৃণ। রোজ মোছা হয়। মেটে লাল রঙের উপর ফুল ফুল মোজাইক নক্সা। দামি মার্বেল। দোতলায় উঠে বাঁদিকে ঘুপচি গলিতে খোলা দরজা। ভিতরে উজ্জ্বল আলো। মাথার উপর দেওয়ালে হরিণের শিং। তার তলায় আড়াআড়ি ভাবে রাখা দুটো মরচে ধরা তলোয়ার। তার নিচে একটা রোগা লোক বসে আছে। একটা দামড়া পাশ বালিশে ঠেস দিয়ে। যেন মুঘল দরবারে আকবর বসে আছে। হাতে শুধু ইতিহাস বইয়ের ছবির মতো গোলাপটা নেই। তবে একটা ডাঁসা গোঁপ আছে। লোকটা ব্যগ্র ব্যাকুল হয়ে উঠে বসল। বিছানাটা হাত দিয়ে ঝেড়ে নিল। আমরা চটপট মেঝেতে পুরু বিছানায় বসে পড়লাম। বড়বাজারের গদির মতো ব্যবস্থা। 'ইনিই বিপ্রতীপ, বইয়ের প্রকাশক, বসে পড়ো, বাকিরা এসে যাবে এক্ষুনি।' বলল রানাদা। মধু দেখল কালো পালিসের একটা পুরনো দেরাজের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা একটা তার ছেঁড়া এস্রাজ। তারের বাজনার প্রতি মধুর একরকম বিস্ময় আছে। কী অদ্ভুত কৌশলে এর থেকে সুর বের হয়!

'ওটা কে বাজায়?'

'আমার ঠাকুমা বাজাত' বিপ্রতীপ বলল। মধু রানার কানে কানে বলল, 'এখানে সাহিত্য আড্ডা হবে ব্যাপারটা কী?' রানা গম্ভীর গলায় বলল, 'বিপ্রতীপ-এর যক্ষ্মা হয়েছিল এস্রাজও বাজাতে পারে।' মধুর মনে হল রানা লোকটার বুদ্ধিভ্রংশ জাতীয় কিছু একটা আছে। অসময়ে বাইরে থেকে অন্য তথ্য জোর করে মাথায় ঢুকে পড়ে। 'আমি বলছি আজ এখানে কী হবে কি? কী বই প্রকাশ করে এরা? ওঃ বিপ্রতীপই সম্পাদক। ও-ই বলবে। এ মধু, এ জিগ্যেস করছে তোমার বইয়ের কথা।'

নিচু গলায় বেশ বক্তৃতার ঢঙে শুরু করল ভদ্রলোক।

‘আমাদের বই প্রিয় সঙ্গী। ফুটপাতে পাবেন। কোনো দোকানে ভদ্রবাড়ির কাচের আলমারিতে সাজানো অবস্থায় পাবেন না। চাহিদা অনেক ভলো। তবে ভূতল সাহিত্য নয়। প্রকাশ্যেই রমরম করে চলে। লাইব্রেরিতে কিছু বই পাবেন, যেখানে বিশেষ লাইনে দাগানো থাকে লাল কালিতে পাশে পিঁপড়ের মতো খুদে খুদে অক্ষরে অশ্লীল মন্তব্য লেখা থাকে। দাগানো বইয়ের চাহিদা আধা-ভদ্র বাড়িতে, যেখানে হরিদাসীর গুপ্তকথা থাকলেও থাকতে পারে, শোকেসে রবীন্দ্রনাথ থাকে না। আর পাবেন সদ্য গোঁফ ওঠা ওঁচাটে কিশোরদের মধ্যে। লাইনের মালরা এসব বই পড়ে না। আশপাশ দিয়ে টুকরো টাকরা ছোঁড়া মাংসের ছাঁট লোফা কুত্তা নয় এরা। তারা বাঘ। হিংস্র, ক্ষমাহীন, আগ্রাসী অবুঝ। ফুট থেকে হাতে তুলে এই পাতলা আয়তক্ষেত্রটি তারা জ্বলতে দেখতে চায়। দরকচা,আধসেদ্ধ, জটিল, বহুক্ষণ ভিজিয়ে রাখা কাঁচা চামড়ার চটির মত ভাষা তারা চায় না। চনমনে পয়সা উসুল মাল চায়। আপনি বলবেন একটা সুইচ মারলেই যেখানে স্বদেশি-বিদেশি এত জিনিসপত্র, সেখানে পুস্তকের কি ভূমিকা? আছে’, একটু কেশে নিয়ে বিপ্রতীপ অদ্ভুত মডিলিউশানে শুরু করে, ‘রিক্সাওলা ঠেলাওলা মাতাল ছোটো কারখানার কর্মী। এদের সোনাগাছিতে মাসকাবারি খাতা আছে। মুদি দোকানের মতো মাসের পয়লা থেকে ১০ তারিখের মধ্যে বাকি-বকেয়া সব ক্লিয়ার করে দিতে হয়। আমাদের খদ্দের এরা না। কারা জানেন? ধরুন, গ্রাম থেকে শহরে আসা কালো, মোটা নাক প্রত্যন্ত অঞ্চলের কথ্য ভাষার টানওলা ব্যাচেলার মাস্টারমশাই, ভাড়া বাড়ির একটেরে ঘুপচি ঘরে ক্লাশ থ্রি পর্যন্ত অঙ্ক কষায়, বিয়ের মুরাদে কবে হবে কে জানে। ‘ঘর ফাঁদলে দড়ি/বিয়ে ফাঁদলে কড়ি।’ এই দেড় ব্যাটারি মালরা হল আমাদের খদ্দের। আমাদের খদ্দের অর্থাৎ যাদের টর্চে আলো হয়, ঝাঁজ নেই। আবার খিস্তি খেউড় ও চলবে না। ঘরে রবীন্দ্রনাথের না হোক সহজপাঠ আছে। দুধের কড়ায় যখন হালকা সর পড়ে নরম হয়ে আসবে তখনই তুলে নিতে হবে। আঁচ থেকে। কড়া লালচে মাটো ছালির সর চলবে না। কিছু আছে গলার স্বর মোটা হচ্ছে, পায়ে লোম হচ্ছে, বাপের ঠ্যাঙানি খেয়ে ভাঙা গলায় চেঁচায় এইরকম কিছু স্যাম্পল মাথামোটা, তবে টিনেজার। কাস্টমাররা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে; সব শালা মোবাইলে চোখ দিয়ে বসে আছে। নব্বইয়ের দশকেও বইটই চলত। ‘বিপ্রতীপ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।’ সবাই গ্যাটের কড়ি ফেলে কিনতে পারে না। দাঁড়িয়ে পড়ার জন্য ১০ টাকা করে নেয় সেলসম্যানরা। কিছু চাম্পি এডিশনের পাতা অনেকে সেলাই করে রাখে, মানে মাগনা চাখা চলবে না। আমি ওসব সিস্টেম উঠিয়ে দিয়েছি। মাঝবয়সী কিছু আছে বুটের তলায় মুচমুচে শব্দ ভাজা পাকসিটে চেহারা একটু রোমান্টিক টাচ চায়, একটা অলৌকিক হিলহিলে আমেজ। একটু বিরহ। তাদের জন্য আমাদের গল্পের পেজ আছে। উত্তেজক দেওর-বৌদি, মাস্টার-ছাত্রী, দুপুরবেলা ভিজে ভিজে বাদলা হাওয়া ছড়াচ্ছে সিলিং ফ্যান। পর্দাটা না আধো অন্ধকার,আধো বর্ণনা আধো কাওতালি, একটু মোচড় একটু ফিচলেমি এরা ভালো খায়। দেখুন, বলে পাকা সেলসম্যানদের মত লোকটা একটা হাত তুলল, ‘মিলন ব্যাপারটা পদ্মপাতায় জল বিন্দুর মতো। ক্ষণস্থায়ী সুতরাং জিইয়ে রাখতে হবে মাটির হাঁড়িতে ভেজানো মাগুর মাছের মতো। আর একটা টাইপ আছে। সেটা ভারী দুঃখের।’ বিপ্রতীপ উদাস হয়ে রইল। শীর্ণ মুখে মস্ত গোঁপ খণ্ডত্ব-র মতো ঝুলে রইল বিষণ্ণ হয়ে, ‘বিছানা শৈত্য বোঝেন তো? এরা হল সেই দায়ে কাটা কুমড়ো। বলির কুমড়ো রান্নায় খায় না। অথচ গাছে বাহার দিয়ে ঝোলে।’

এই সময় দরজা খুলে ঢুকল পাজামা টাক মাথা একজন। একে একে ঢুকল আরো দু-জন। পেছনের জন বাঁশ পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে ঢুকে দেরাজের কোনায় ঠেস দাঁড়ায়। মরা মাছের মতো ফ্যাকাসে চোখ। চোরচোট্টা মার্কা খোঁচড়ে চুল। হাতে একটা ছোটো পিস বোর্ডের বাক্স। টেকো লোকটা বসেছে। চোখের ঔজ্বল্য বিমূঢ়তায় ঢাকা। সম্পাদক হাত তুলে বিজ্ঞাপনের ভঙ্গিতে বলে, ‘ইনি ধীরেন ধর, আমাদের গল্প বিভাগ দেখেন।’ ঠ্যাকনা দেওয়া ছেলেটাকে বিপ্রতীপ চোখ কুঁচকে মাপল, ‘এ হল কানাই কর। হে হে সবই ছদ্মনাম। মাঝে মাঝে অবশ্য উপাসনা রায় নামে লেখে। বড়োলোক ডাক্তারের মেয়ের পোঁদে লাগতে গিয়েছিল। গলিতে ডেকে এনে থাবড়া কষায়, হ্যা হ্যা। উপাসনা রায় নামে লিখে ঝাল নেয়।’ কানাই কর টালমাটাল হতে হতে বসে পড়ে লাল চোখে সবাইকে দেখে গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলল, ‘শোনো, ট্যাঁশ গরু কি গরু? আসলে পাখি সে। রঙ্গ মসকরা মারছা মার, যেদিন উড়ব তোমার ওই বন বিড়ালের মতো মালিকের ধুতির তলায় বোম রেখে যাব।’ ছেলেটা বাক্স খুলে গুছিয়ে বসল। দুটো কল্কে পাশাপাশি শোয়ানো। একটা বার করে ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে নিল। গাঁজার পুরিয়া, কাটনি, এক প্যাকেট বিড়ি,কলকে জড়ানোর সাফি, গিটটি আর কিছু নারকোল ছোবড়া বেরোল যা দিয়ে ছিলিম ধরায়, লপপা—গুলি পাকিয়ে ছিলিমের মুখে বসিয়ে টানে। এসব বুড়ো শিবতলা ঘাটে মধু অনেক দেখেছে। কানাই ভামের মতো গাল ফুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি বানাব? খোকা হিজরে, না চমনআলী!’ মধুর র‍্যাডার একটু ধাক্কা খেল। রিসিভ করতে পারল না। তাকাল রানার দিকে। তিনি নিবিষ্ট মনে হাতের কব্জি দেখছেন।

‘এসব কি কোড ল্যাঙ্গুয়েজ, না গ্রেডেশান?’ মধু বলল।

কানাই দায়িত্ব নিয়ে নিল। বলল, ‘বিড়িতে বানালে খোকা,

হিজরে হল অর্ধেক বড়ো তামাক, মধ্যে ভাজা তামাকের পাইল। চমন আলী তুরীয় অবস্থা, ভাতের ফ্যানের সঙ্গে মেরে গোলাপের পাপড়ি দিয়ে বানাই। কানাই স্পেশাল।'

বিপ্রতীপ ধমকে উঠল, 'না না, আজ ওসব ছাড়। নেনেকে ডেকে চা আনা।' নিচের ছাপাখানার বুড়োটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল জুলজুল করে কানাইয়ের সরঞ্জাম দেখছিল। বলল, 'কম্পোজ হয়ে গেছে, সমীর বলছিল একবার দেখবেন নাকি ফাইনালটা।' 'ছবিগুলো সেট করতে বলুন রাতে দেখে নেব।' বলল বিপ্রতীপ। রিভলভিং যন্ত্রের মতো ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে মধুকে দেখে চলে গেল বুড়ো। কানাই উঠে গেল, বিপ্রতীপ চেঁচিয়ে বলল, 'এই কেউ নেনে কে ওপরে পাঠা।'

'সরি দিদিমনি, আমাদের মার্চ সংখ্যাটা নিয়ে একটু আলোচনা আছে। দোল তো। কভার স্টোরিটা ঠিক মতো সাজাতে হবে। আসলে কি জানেন তো গ্রেট মাইন্ড থিংস আইডিয়া। দোল উৎসবকে একটা আইডিয়ায় ধরতে হবে। এবারে কভার স্টোরিটা হবে, হোলিতে শরীরী সম্পর্কের শুরুয়াত। বেসিকালি রং দিতে গেলে মন নয়। শরীর লাগে। কবিগুরু বলেছেন না 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল লাগলো যে দোল।' এই যে বন্ধ দরজা এটাই। অনেকে সংকোচে খুলতে পারে না আমাদের কাজ ছিটকিনিটা খুলে দেওয়া। স্ত্রীর থেকে কিছু পায় না বহুকাল, অপদার্থতা চাকার মৃত ঘোরে, ছেলে পাত্তা দেয় না মেয়ে হাসে। কোথায় যাবেন বলুন তো এরা? ওপরে স্থির ঠান্ডা মাথা, টিফিন খুলে রুটি চিবায়ে, সহকর্মীর সঙ্গে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক মারে অথচ মারাত্মক অধোচাপে ভুগছে। এরা আমাদের বই পড়ে ভালো থাকে।' যাদের জানলা দিয়ে লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার, লোলিটা, রাত ভরে বৃষ্টি ঢোকে তাদের মধু চেনে। মধ্যমানের বোধের বাইরে এঁদো ঘুপচি পর্দা খোলা কিছু জানলা আছে যা দিয়ে নর্দমার ঘোলা হাওয়া ঢোকে। এরা মধুর অচেনা ছিল।

বিপ্রতীপ খুব কর্তৃত্বের সুরে বলল, 'ধীরেনবাবু, নিন শুরু করুন।' ধীরেন ধর ঝোলা থেকে পাতলা জেমস ক্লিপ লাগানো কটা পাতা বের করলেন। মধুর দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে নিয়ে উড়ন্ত কটা চুল ধরে টাকের ওপর সাজিয়ে দিলেন যেগুলো বারবার মসৃণ তালু থেকে ছটকে যাচ্ছিল হাওয়ায়। মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিরাট কালপুরুষ। তার নক্ষত্র খচিত তরবারি অমোঘ নির্দেশে বেঁকে আছে, শব্দহীন চরাচরের মধ্যে ওই তারের জানলায় পতঙ্গ তার বিশাল আগুনের ডানা নিয়ে ঝাপটা মারছে। পায়ের নিচে মাটিতে ধস নামছে। বীণার ভেজা ডানা তির তির করে কাঁপে... 'দূর! মশাই' বিপ্রতোপ চেঁচাল। এসব কী লিখেছেন? কোন খচ্চরে পড়বে আপনার নক্ষত্রখচিত, পায়ের নিচে মাটিতে ধস নামছে, কতবার বলেছি না লিটল ম্যাগাজিনে যান ওরা পয়সা দেয় না, ওখানে ডানা কাঁপান গিয়ে। আমরা কড়কড়ে নোট দিই। হুঃ, ছুচোর গোলাম চামচিকে/তার মাইনে চৌদ্দ সিকে।'

ভদ্রলোক দাঁত বার করে বোকার মত হাসলেন। একটু কাশলেন। বললেন, 'আছে একটা, বার করব?'

'তো কি পাকিয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়ে চোঙা ফুকবেন?'

'মানে ধরতাইটা একটু অন্যরকম করে নিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকতাম আরকী।'

'আপনাকে ধীরে ঢুকতে হবে না, ফোর্সে ঢুকুন, মঞ্চে অন্ধ ভিখিরির সিন হচ্ছে না।'

ভদ্রলোক গোৎ খাওয়া ঘুড়ির শুরু করলেন, 'তারপর কমল বীণার বগলে সুড়সুড়ি দিল।' বিপ্রতীপ হাত তুলল, 'বীণা ছাড়া কি আপনি নাম পান না! সুইটি, রোজিনা, হৈমন্তী, রনিতা, তানিয়া এইসব নাম দিন।'

'ও হ্যাঁ, পরে পাল্টে দেবো খন।'

'নিন ধরুন।'

'বীণা হেসে গড়িয়ে গেল দেওয়ালের দিকে। কমলের পেশীবহুল হাতের মধ্যে বীণা পাখির মতো ছটফট করছিল। বীণার ব্রেসিয়ার উঠে এল কমলের হাতে। কমল বীণার গিট পড়া সায়ার দড়ি নিয়ে ঘেমে নেয়ে বলল, 'উফ, এই সময় যত...' দরজায় ঘন ঘন ঘা পড়ছে। মাঝরাতে পুলিশ স্টেশনে বীণার শাশুড়ি শনাক্ত করল ওরা স্বামী-স্ত্রী। কমল প্রতিজ্ঞা করল বাড়ির বিছানা ছেড়ে গেস্ট হাউসে আর না।'

'হুম, চলবে। বর্ণনাটা আরো ইলাবরেট করবেন। খসড়াটা ঠিক আছে। আমাদের এক পাতার সব গল্প বুঝলেন, উত্থান-পতন নেই, প্রথমেই ক্লাইম্যাক্স। প্লট-ফ্লট নেই তো।' ধীরেন ধর কি যেন বলি বলি করে দুবার হাঁ করল।

দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল ঢলঢলে হাফ প্যান্ট পরা ফর্সা একজন। খালি গা। পেতে চুল আঁচড়ানো। সামনের দুটো দাঁত ফোকলা। বিপ্রতীপ পার্স থেকে টাকা বার করে দিল।

'টোস আনব না কিরিম?'

'প্যাকেটের বিস্কুট আনবে।'

'পোদ পোড়ার চপ আনব? হেবি টেস। শোন না, হেগো তপন সেই থেকে পেচনে লেগেচে। ভবানী টোরসের সামনে দাঁড়িয়েচি, প্যান্ট খুলে দিচ্চে মাইরি!'

'তুমি যাও, ওকে রাতে দেখব।'

'আমার কাকা। এক সঙ্গে খেলেধুলে বড়ো হয়েছি। বনেদি বাড়িতে দু-চারটে পাগলাটে ছিটেল থাকে। দাদুর বিশাল বিজনেস ছিল। নেনের বিয়েও দিয়েছিল। বউ মরে গেল, তবে নেনে এখনো জামাইষষ্ঠীতে দর্জি পাড়ায় শ্বশুরবাড়িতে

যায় খেতে। ওরাও তাড়ায় না। আমার দুটো ছেলে এখানে থাকে না। বউয়ের সঙ্গে থাকে। টাকা পাঠাই। টিবি হয়েছিল। এক বছর কেমন পিছিয়ে গেলাম। বউ চলে গেল। বনেদি বাড়িতে অনেক ষড়যন্ত্র থাকে বুঝলেন। সম্পত্তি নিয়ে অনেক ব্যাপার। নেনে তো কিছু পায়নি। আমিও না। থাকি শুধু।'

'আচ্ছা, আপনি কোথায় থাকেন দিদিমণি?'

'আমি কোনো স্কুলে পড়াই না, আমার নাম মধুরিমা।'

'ও সরি, হেহে রানা তো নিচে নেনের সঙ্গে ছাপাখানায় শোবে। আপনি কী করবেন? মানে ইয়ে দশটা তো বাজে। বাড়ি ফিরতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, আমার অভ্যেস আছে।'

'বেশ বেশ, হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—বাজি ধরা। ভুল বাজি ধরে মানুষ সর্বস্ব হারাতে পারে মহাভারতের শিক্ষা; এবার নতুন বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে জন্মদিনের পোশাকে বাজি। এখানে তো দশ টাকার ফুচকা খাওয়ালেই চলবে না। আমরা মার্কামারা। আমরা আনন্দের খবর করি।' বিপ্রতীপ অগাধ সম্ভ্রমে চারদিকে তাকাল।

নেনে ঢুকল চায়ের কেটলি হাতে।

'খালপাড়ে বোম পড়চে। পেটো, স্বপন ওরা সব টেনে করে গুন্ডা আনিয়েছে হাওড়া থেকে। ছোটকা কালু এই এতো তার হাতে ছাটোছুটি করচে দেখে এলুম। তার বোমা! তার বোমা!'

নেনে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল যেন এক্ষুনি ফাটবে।

বিপ্রতীপ পার্স খুলে টাকা দিল।

'যাও, মোদকের দোকানে রাবড়ি কিনে খাও গে, জ্বালিয়ো না।'

'ধীরেনবাবু আপনার গত মাসের টাকাটা নিয়ে নিন।'

নেনে চলে যেতে গিয়ে ফিরে এল, বলল 'ছাতাটা নিয়ে যাব। স্বপন যদি পেটো ছোঁড়ে...' সবাই হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল।

রাত বাড়ছে ফুটফাট পটকার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। মধু উঠে পড়ল।

সবাই জনগণমন স্টাইলে দাঁড়িয়ে রইল, যেন কী এক বিশিষ্টতা তার।

মধুর প্রজেক্টার কিরকির শব্দে ঘুরে চলে। সাদা দেওয়ালে পড়ে ছায়া। হিজিবিজি অক্ষর রাশি রাশি পাতা। ঘূর্ণিময় বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায় পাতা। সাদা, নীল, গোলাপি, শ্লীল, অশ্লীল, আঠালো চ্যাটচ্যাটে সব শব্দ, দৃশ্য জড়ো হয়। একশো আটান্নটা দৃশ্য আছে ওর। উনষাট, ষাট, একষট্টি।

আধো অন্ধকার। আলো-ছায়ার জাফরিকাটা গলিপথে বড়ো রাস্তার দিকে এগোয় মধু। রানাদার ক্লায়েন্ট নেই, মৌরিগ্রাম যাবে না তাই। শ্যামসুন্দরবাবু মালিক হয়তো ওর ছবির প্রডিউসার হবে। বিপ্রতীপ বাজাত, বাজায় না। ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনার রানার কোনো ছাতা নেই। নেনে ছাতা সত্বেও কোনোদিন অজানা বোমায় আরশোলার মতো ছেতরে উল্টে যাবে। ধীরেন ধর কচ কচ শব্দে কেটে দেবে ভালো ভালো শব্দ। বার বার মামড়ি উঠে যাবে পুরনো ঘায়ের, কিন্তু সারবে না। অন্ধ নয়নের মতো পথ খুঁজে খুঁজে দূরে সরে যাবে।

পাঁচটি কবিতা

সুদীপ্ত সাহা

পিছুটান

কিছু ফেলে গেলে নাকি?
'আরও কিছুক্ষণ থাকো,
এখনও ভোর হতে বাকি।'

পুরাতন বাড়ি, বন্ধু, প্রিয়জন,
প্রেমিকার গোলাপি পত্রগুলি,
বিছানার তোশকের তলে,
মায়ের স্নেহভরা চিঠি,
প্রথম চাকরির পর স্থানান্তরে,
খোকা, ভালো খেকো...ভিন শহরে
শরীরের যত্ন নিও।'

কিছু সুখস্মৃতি মায়াবী রাতে,
নক্ষত্রের আলোর মতো দূরে,
অথচ হৃদয়ের গভীরে,
সুগন্ধী ফুলরেণু আতর,
অনুক্ষণ মাদকতা ছড়ায়।
জানি সব ফেলে
চলে যেতে হবে একদিন,
তবু মোহময় সংসার,
নাছোড় প্রেমিকার মতো
পিছু ডাকে বারংবার,
বলে,
'আরও কিছুক্ষণ থাকো,
এখনও ভোর হতে বাকি।'

অমাবস্যা রাতে

মহাকাশে নক্ষত্ররা অপলক
বহু আলোকবর্ষ দূরে।
দীপান্বিত ছায়াপথ উদ্যানে
কবি জাগরুক।
অনাদি কাল হতে
দীপমালা কে জ্বালায়?
এ প্রশ্ন কবিকে ভাবায়।

কেউ বলে আত্মা অবিনশ্বর।
কোথা হতে এলাম,
কোথায় যাব,
ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর?

বীক্ষণে, অনুভবে
অমীমাংসিত প্রশ্নের ভিড়ে
মহাবিশ্বে সৌন্দর্যের ছোঁয়ায়
অভিভূত আজন্ম বিস্ময়।
বহমান সময় নদীর তীরে,
মানবসভ্যতা অনন্ত কাল ধরে
একাই দর্শক?
না, জগতের অস্তিত্ব আপেক্ষিক
চৈতন্যের আলোয়।
চক্ষু দ্বারা বীক্ষণ,
না, চেতনাই বীক্ষণের জন্মদাত্রী,
সমৃদ্ধ সংসারে কত অপূর্ণতা,
কেন এত শোক দুঃখ কান্না,
অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তর মেলেনা।

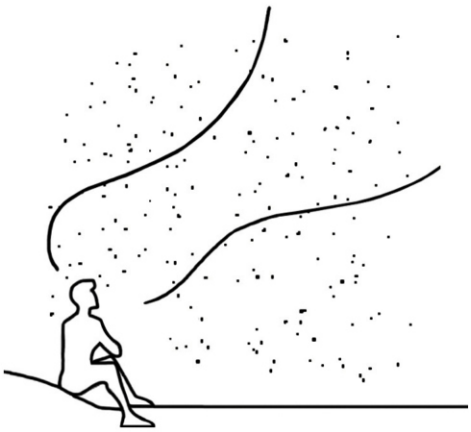

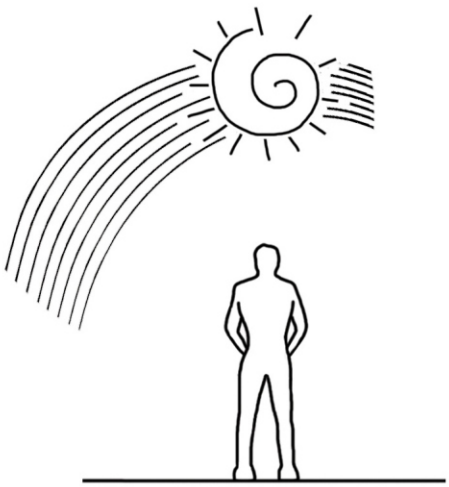

আমার কবিতা শোনো

শব্দের মালা গাঁথি কবিতায়,
ভাষায় ঝর্নার কলরোল,
কবিতা গান হয়ে
বাতাসে মেলায়,
দিগন্তে বিস্তৃত ধানক্ষেত,
কবিতার স্পর্শে হিল্লোল।

কবিতা শোনানো হয় না তাকে
অনুক্ত প্রেমের পিছুটান।
ভাষার হয় না প্রয়োজন,
ভালোবাসা যেখানে বাঙ্ময়,
দুই চোখে অব্যক্ত প্রণয়,
অনুভূতি থেকে যায় অম্লান।

কবিতা পাখি হয়ে উড়ে যায়,
গোধূলির সীমাহীন মেঘে,
বিদায়ী সূর্যের বর্ণালী,
আকাশে রামধনু এঁকে দেয়।

কান্না

বর্ষণসিক্ত রাতে
দলবদ্ধ কুকুরের কান্না
ভাষা বুঝি না, তবু পূঞ্জীভূত
ক্ষোভ, অভিমান, যন্ত্রণা
রাতের নীরবতা ভেদ করে
তারাদের উদ্বিগ্ন করে।
বর্জ্যের গাড়িতে সারাদিন
খাবারের বিফল অনুসন্ধান,
বালখিল্যের উৎপাতে
রমণসুখেও বঞ্চিত জীবন।
হয় নির্বীজ করো,
নয় সামান্য বিস্কুট, উচ্ছিষ্ট ছুঁড়ে
আমাদের ক্ষুধা মেটে না।
সভ্যতার আদিম যুগ হতে
আমরা সঙ্গী মানুষের,
বর্ষণসিক্ত শ্রাবণে
আমরা নিরাশ্রয়,ক্ষুধার্ত, অসহায়,
আমাদের বঞ্চিত কোরো না।

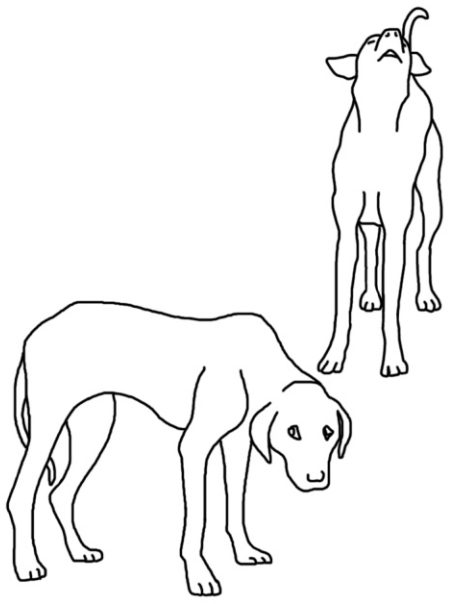

একদিন

একদিন
উদ্দাম বৃষ্টিধারা হয়ে নামব
তোমার শরীরে,
তৃষিত পাহাড়ের খাদে,
কোমল ত্বকে,
নদী হয়ে বইব গভীরে।

একদিন
অবরুদ্ধ শরীরী উত্তাপে,
হিমবাহ গলে নামবে
চড়াই উৎরাইয়ে ভরা
নির্মেদ উপত্যকায়।
নিবিড় ওষ্ঠস্পর্শে
সঘন গহন অববাহিকায়
স্থানু হবে প্রেম।

একদিন
অরুণোদয়ে
অচিন পাখির বিস্ময়ে
শুভ্রনীল আকাশের নীচে,
দেবদারু পাইন অরণ্যে
স্বচ্ছ, সুমিষ্ট জলের হ্রদ,
সৃষ্টি হবে তোমারই জন্যে।

উদ্বোধক

প্রিয়ব্রত ঠাকুর

তোমারা বলো
সীমা অতিক্রম করে
নাকি সীমানা আঁকা সম্ভব নয়।
তাই ভয় পেয়ে,
আজ সীমানা অনতিক্রমী
নব্য সমাজ সঞ্চারী হয়ে
তোমরা মোমবাতি নিয়ে
পথ হাঁটো একসাথে।

তোমাদের গোছালো ড্রয়িং রুমে,
থরে থরে সাজানো থাকে
গতানুগতিক নিয়ম বাঁধা রুচি,
নকল সামাজিকতা, অনুশাসন।
আর থাকে, সস্তায় সাবাশি খোঁজার
মিছে আত্মতৃপ্তির গরিমা;
যা চোরা ঢেকুর তোলে বদ হজমের।
আত্মিক সমাগমে
সুদৃশ্য কাচের গ্লাসে ওঠে বুদবুদ,
যে অধুনা ঝড়ের নাম দিয়েছ
তোমরা বং সংস্কৃতি।

কোনো এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায়
কাজ ফেরতা,
স্বইচ্ছায় নেব আমন্ত্রণ
তোমাদের অগোছালো মনের ঘরে;
রাখব আমার উপস্থিতির আবেশ,
সেও আরও একদিন ।
এক লহমায় টোকা দেব
তোমাদের ওই বদ্ধ মনের দ্বারে;
অবাক হয়ে দরজা খুলে বলবে,
তুমি যে, এলে বড়ো?

আমি কিছু না বলেই
তোমাদের বইমেলার তাক থেকে,
ধুলো ঝেড়ে টেনে নামাব
সাজানো রচনা সমগ্র, পুঁথি
আর কবিতার বই।
পাতা উল্টে পড়তে থাকব
এক, এক করে।
আবার আকস্মিতে রং, তুলি, ইজেল
তুলে নেব হাতে,
তারপর আঁকব তোমাদেরই
মনের স্বপ্নের জলছবি।
জমে উঠবে ধোঁয়া ওঠা কাপে
নিছক সুখ-দুঃখের আড্ডা
আমি তখন ক্ষণিক হলেও,
তোমাদের আত্মাকে স্পর্শ করে
হব পরম আত্মিক।

হঠাৎই কিছু না বলে,
এক হেঁচকা টানে তোমাদের নামিয়ে
আনব মস্ত নীল চাঁদোয়ার নিচে,
আরও এক শুঁড়িখানায়।
সেদিন বুঁদ হয়ে মনের রংয়ে,
দেখো না হয় আমার সীমানা থেকেই,
সীমা অতিক্রমে কীভাবে,
নতুন সীমানা আঁকা যায়।।

সব্যসাচী মজুমদারের কবিতা

দেহলিজ

দেহলিজ ভরে আছে মৃগধারনায়
তুমি বৃন্দবিষ দাও বিবিধ ফনায়
হুলুস্বরে বলে যাই বর্ণমালা সব
জরাসন্ধ রমণেও সরল জান্তব
কামড়ে ধরি করোজ্জ্বল। নিম বৃষ্টি নামে
একথা লিখেছি আমি অলাৎ আখ্যানে

সমাপ্তিতে উঠে দেখি সূর্যোদয় শেষ
তখন বিলের জলে রাতুল সঙ্কেশ
ভাসছে যেন বর্মহীন যুবকের দেহ
কৌম তাকে খেয়ে নিল। নম্র ঝরে মেহ,
সরমার ছিন্ন মাথা রিক্তস্রাবী জিভ—
ধ্রুবপদে বেঁধে রাখি এসব সজীব...

দেহলিজে শব্দ হয় শবদ সঞ্জয়
পরজন্ম ওষ্ঠে বলো, প্রণয় প্রণয়

মেহক

নিরুৎপাদনে বড়ো ধুম
সর্বোচ্চ কুকুরে কিছু ছলাৎ ছলাৎ করে
মেহনগলিত ব্রজ নীচে নামে
নামে দীর্ঘস্থায়ী ব্রত

নিরুৎপাদনে বড়ো ধুম লাগে
কমে যায় নেশার ওজনও

শানুতলে

শানুতলে মেঘ জমে লিবিডোমণ্ডিত
দেখি ছুটে চলে দ্রাবিড় সভ্যতা
তুরঙ্গম বেগে চলে দারুজল দারুজল
আবছায়ারাশিময় মাঠ ও শিবিরের বিকাশ
পেরিয়ে চলেছে সংগঠন

ওদিকে প্রশস্ত সমুদ্র এদিকে সারেঙের ডাক
মাঝখানে আঁকছে শিকার

আর এগিয়ে চলেছে
সোর্তেন পেরিয়ে হত্যার মেহক পেরিয়ে
উপলের দিকে

মসিহা খোয়ালে যে ইতর কখনও ফেরে না ঘরে
তার মতো বন্দেগী ফুটেছে
অন্ধের ভিতরে ভিতরে

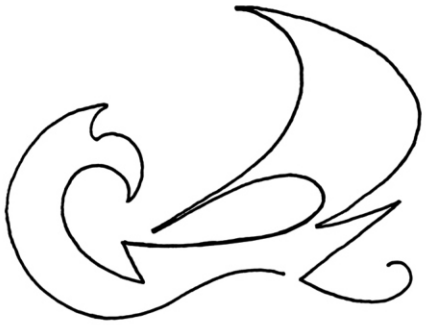

অস্ট্রালের গ্রাম

সকলই ছোবল বালক, সকলই প্রাচীন ঘ্রাণ
তুমি একে প্রচোদয়া বলে মনে করলে কী হবে !
মুদিখানা দোকানের মতো
প্রতিবিপ্লবের সমুচয়

তুমি এসবের ঘনতরু আলো চেনো
তার রেখায় রেখায় বুনো ইঁদুরের দল
তুমি নিমিত্ত সঞ্চয়ের মতো বসে আছো অস্ট্রালের গ্রামে
সেখানে একটি অপলক মাথুর তোমাকে পেয়ে
বসলে হঠাৎ করেই হেসে ওঠো সেইসব দিনের হাসি,যখন
ছিলে আদিত্য রঙের বিষাদ

তারপরেই তোমাকে আর দেখা গেল না
দু-একটা পরজন্ম এদিকে ওদিকে
ঘুরে বেড়াতে লাগল

পরোজ

যা দেখছা সব পরোজ ও মেয়েমানুষ। অথবা দৈবক যেন বৃহত্তর হাওয়া।
কিংবা ঘেমে যাওয়া গাছ। রোদ। উপমা।
কিংবা দুনিয়া চড়ানো পাখিদের সহজ ঘ্রাণ।

দূরে ইহকালীন সন্ধের চিরাগ

হাতে রয়ে গেল একটা একশো বছরের উঠান
আর একটা কুলুঙ্গির দাগ।

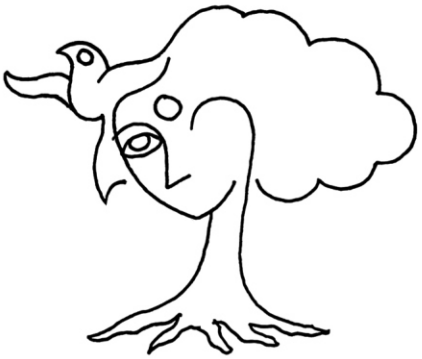

শিবিরের আলো

চিরাগাগ্নি উচ্চকিত দোয়ার শরীরে
লাগলে দপ করে জ্বলে ওঠে
প্রশিক্ষণ শিবিরের আলো

সকলে বেরিয়ে পড়ে মণিপদ্ম হুমে
আযোনির জলে ভাসে বোধিসত্ত্বরজ্বঃ

সকলেই মোছে তীরভূমির আভাস
আলগোছে ভৈরোঁ কুড়িয়ে তাঁবুমুখী হলে

দূরে ভাসে ক্রেংকার
দূরে দূরে অতল ক্রেংকার...

হেরোডোটাস

কত কিছু হয়ে গেল
কত রাত...কত নিষ্পলক...দধিকর্মা, যযাতিরা ফুরিয়ে গিয়েছে। তবু নিঝুম পাতার মতো হতে পারছে না বিস্মরণ

একটা কাঠবিড়ালিকে গিলে ফেলবে একটা গোসাপ
একটু ঘাস এমনি এমনি শুকিয়ে গেল অথচ কিছুতেই লিখতে পারলাম না মৃগদাব চাই।
কেন শরীরের সব হেরোডোটাসের ভেতর দু'হাত দিয়ে বুঝতে যাই আগুনের নীপবীথি!

তখনই ধুঁয়াপদ ঘটে। আর হাড়হিম করা জনপদ যেন আজন্ম শিকারি। দ্বিধাহীন জল থেকে উঁচু হয়ে দেখে নেয় শিকারের জননকাহিনি।

—এ লাবণ্য সংক্রমণ শেষে প্রভূত দিনেরা যায়।

অপেক্ষায় থাকি। বহুদূর বিস্তারিত এক বৃষ্টি নামবে। যার আনাচে কানাচে আর না দেখতে পাওয়ার মতো মফসসল থম ধরে আছে।
নিষ্পন্দ চরণে যাও তার পাড়ার রাস্তায়। একটা যেন গণঅভ্যুত্থান লুকিয়ে রয়েছে।

আপাতত বাজে গৌড় সারং।
দূরে পাখি ডাকতেও পারে। কেউ ঈষৎ পর্দা মেলাল...

মনখারাপ হয় এই সংক্রান্তি বিষাদে

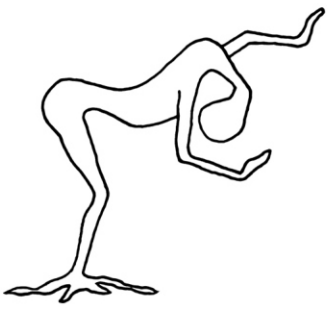

লহর

তবু চন্দ্রাতীত রঙে রয়েছি তা বোঝাতে গিয়ে যদি একটা দুটো বিমূর্তকে বলে ফেলি ভেবো না ইনকিলাব এসে গেছে।
অলৌকিক এখনও বৃন্দগান শিখুক

তোমার অভিপ্রায়েরা মুছে একটা
তোরঙ্গ কেবল থাকে। যাতে তোলা আছে তোমার মাদুলি আর ঠাকুমার লহর সমেত বেনারসি

জগমালঞ্চে তখন তুমি অপ্রত্যক্ষ বর্ণ মাত্র

শতবর্ণ

ধারা বৃষ্টি নামলে
সন্তানকে
দেখতে ভালো লাগে

পশ্চিমবাড়ির উনোন ধোঁয়ায়

একটা পাখি আর
থাকতে না পেরেই
ভিজতে নামল

আমরা
প্রত্যন্ত হয়ে দেখি
মেঘ নেই

রোদ্দুর বয়ানে পরিণত

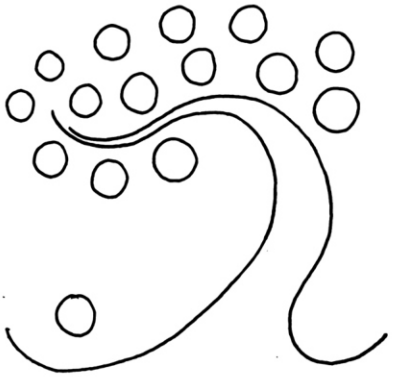

অবিরল

অবিরল পতঙ্গের মতো
বিকেল অনেক যায়
ন্যূন হয়ে থাকে কদম পাতারা

একটা স্থির খসে গেল

সন্তর্পণে ভাবি, এখুনি কী বিড়ালি আসবে?

বুঝতে পারি না এসব যতক্ষণে
খসে পড়ে আর একটু মোনাজাত

সন্ধে এগিয়েছে শামুকের দিকে

চোখে দেখতে পাই না তখন
ঝিঁঝিঁ ডাকে শাঁখ বেজে ওঠে

দেশভাগের কবিতা

মলয় রায়চৌধুরী

কে একজন ঝুলছে

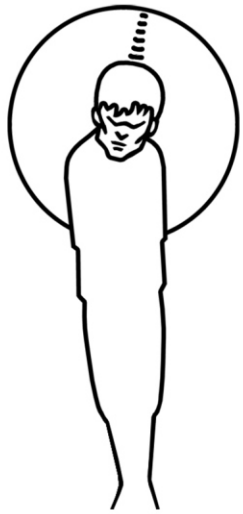

মেজদা বলল, ‘চল চল দেখে আসি, টিনের কারখানায় ঝুলে-ঝুলে
পাক খাচ্ছে কেউ।’ দৌড়োলুম, ম্যাজিক দেখবো ভেবে—
ক্যানেস্তারা কেটে টিনগুলো কাঠের হাতুড়ি পিটে সোজা করে।
অত উঁচুতে কেমন করে চড়েছিল ধুতিশার্ট পরা রোগাটে লোকটা ?
চশমা রয়েছে চোখে ! ভালো করে দেখে বললুম, ‘মেজদা
ইনি তো আমাদের ক্লাসের অরবিন্দর বাবা; ওরা দেশভাগে
পালিয়ে এসেছিল ফরিদপুর থেকে, সেখানে ইশকুলে পড়াতেন,
কিন্তু সার্টিফিকেট-টিকেট ফেলে জ্বলন্ত ঘর-দালান ছেড়ে
চলে এসেছেন বলে কোথাও পাননি কাজ, শেষে এই টিনের
শব্দ প্রতিদিন বলেছে ওনাকে, কী লজ্জা, কী লজ্জা, ছিছি...”
কিন্তু অতটা ওপরে উঠলেন কেমন করে ! টিনবাঁধার দড়ি খুলে
গলায় ফাঁস বেঁধে ঝুলছেন এখন, পাকও খাচ্ছেন, একবার বাঁদিকে
হি...ন..দু...স...তা...ন...আরেকবার ডানদিকে... পা...কি...স...তা...ন

পাটনার রাস্তায় আমার মা

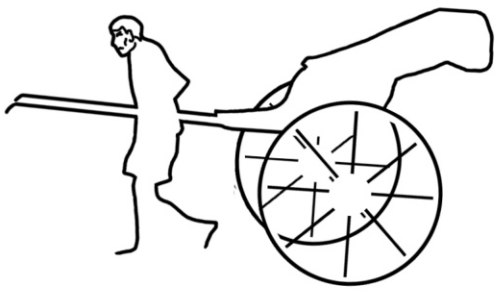

‘আরে, রিকশঅলাটা যে বাংলায় কথা বলছে’
মা অবাক হয়ে বলে উঠলেন,
রিকশঅলাকে জিগ্যেস করলেন
‘তুম বাংলা কহাঁসে সিখে ?’
রোগা প্যাংলা লোকটা বলল
‘মা, আমি বাঙালি, মোতিহারি ক্যাম্প থিকা পলায়া আসতেসি।’
মাকে বললুম, ‘দেশভাগে যে উদ্বাস্তুরা এসেছে তাদের মধ্যে
নমঃশুদ্রদের মোতিহারি ক্যাম্পে রাখা হয়েছে।’
মায়ের কান্না পেয়ে গেল। বললেন,
‘কখনও ভাবিনি বাঙালিরা রিকশা চালাবে !’

রূপকথার একশো বছর

কেউ কি ভেবেছিল কখনও 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে বাংলাভাষী একজন নেমে আসবে রূপকথা থেকে? অখ্যাত কবির রোমকূপে হর্ষের ঝড় তুলে আত্মাভিমানকে তার অনন্তকালের আলো দেবে! হ্যাঁ, মুজিব বঙ্গবন্ধু অখ্যাত বাংলাভাষী আমি ও আমার পিতা, আমার বংশধরেরা, চিরকাল বেঁচে থাকবে আপনার ধ্বনি-দেয়া মর্ত্যলোকের অভূতপূর্ব বিস্ময়ে। কেবল আমার বাংশধরেরা নয়, আমার মতন আরো কোটি-কোটি ভাষাসন্তানেরা বেঁচে থাকবে আপনার অমরত্বে, পৃথিবীর যেখানে থাকুক তারা, তাদের প্রতিটি উচ্চারণে আপনার নায়কোচিত আত্মবলিদান সেইসব যুবকের হাতে যারা নিজেরই মায়ের ভাষা বর্জনীয় ভেবে রূপকথা-বর্ণিত রাক্ষসপুত্রের ভূমিকায় দানবের দেয়া স্বর্ণের বিনিময়ে ভাবল আপনাকে ও আপনার বাড়ির লোকেদের গুলিবিদ্ধ করলেই মৌন হয়ে যাবে জয়ধ্বনি। হয়নি যে তা তো তারা এবং তাদের দোসরেরা জীবৎকালেই জেনে গেছে। বাংলাভাষা তো ঘাসের মতন কখনও শুকায় না; জঙ্গলে আগুন লেগে অলিভ-পোশাক-পরা গাছ ছাই হয়, কিন্তু সে-আগুন নিভে গেলে ঘাসেরা আবার আসে ফিরে— যেমনই সে ঘাসেরা হোক, ছোটো-বড়ো-গরিব-বৈভবশালী, দ্রুত ছোটে তারা জয়ধ্বনি দিতে-দিতে পৃথিবীর ভিজে বা শুকনো মাটিতে— জানে ওই সবুজ ঘাসেরা আপনার পায়ের ধূলিকণা তাদের অমরত্ব দিয়ে গেছে। যতদিন পৃথিবীতে রয়েছে বাংলাভাষী আপনি আছেন রক্তে সেই সব মানুষের পূর্বপুরুষ হয়ে, আদিবন্ধু বঙ্গভাষী হয়ে

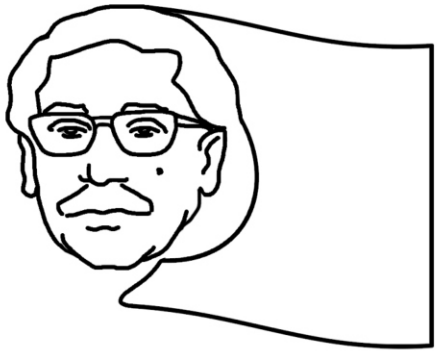

নভেলা

অসম্পূর্ণ প্রেম

প্রণব দত্ত

কাহিনি

‘ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০২ ধারায় আসামী জাহানারাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।’ এজলাসে পিন পড়ার শব্দ শোনা যায় না এমন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিচারকের বজ্রগম্ভীর নির্দেশ গমগম করতে লাগল সারা ঘরে। ঘর ভর্তি দর্শক নির্বাক।

চিৎকার করে উঠল জাহানারা, এ আপনার কেমন বিচার হুজুর। আপনি আমায় ফাঁসি দেন। আমি আর বাঁচতে চাই না। বলতে বলতে কোর্টের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় জাহানারা।

বয়স তিরিশের মতো। স্বামী চাষ করার সময় খেতে সাপের কামড়ে মারা গেছে, তা ঐ বছর দুয়েক হল। সম্বল বলতে বিঘাখানেক জমি। ঐ জমিতেই গতর খাটিয়ে যা ফসল ফলাত জাহানারা আর তার একমাত্র মেয়ে সাবিনার চলে যেত।

জোয়ান বউ জাহানারা, আবার স্বামী মারা গেছে। গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যে অনেকেই আড়ালে আবডালে কুপ্রস্তাব যে দিত না তা নয়, তবে জাহানারা শক্ত ধাতের মহিলা। কাউকে ধারেকাছে ঘেঁসতে দিত না। ঐ তো সেদিন মহিউদ্দিন ভালো মানুষের মতো ঘরের দাওয়ায় বসে একথা-সেকথার পর শুরু করল, তুই একা একা থাকিস, দুষ্টুলোকের কথা তো বলা যায় না, আর তো বয়সও তো বেশি না। এই বয়সে একা একা থাকা কী ভালো দেখায়!

জাহানারা উনুনে হাওয়া দিতে দিতে বলে, তা আমাকে কী করতে হবে বলেন!

না, কইছিলাম কী... বলতে বলতে জাহানারা দিকে এগিয়ে যায় মহিউদ্দিন। আমতা আমতা করে বলে, আমি যতদিন আছি তোর কোনো বিপদ নাই।

কেমনে? জাহানারা শুধায়।

দ্যাখ, আমার তো কোনো অভাব নাই। দুইটা পেট বাড়লেই বা কী হয়? তুই আমার বাড়িতে গিয়াই থাক না কেন।

জাহানারা বৃদ্ধ মহিউদ্দিনের মুখের দিকে তাকায়, ঐ চাউনিতেই মহিউদ্দিন ঢোঁক গিলে বলে, ঠিক আছে ঠিক আছে, তোর যাবার দরকার নাই। আমিই না হয় তোর বাড়িতে আসব। একটু সেবা-যত্ন করবি। আর তোর যা দরকার সব আমি দেব। তোর আর জমিতে চাষবাস করার দরকার নাই। বল, তোর কী দরকার?

জাহানারা উনুনের আগুনটা উস্কে দিয়ে বলে, দরকার তো আমার অনেক কিছুই, তবে এখন খুব দরকার একটা ধারালো আঁশবটি।

মহিউদ্দিন চমকে ওঠে, তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, তোর বড্ড বাড় বেড়েছে। এই বাড় আমি কী করে ভাঙি দেখবি। বলে হনহন করে যেখান দিয়ে এসেছিল সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দাওয়ায় বসে মেয়েটা একমনে সেলেটে কী যেন লিখে চলেছে। রান্না থেকে উঠে এসে মেয়ের পাশে বসে। জড়িয়ে ধরে মেয়েকে। এই সাবিনাই তার চোখের মণি। মাঝে মাঝে ভয়ে আঁতকে ওঠে জাহানারা। মেয়ে যত বড়ো হয় তার ভয় আরো বাড়ে। গরিবের ঘরে সুন্দরী মেয়ে যে অভিশাপ এই সত্যটা অশিক্ষিত হলেও জাহানারার জানা আছে। সে চাইত তার মেয়ে যেন তার মতো অশিক্ষিত না হয়। তাই তো স্বামীর আপত্তি সত্ত্বেও মেয়েকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। জাহানারা এখনও বুঝতে পারে না, সাবিনার পড়াশুনায় এত মন কী করে হল। তার বয়স সবে এগারো। জাহানারা সাবিনাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মারে, তোকে তো এবার বিয়ে দিতে হবে।

সাবিনা মার হাত ছাড়িয়ে বলে, এটা তুমি কী বলছ আম্মা! আমি পড়াশুনা করছি, স্কুল পাশ করে কলেজে পড়ব, তারপর স্কলের দিদিমনি হব। দেখছ না স্কুলে কোনো মেয়েছেলে দিদিমণি নেই বলে গ্রামের লোকেরা তাদের মেয়েদের ইস্কুলে পাঠায় না। আমি দিদিমনি হলে সেই সব মেয়েরা স্কুলে যাবে।

ঐটুকু মেয়ের মুখে এই কথা শুনে জাহানারার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

কোনো উত্তর দিতে পারে না জাহানারা।

কিন্তু সাবিনার কথার দাম কে দেয়! একের পর এক বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে। গ্রামের বয়স্ক মহিলারা পর্যন্ত বলে, এত বয়স হল এখনও বিয়ে হল না! মেয়েদের আবার পড়াশুনা! ঐসব ছেলেদের ব্যাপার। আর পড়াশুনা-টড়াশুনা নয়, এবার বিয়ে দিয়ে দে জাহানারা। আমাদের বিয়েও তো ওর থেকে ছোটো বয়সে হয়েছিল।

না চাচি, আমাদের সময় আর এখন কি এক হল!

রাখ তোর সময়। মেয়েদের আবার সময় কিরে!

গ্রামের মানুষদের চাপে জাহানারা তার মেয়ের বিয়ে ঠিক করে পাশের গ্রামের কুতুব মিঞার ছেলে রহমতের সঙ্গে। রহমতের বয়স আঠাশ। ধনী, আগে নিকা করেছিল, অধুনা তাকে তালাক দিয়েছে।

সাবিনা সবে বারো বছর, ক্লাস সেভেনে পড়ে। বিয়ের কথাশুনে মাকে বলে, আমি কিছুতেই বিয়ে করব না।

জাহানারা তাকে অনেক বোঝায় এবং বলে যে সে নিরুপায়। গ্রামে থাকতে গেলে এটা মেনে নিতেই হবে।

মানতে পারে না সাবিনা।

সবাই যখন বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত সাবিনা সবাইকে এড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। মাঠের আল ধরে দৌড়তে থাকে। দৌড়তে দৌড়তে পৌঁছে যায় থানায়। একটা বাচ্চা মেয়েকে হাঁপাতে হাঁপাতে থানায় ঢুকতে দেখে পুলিশ অফিসাররা জিজ্ঞাসা করেন কী ব্যাপার?

সাবিনা বলে, আমায় বড়োবাবুর ঘরটা কোথায় বলো।

বাইরে কথাবার্তা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বড়োবাবু। নামেই বড়বাবু। নাম সুকান্ত মণ্ডল। বয়স বড়জোর তিরিশ কি বত্রিশ। স্বভাবের বাইরে গিয়ে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে, তোর কী হয়েছে?

সাবিনা একটু থেমে বলে, ওরা আমাকে জোর করে নিকাহ করাচ্ছে। বড়োবাবু, আমি নিকা করতে চাই না। আমি পড়াশুনা করতে চাই।

বুঝতে পেরেছি। জোর করে একটা বেআইনি কাজ করা হচ্ছে। রমেনবাবু, মেয়েটার বয়স তো খুবই কম মনে হচ্ছে। এই, তোর বয়স কত? কোন ক্লাসে পড়িস।

আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি।

রমেনবাবু গাড়িটা বের করতে বলেন তো! দেখি কি ব্যাপার চলছে।

বড়োবাবু ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই সবাই এদিক-ওদিক সরে যায়। গাড়ির ভেতর গুটিশুটি মেরে বসেছিল সাবিনা। বড়োবাবু তার কনস্টেবলকে দিয়ে সাবিনার মাকে ডেকে বললেন, এটা কিন্তু আপনার ঠিক করছেন না। আপনার মেয়ে বাচ্চা, ওর এই বয়সে বিয়ে দেওয়া আইনত অপরাধ। জাহানারা চুপ করে থাকে।

এদিকে বারাত নিয়ে আসা বরপক্ষ যথেষ্ট উত্তেজিত। বর বাবাজি তো তেতে আগুন। বিবি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার রাগে গরগর করছে। ইতিমধ্যে বড়োবাবু বলে দিয়েছেন যদি এই নিকা নিয়ে আর কেউ কিছু বলে তার ঠিকানা হবে জেলখানা। জেলখানায় সবার ভয়। কীর্তিমান হবু জামাইটি যে সবে জেল থেকে বেরিয়েছে সেটা তো জাহানারার জানা নাই। হতাশ হয়ে

রাগে গজগজ করতে করতে সে বলে যায়, আপনার মেয়েকে দেখে নিব, কী করে ও রাস্তায় বের হয় দেখব। পুলিশে কমপ্লেন!

অতিথিরা রণে ভঙ্গ দিয়ে যে যার ঘরে ফিরে যায়। সাবিনা আস্তে আস্তে মায়ের গা ঘেঁষে বসে।

আম্মা, তুমি খুব রেগে গেছ, না?

জাহানার মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, তুই কেন এই কাজ করলি! এরপর তোর নিকা কেমন করে দেব? ওরা খুব থ্রেট করে গেছে।

আম্মা, তোমার মতো সাহসী এতে ভয় পেয়ে গেল?

না, আমি ভয় পাই না, তবে তোর কিছু হয়ে গেলে আমি থাকতে পারব না।

মাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে সাবিনা বলে, আম্মা, তুমিই তো বলেছ আমায় লেখাপড়া শিখে বড়ো হতে।

তা বলেছি, তাও বলছি তুই এখন বুঝবি না। সংসারটা বড়ো নিষ্ঠুর। তোর বা আমার চিন্তাভাবনায় সমাজ চলে না।

কয়েকদিন পরে স্কুলে যায় সাবিনা। বন্ধুরা ঘিরে ধরে।

কিরে তুই নাকি তোর বিয়ে ভেঙে দিয়েছিস।

কোনো উত্তর দেয় না সাবিনা। এমনি করেই দিন যায়। আস্তে আস্তে সাবিনা স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে যায়।

সাবিনা বুঝতে পারে সে যত লেখাপড়া করার জন্য এগিয়ে যাবে, গ্রামে তত বেশি শত্রুর সংখ্যা বাড়তে থাকবে। গ্রামের প্রায় সব বন্ধুরই বিয়ে-থা হয়ে গেছে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে বইতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকেও। তাকে পড়াশুনা করে স্কুলের শিক্ষিকা হতেই হবে। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের পাশে থেকে মাকে সাহায্য করার কাজটাও করে চলে সে।

মাঝে মাঝে দারোগাবাবু বাড়িতে এসে খোঁজ নিয়ে যান। কিরে সাবিনা পড়াশুনা ঠিকমতো হচ্ছে তো?

সাবিনা বলে, হ্যাঁ দাদা।

থানার বড়বাবু কখন যে দাদা হয়ে গেছে তাও সে জানে না।

তবে এই ব্যাপারটার জন্য সাবিনার একটু সাহায্যও হয়েছে। গ্রামের লোভী লোকগুলো আড়ালে-আবডালে কিছু বললেও প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস পায় না।

সাবিনা কলেজে ভর্তি হল। তার গ্রাম থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে। সরকার থেকে পাওয়া সাইকেলে চড়ে প্রতিদিন সে কলেজে যেত।

জাহানারারও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে নানা উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। সবসময় শরীর ভালো যায় না। ক্লান্ত লাগে। সাবিনা মায়ের পাশে বসে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, আম্মি আর কটা দিন, আমি ঠিক একটা চাকরি পেয়ে যাব। তোমাকে আর কোনো কাজ করতে হবে না। জাহানারা মেয়ের হাতটা চেপে বলে, বেটি, আমি না থাকলে তোর কী হবে? এসব কী কথা! মাকে থামিয়ে দেয় সাবিনা। আমার মা চিরদিন থাকবে দেখে নিও। পাগলি কোথাকার—মা তার গালে টোকা মেরে বলে।

জানো মা, আমাদের স্যার বলেছেন আমার পরীক্ষা নাকি খুব ভালো হয়েছে।

মা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কী হল? কী দেখছ?

না, আমার ছোট্ট মেয়েটা এত বড়ো হয়ে গেল। আমি তো লেখাপড়া কিছুই জানি না। আমার মেয়ে লেখাপড়া শিখবে এটা আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

ঠিক আছে, ঠিক আছে এখন অনেক রাত হয়েছে খেতে দেব চলো। আমার অনেক পড়া বাকি আছে।

তুই যে বললি তোর পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে। তবে আবার পড়া কেন?

মা, পড়ার কি শেষ আছে? আগের পরীক্ষাটা ভালো হয়েছে। সামনে তো আরো পরীক্ষা।

এমনি করেই মা মেয়ের দিন কেটে যায়। অভাবের সংসার ঠিকমতো শাড়িটাও কিনে দিতে পারে না মেয়েকে। দুটো শাড়িই পালা করে পড়ে যায়।

কলেজ থেকে ফেরার পথে মাঝে মাঝেই পাড়ার মোড়ে যে শিবমন্দিরটা আছে তার চাতালে গিয়ে বসে। ওখানে বসলেই ওর মনটা কেমন যেন শান্তিতে ভরে যায়। তার ওপর মন্দিরের যে প্রধান পুরোহিত ভটচাজ দাদু, তাঁর প্রশ্রয়টাও ওখানে নিয়মিত যাবার একটা বাহানা। মাঝে মাঝেই বলত, দাদু, তুমি যখন পূজার মন্ত্র বলো তখন তোমাকে কেমন যেন মানুষ মনে হয় না।

ভটচাজ একটু হেসে বলে, তবে কি মনে হয় রে সাবি? রাক্ষস না খোক্কস?

সাবিনা কপট রাগ দেখিয়ে বলে, যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলব না। আসলে তোমাকে না ঠিক কোনো দেবদূত বলে মনে হয়।

হো হো করে হেসে ওঠে ভটচাজদাদু।

দেবদূত? কি যে বলিস! না যমদূত?

কখনোই না, তোমাকে যমদূত ছুঁতেও পারবে না।

নে আর কথা বাড়াস না। এতটা রাস্তা হেঁটে এলি, পেটে নিশ্চয়ই একটা দানাও পড়েনি।

চুপ করে থাকে সাবিনা।

একটা শালপাতায় কয়েকটা ফলের টুকরো আর দুটো সন্দেশ এনে সাবিনার হাতে দেন ভটচাজ মশাই।

নে, এটা খেয়ে নেতো। এত পড়াশুনো করছিস গায়ে একটু

জোর রাখতে হবে না!

একটু থেমে ভটচাজ মশাই সাবিনাকে শুধান, সাবি, তুই যে রোজ এখানে আসিস, তোদের মহল্লায় কেউ কিছু বলে না?

আকাশ থেকে পড়ার মতো মুখভঙ্গি করে সাবিনা, কেন?

না না, আমার কানে মাঝে মাঝে কিছু কথা আসে।

কী কথা? আমার ব্যাপারে!

হ্যাঁ, তুই তো জানিস আমি এই মন্দিরের পূজারী। ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। আর এখানে যারা পুজো দিতে আসে তারা ধর্মের দিক দিয়ে হিন্দু।

ও, আমি তো মুসলমান। আর মুসলমান হয়ে কেন আমি এই মন্দিরে আসি, তাই তো?

ওরে পাগলি, একদম তা-ই। তোর কত বুদ্ধি!

দেখো দাদু, আমি তো ধর্মটর্ম জানি না। আমি শুধু তোমাকে জানি। দাদু নাতনির সম্পর্ক কোনো দিন ধর্ম দিয়ে বিচার করা যায়?

নির্বাক দৃষ্টিতে সাবিনার দিকে তাকিয়ে থাকেন ভটচার্য মশাই।

সাবধানে বাড়ি যাস। আহা এই ফুলের মতো ছোট্ট মেয়েটা যদি সত্যিকারের তাঁর নাতনী হত!

বাড়ির দিকে পা বাড়ায় সাবিনা। রাস্তায় ইমামচাচার সঙ্গে দেখা, কিরে সবিনা, কলেজ থিকা ফিরতাসো?

হ্যাঁ চাচা। তোমার শরীর কেমন? তোমার নাকি জ্বর হয়েছিল?

হ্যাঁ ঐ একটু গাটা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করতাছিল।

একটু সাবধানে থাকো চাচা। কিছু ওষুধ খেয়েছ?

হ্যাঁ ঐ মতলব সাহেবের হাকিমখানা থিকা ওষুধ আনাইয়া খাইছি।

তোমাদের ঐ দোষ। তোমরা ঠিকমতো ওষুধ খাবে না। গা ম্যাজ ম্যাজ করছে? ঠিক আছে, দোকান থেকে ওষুধ এনে দেব। দ্যাখো চাচা, তোমার বয়স হয়েছে। এখন তো ঠিকমতো চলতে হবে।

আরে বেটি তোর সব দিকে নজর। তবে একটা কথা তোরে চুপি চুপি কই, তুই ঐ মন্দিরের দিকে বেশি যাইস না। তুই মুসলমানের বেটি, তোর কি দরকার ঐ মন্দিরে যাওয়ার!

চুপ করে থাকে সাবিনা। তার পরে আস্তে আস্তে শুধায়, কেন চাচা?

ইমামচাচা সাবিনার মাথায় হাত দিয়ে বলে, সময়কাল ভালো না রে। এই মহল্লায় অনেকেই এই ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখে না।

বুঝতে পারে সাবিনা ভটচার্য দাদু কেন ঐ কথা বলেছিল।

সাবিনা বুদ্ধিমতী মেয়ে। চাচা, আমি তো মন্দিরে পূজা দিতে যাই না। আমি আমার দাদুর কাছে যাই। দাদু আমাকে খুব ভালোবাসে, তাই আমার ঐখানে যেতে ভালো লাগে।

সব বুঝিরে সাবিনা, আমি তো অবুঝ নই। কিন্তু সব মানুষ তো এক না। আমার কানে আসে নানারকম কথা। একটু সাবধানে চলাফেরা করিস। এই কথা বলে ইমামচাচা মস্‌জিদের দিকে পা বাড়ায়।

সাবিনা বাড়ি যেতে যেতে চিন্তা করতে থাকে ভটচার্য দাদুও বলল সাবধানে থাকতে আর ইমাম চাচাও একই কথা কেন বলল।

চিন্তা করতে করতে বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। ফিরতে দেরি দেখে জাহানারা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

কীরে এত দেরি?

না, ফেরার পথে মন্দিরে গিয়েছিলাম। তারপর রাস্তায় ইমামচাচার সঙ্গে দেখা তাই একটু দেরি হয়ে গেল।

ও তাই! তুই যতক্ষণ ঘরে না ফিরিস আমার যে কী চিন্তা হয় তুই বুঝবি না। নে তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় ছেড়েনে। মুড়ি-বাদাম রাখা আছে খেয়ে নে।

না মা, আমার খিদে নেই। দাদুর ওখান থেকে অনেকটা প্রসাদ খেয়ে এসেছি।

ও, তাহলে ঠিক আছে। একটু বিশ্রাম নে। ততক্ষণে আমি রাতের খাবারের ব্যবস্থা করি।

আর কিছু না বলে সাবিনা খরের ভিতর চলে যায়। হাত-মুখ ধুয়ে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে। ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের করে, আলতোভাবে নিজের কাপড়ে মুছে নেয়। এই মোবাইলটা ওকে থানার পুলিশদাদা দিয়েছিল। যেবার মাধ্যমিক পাশ করল ফার্স্ট ডিভিশনে, পুলিশদাদা খুশি হয়ে এই মোবাইলটা উপহার দিয়েছিল। বলেছিল, দেখ সাবিনা, এই মোবাইলটা শুধু একটা উপহার নয়; এর মধ্যে দিয়ে সারা পৃথিবীকে তুমি তোমার হাতের মুঠোয় পেতে পারো।

দাদার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছে সাবিনা। পড়াশুনা ছাড়া অন্য কোনো কাজে ঐ মোবাইল ব্যবহার করার কথা ভাবতেও পারে না সে।

কিন্তু কয়েকদিন ধরে একটা নম্বর থেকে বার বার ফোন আসছিল। নম্বরটা অচেনা। নিজের মনকে প্রশ্ন করে, এই লোকটা নাম্বারটা পেল কোথা থেকে? একদিন বিরক্ত হয়ে ফোনটা ধরে সে।

কে ফোন করছেন! এই নম্বরটা কোথা থেকে পেলেন? বার বার ফোন করছেন কেন?

আরে বাবা একটু নিঃশ্বাস নিতে দিন। আমি বার বার আপনাকে ফোন করছি, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন, সেই জন্য প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার নাম নবারুণ চক্রবর্তী। আপনার কলেজেই ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট। বন্ধুদের কাছে আপনার বিষয়ে শুনে আলাপ করার ইচ্ছে হল। অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়েও পড়াশুনায় যে এত ভালো ফল করতে পারে তার সঙ্গে আলাপ করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

আপনি আমার মোবাইল নম্বর কোথা থেকে পেলেন?

সেটা না হয় আজ অজানাই থাক। আপনার সঙ্গে কি একবার

কথা বলা যাবে!

দেখুন, আমি অনেক কষ্ট করে পড়াশুনা চালাচ্ছি। এর বাইরে আর কোনো কিছুতেই আমার আগ্রহ নেই।

প্লিজ, একবার মাত্র।

ফোনটা রেখে দেয় সাবিনা। কে এই নবারুণ। আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন? এই সব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ফোনটা আবার ব্যাগে ভরে রাখে।

রাতে বিছানায় মায়ের পাশে শুয়ে চিন্তা করতে থাকে।

কীরে সাবি, ঘুমিয়ে পড়লি?

না মা, কিছু বলবে?

হ্যাঁ, কলেজে কেমন লাগছে? তোদের সঙ্গে কতজন পড়ে? কলেজটা কত বড় রে? গ্রামের পঞ্চায়েত অফিসের থেকে বড়ো?

নানারকম প্রশ্ন মায়ের। সব সময় চিন্তা মেয়ে কোনো অসুবিধায় পড়বে না তো। কোনো দিন তো গ্রামের বাইরে যায়নি।

উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে সাবিনা, ঘুম ভাঙে মায়ের ডাকে।

কীরে সাবি, উঠবি না অনেক বেলা হয়ে গেল।

ধড়মড়িয়ে ওঠে সাবিনা। দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে পড়ে সে।

ইস্, কত দেরি হয়ে গেল?

স্নান সেরে যখন ঘরে ঢুকল তখন টেবিলে রাখা ঘড়িটা সময় জানাচ্ছে, সাবিনা তোমার সময় হয়ে গেছে। এখন না বেরোলে কলেজে ঠিক সময়ে পৌঁছানো যাবে না।

তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে কাঁধে বই-এর ব্যাগটা তুলে নেয়ও, আম্মা আমি আসছি। ওষুধগুলো ঠিকমতো খেয়ে নিও।

গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে সাবিনার সাইকেল এগিয়ে চলে। কলেজে ঢোকার মুখেই একটা জটলা দেখতে পায় সে। সাবিনা চিন্তিত হয়ে ভাবে কী ঘটনা ঘটল আবার! এত জটলা কেন? এরই মধ্যে সহপাঠী রঞ্জনাকে দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে বলে, রঞ্জনা, কী ব্যাপার রে!

ওমা তুই জানিস না, কাল বিএসসির ফাইনাল রেজাল্ট আউট হয়েছে।

সাবিনা নিরুত্তাপ স্বলে বলে, ও, তাই বুঝি?

রঞ্জনা উত্তেজিতভাবে বলতে থাকে, শুধু তাই নারে সাবি, আমাদের কলেজের ছেলে সারা ইউনিভার্সিটির মধ্যে স্ট্যান্ড করেছে। মফস্বল কলেজের একটা ছেলে এত ভালো রেজাল্ট করেছে, চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেছে।

সাবিনা চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, বলিস কিরে একেবারে স্ট্যান্ড করেছে। দারুন ব্যাপার। কোন দাদারে, তুই চিনিস?

চিনব না কিরে। ওকে তা সবাই চেনে। এই কলেজের গর্ব।

সাবিনা নিজেকে বোকা ভাবে। সবাই চেনে অথচ সে চেনে না। নীচু স্বরে সাবিনা শুধায় নাম কিরে?

আরে ও আমাদের নবদা। নবারুণ চক্রবর্তী। যেমন ব্রিলিয়ান্ট তেমনি দেখতে সুন্দর। কীরে, আলাপ করবি নাকি?

লজ্জা পায় সাবিনা। কিন্তু রঞ্জনার মুখে ঐ নামটা শুনে বুকের ভিতর ধক্ করে ওঠে। নবারুণ চক্রবর্তী, ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট।

সাবিনা সবে ফার্স্ট ইয়ার। তার সঙ্গে ফোর্থ ইয়ারের নবারুণ চক্রবর্তীর কী দরকার! ভাবতে থাকে সাবিনা। জটলার পাশ কাটিয়ে সাইকেলটা যথাস্থানে রেখে কলেজে ঢোকে সাবিনা। কলেজে ঢোকার মুখেই দারোয়ান রমেনদা তাকে ডেকে বলে, সাবিনা তোমাকে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একবার দেখা করতে বলেছে।

কী ব্যাপার রমেনদা? ভীতু প্রকৃতির মেয়ে সাবিনা ভাবে আবার কী ঘটল। গত মাসের টিউশান ফিটা বাকি আছে। সেইজন্য কি?

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে প্রিন্সিপালের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায় সাবিনা। উঁকি মেরে দেখে ম্যামের সামনে একটি ছেলে বসে আছে।

ম্যাম, আসতে পারি?

চোখ তুলে তাকিয়ে সাবিনাকে দেখেই, এসো এসো।

সাবিনা আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকে। দাঁড়িয়ে থাকে।

বসো।

আড়ষ্টভাবে একটা চেয়ার টেনে সে বসে। তার পর আস্তে আস্তে বলে, ম্যাম, আমি গত মাসের টিউশন ফি-টা জমা করতে পারিনি। আমি এই মাসে ঠিক দিয়ে দেব। আসলে আমি যেখানে টিউশনি করি তারা অসুবিধার জন্য আমায় কিছু দিতে পারেনি।

হো হো করে হেসে ওঠেন প্রিন্সিপাল। সাবিনা, তুমি ভাবছা তোমার টিউশন ফি-এর জন্য ডেকেছি। একদম না। এখন আমি তোমাকে একজন ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। বলে যে ছেলেটি বসেছিল তাকে ডাকেন, নবারুণ, এই হচ্ছে সাবিনা। আমাদের কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট। হায়ার সেকেন্ডারিতে খুব ভালো রেজাল্ট করেছিল। আমরা আশা করি কলেজেও খুব ভালো করবে। আর সাবিনা ও হচ্ছে নবারুণ চক্রবর্তী। আমাদের কলেজের গর্ব। ওর নামটা নিশ্চয়ই শুনেছ?

সাবিনার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ির ঘা মেরে চলেছে। এই তবে সেই নবারুণ চক্রবর্তী। কলেজের সবার হিরো। সবাই চেনে অথচ সে চেনে না। নিজেকে খুব লজ্জিত মনে হয়।

শোনো নবারুন এই মেয়েটিকে তোমাকে তৈরি করতে হবে। ওর ওপরেও আমাদের খুব আশা। আর তুমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন

করতে হয়তো শহরের ইউনিভার্সিটিতে যাবে, তবুও ম্যানেজমেন্টের অনুমতি নিয়ে তোমাকে আমরা এই কলেজেরই ভিজিটিং টিচার হিসাবে পেতে চাই। সাবিনা সায়েন্সের স্টুডেন্ট। তুমি ওকে হেল্‌প করতে পারবে।

নবারুণ শুধু মাথা নাড়ে। যেন এই কথাটা শোনার জন্য আগে থেকেই উৎসুক ছিল।

বন্ধুরা নবারুণকে ডাকাডাকি করতে থাকে। বন্ধুর জয় যে তাদেরও জয় তা বোঝাবার জন্য তারা ব্যাকুল। নব আর কতক্ষণ ঐ ফার্স্ট ইয়ারের মেয়েটার সঙ্গে কথা বলবি?

সাবিনা তার দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি যান আপনার বন্ধুরা ব্যস্ত হচ্ছে।

সাবিনা, আমি তোমার সব কথা জানি।

আকাশ থেকে পড়ে সাবিনা। উনি কী করে সব কথা জানলেন।

তোমার সাহসকে কুর্নিশ জানাই সাবিনা। কজন মেয়ে পারে তোমার মতো বিয়ের পিঁড়ি থেকে পালিয়ে আসতে? সমাজের সহস্র বাধাকে উপেক্ষা করে কলেজের দরজায় পা দিতে? তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

সাবিনা কোনো উত্তর দেয় না। নবারুণ এবার আরো কাছে এসে বলে, বুঝতে পারছি তোমার সায় নেই। তবে এটায় নিশ্চয়ই না করবে না। আমি তোমাদের বাড়িতে যাব। আন্টির সঙ্গে দেখা করে তাঁর পারমিশন নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব।

না না, তা নয়। আমরা কলেজেই তো কথা বলতে পারি।

ঠিক আছে আজ আর হবে না। তবে কাল কলেজ ছুটি হবার পর হাঁটতে হাঁটতে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।

আমায় বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে না। আমি তো রোজ একাই যাই।

তা তো যাও জানি। তবে একটা দিন না হয় আমিই তোমাকে পৌঁছে দিলাম।

এ সাবিনার কী হল! মাত্র কয়েক ঘণ্টায় তার কেন মনে হচ্ছে ও যেন তার কত দিনের চেনা। চিন্তাটা মাথায় আসতেই লজ্জা পায় সাবিনা। বন্ধুর কাছেই তো শুনল এই ছেলেটা কলেজের হিরো। সমস্ত মেয়েই ওর সান্নিধ্য পেতে চায়। সেই ছেলে কিনা তার মতো এক অতি সাধারণ মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চায়, বন্ধু করতে চায়।

এইসব চিন্তা করতে করতে বাড়ি ফেরে সাবিনা। মনটা কেমন যেন অস্থির। পোশাক চেঞ্জ করে মার পাশে এসে বসে। মাকে দেখে মনে হল আজ একটু ভালো আছে।

আম্মা, তোমাকে কিন্তু আজ বেশ ফ্রেশ দেখাচ্ছে।

দেখাবে না কেন আমার ডাক্তার মেয়ে আছে না। বলেই জাহানারা হাসতে থাকে। শোন, তোর খাবারটা রান্নাঘরের তাকে রাখা আছে, খেয়ে নে। তোর তো আবার ঐসব দিকে কোনো মন নেই।

মার কথাগুলো যেন তার কানেই পৌঁছায় না। শুধু মাথায় একটাই চিন্তা, কাল কী বলবে?

মার চোখ এড়ায় না। সাবি, তোর কী হয়েছে রে, তোকে এমন কেন দেখাচ্ছে?

সামলে ওঠে সাবিনা, না না, আমাকে আবার কী দেখাবে। এমনিই... বলেই উঠে পড়ে, যাই খাবারটা নিয়ে আসি। সত্যিই খুব খিদে পেয়েছে। বলেই উঠে পড়ে সাবিনা।

ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে টেরও পায় না সে।

মার ডাকে ঘুম ভেঙে সেই যথারীতি কলেজের পথে রওনা দেয় সে।

আজকের অগ্নিপরীক্ষায় তার ফল যে কী হবে তা চিন্তা করতে করতে কখন যে বেসামাল হয়ে পড়েছিল, রাস্তার ধারে একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে সাইকেল থেকে উল্টে পড়ল রাস্তায়। মাথা ফেটে রক্তারক্তি। তরপর আর কিছু মনে নেই সাবিনার।

যখন জ্ঞান ফিরল দেখল সে একটা বেডে শুয়ে আছে। উঠতে যেতেই কয়েকজন হৈহৈ করে উঠল, না, উঠবেন না। ঐ কয়েকজনের মধ্যে সে দেখল নবারুণকে।

কী কাণ্ডটাই না ঘটিয়েছ সাবিনা। কত রক্ত বেরিয়েছে জানো? ভাগ্যিস কলেজের কয়েকটা বন্ধু ঐ দিক থেকে আসছিল! তারাই ধরাধরি করে এই হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

এবার সাবিনা বুঝতে পারল সে হাসপাতালে আছে।

এবার সে প্রশ্ন করে, আমার কী হয়েছিল?

তোমার কী হয়েছিল? কিছুই হয়নি শুধু অন্যমনস্ক হয়ে সাইকেল চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়েছ। তবে ডাক্তারবাবু বলেছেন আর কোনো ভয় নেই। দু-চার দিন রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

নবারুণের কথাগুলো শুনে সাবিনার মনে হল যেন কোনো অতি আপনজন যেন তার সঙ্গে কথা বলছে।

এবার অন্য বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে থাকে নবারুণ, এবার তোরা কলেজে যা, তোদের তো আবার ক্লাস আছে। আমি ওকে বাড়িতে দিয়ে আসছি। তোরা শুধু একটা কাজ কর, সাইকেলটা কলেজে নিয়ে যা, আর একটা ভ্যান ডেকে দে।

সাবিনা জোর করে উঠে বসতে চায় বলে, না আমি এখন ঠিক আছি, আমি ঠিক বাড়ি চলে যেতে পারব।

তা তুমি পারবে আমি জানি। তবে আজকের মতো আমাকে এটা করতে দাও।

আর কথা বাড়ায় না সাবিনা। পরম মমতায় নবারুণ তার

হাতটা ধরে ভ্যানে তোলে।

ক্লান্ত সাবিনা কখন যে নবারুণের কঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা টের পায় না। হঠাৎ কাঁপুনি লেগে ঘুমটা ভেঙে যেতেই লজ্জায় লাল হয়ে যায় সাবিনা।

এতক্ষণ নবারুণ সাবিনার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। কী মমতা মাখা মুখ। যেন সমাজের কোনও গ্লানি, কোনো ক্লেদ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। নিজেকে যেন তার উপর সমর্পণ করে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

সাবিনাদের বাড়ির সামনে এসে ভ্যান দাঁড়ায়। দুজনেই ভ্যান থেকে নেমে বাড়ির সামনে এসে দেখে কয়েকজন প্রতিবেশী বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জাহানারা অশক্ত শরীরে ছুটে আসে। পরম মমতায় সাবিনাকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। নবারুণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।

তোকে কতদিন বলেছি সাইকেল চালাবার সময় সাবধানে যাবি। ঐ সময় কোনো চিন্তা করবি না। যতদিন তোর আম্মা বেঁচে আছে তোকে কোনো চিন্তা করতে হবে না।

সাবিনা চুপ করে থাকে। মাথার ব্যান্ডেজটার জায়গাটা এখনও টনটন করছে। হঠাৎ মনে পড়ে নবারুণদাকে তো দেখছে না।

মাকে বলে, আম্মা, আমাকে যে পৌঁছে দিল তাকে দেখছি না তো। তুমি একটু বাইরে গিয়ে দেখো না।

বাইরে এসে জাহানারা দেখে উৎসুক প্রতিবেশীদের মাঝে একটা সুন্দর দেখতে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ডাকে জাহানারা, বাবা, তুমি তো সাবিনাদের কলেজে পড়?

হ্যাঁ আন্টি। আপনার মেয়েকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলাম। ওকে একদম কলেজে যেতে দেবেন না। কয়েকটা দিন বাড়িতেই বিশ্রাম নিলে ও ঠিক হয়ে যাবে। যদি আপনি অনুমতি দেন আমি প্রতিদিন ওকে এসে দেখে যাব।

ছেলেটার কথাগুলো যেন জাহানারার কানে মধুর মতো শোনাচ্ছিল। এতো ভালো কথা মানুষ বলতে পারে। ওর কথা যেন কত আপনজনের মতো।

বাবা, তোমরা আমার মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছ আর তোমরা আসবে না তা কী করে হয়। তুমি ভেতরে এসো।

গুটি গুটি পায়ে নবারুণ ঘরে ঢোকে। ঘর বলতে ছোটো ছোটো দুটো ঘর। ঘরের এক পাশে একটা তক্তাপোষ। তাতেই সাবিনা শুয়ে আছে। তার বিছানার পাশেই একটা পুরনো টেবিল আর চেয়ার। টেবিলের উপর ডাঁই করা অনেক বই। এত দীনতার মধ্যেও যেন সাবিনা একঝলক আলো।

একটা মোড়া এগিয়ে দেয় জাহানারা, বাবা, তুমি একটু চা খাবে?

না না আন্টি, আজ নয়। অন্যদিন ঠিক খেয়ে যাব। আর সাবিনার তো সামনেই পরীক্ষা। আমাকে তো আসতেই হবে। প্রিন্সিপাল ম্যাডামের নির্দেশ, ওকে পড়া দেখিয়ে দিতে হবে।

আর কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়ায় নবারুণ। জাহানারার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। পায়ে হাত দিতেই জাহানারার শরীরে যেন কারেন্ট বয়ে যায়। ঐরকম একটা ছেলে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে এটা সে চিন্তাও করতে পারে না।

সে মনে মনে আশীর্বাদ করে, তুমি অনেক বড়ো হও, বড়ো মানুষ হও।

ঘরে ফিরে মেয়ের পাশে বসে মেয়ের মাথায় হাত বুলায় জাহানারা, ছেলেটা কে রে?

কোন ছেলেটা?

ঐ যে তোকে যে পৌঁছে দিল।

আমাদের কলেজেরই ছেলে। জানো মা, এবার ঐ ছেলেটা কলেজের শেষ পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করেছে। সবাই ওকে নিয়ে কত গর্ব করছে। আম্মা ও কি চলে গেছে?

হ্যাঁ।

মনে একটু অভিমান হয় সাবিনার। তাকে না জানিয়েই চলে গেল। পরক্ষণেই তার মনে হয়, ছিঃ ছিঃ এসব কথা সে কেন ভাবছে।

মা তাকে অভয় দিয়ে বলে, ও তো বলে গেল এই কদিন রোজ তোকে দেখতে আসবে। আর যেন কী বলল, তোদের কলেজের হেড মাস্টার নাকি ওর ওপর দায়িত্ব দিয়েছে তোর পড়াশুনা দেখার।

আর কথা বাড়ায় না সাবিনা। চোখ বুজে শুধু পরের দিনের অপেক্ষা করে।

যে সাবিনা কলেজে এত ছেলেমেয়ে থাকতে কারো দিকে চোখ তুলে তাকাত না, যার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল কী করে ভালোভাবে পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি করে আম্মার দুঃখ দূর করবে, আজ কেন তার মন এত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বার বার কেন নবারুণের মুখটা তার সামনে ভেসে উঠছে।

এইভাবেই দিন কেটে যায়। সাবিনার কলেজও শেষের দিকে। নবারুণের অক্লান্ত সহযোগিতায় সাবিনা আশা করছে সেও পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করবে। আর কটা দিন... মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা আর কটা দিন তুমি অপেক্ষা কর। তোমার আর কোনো কষ্ট রাখব না। রেজাল্ট বেরোলেই চাকরির চেষ্টা করব। একটা না একটা পেয়েই যাব। তারপর তোমাকে নিয়ে শহরে গিয়ে থাকব।

মা তাকে জিজ্ঞাসা করে, কিরে, নবারুণ কয়েকদিন আসছে

না কেন রে!

তাই তো আমিও ভাবছি। শরীর খারাপ হল নাকি।

তুই বরং একবার ওর বাড়িতে যা, দেখে আয়।

আমি তো কোনোদিন ওর বাড়িতে যাইনি। তবে ভাবছি আজ একবার যাব।

ইতিমধ্যে সাবিনা নবারুণকে কয়েকদিন না দেখতে পেয়ে হাঁপিয়ে উঠছিল। কেন এমন হয়। তবে কী সে নবারুণকে... না না এসব কি ভাবছে সে। নবারুণরা শুনেছে কত বড়োলোক। এলাকায় ওদের কত মর্যাদা। ওর মতো সাধারণ মেয়েকে যে নবারুণ এত সাহায্য করেছে এটাই যথেষ্ট। এবার নিশ্চয়ই সে ভালো চাকরি পেয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। এটাই তো হবার কথা। বইটা বুকে নিয়ে ভাবে সাবিনা।

পরদিন নবারুণদের বাড়ির সামনে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। বেশ বড়ো বাড়ি। সামনে বিরাট বাগান। ফুলের গাছে ভর্তি। কতরকম ফুল ভুটে রয়েছে। দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে হাঁক আসে কে?

উত্তর দেয় না সাবিনা। সে কে তা কী করে বলবে।

কিছুক্ষণ পরে দারোয়ান গোছের একজন দরজাটা খুলে দেয়। বিরক্ত মুখে শুধাতে যায়, কিন্তু সামনে একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখে মুখের বিরক্তিভাবটা সরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কাকে চান?

আমি নবারুণদার কলেজে পড়ি। ওনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। উনি কি বাড়িতে আছেন?

নবারুণ দাদাবাবু? হ্যাঁ হ্যাঁ, আছেন তো। কিন্তু উনি তো এখানে আসতে পারবেন না। দাদাবাবুর খুব জ্বর হয়েছিল। এখন অবশ্য কিছুটা ভালো আছেন। ওর ঘরেই শুয়ে আছে। আপনি কি দেখা করবেন?

ভেতর থেকে নারী কণ্ঠ ভেসে আসে, কে রে গোবিন্দ!

দাদাবাবুর বন্ধু গো।

যা, ওকে দাদাবাবুর ঘরে নিয়ে যা।

চলুন, আমি অপানাকে দাদাবাবুর ঘরটা দেখিয়ে দিই।

গোবিন্দর পেছন পেছন সাবিনা বাড়ির ভেতর ঢোকে। কী বিশাল বাড়ি। পেল্লায় পুরনো দিনের বড়ো বড়ো পিলার। এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা ঘরে নিয়ে যায় গোবিন্দ।

সাজানো গোছানো ঘর। বিছানায় শুয়ে নবারুণ। সাবিনাকে দেখে চমকে ওঠে নবারুণ। আশাই করতে পারেনি সে।

ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়ে, সাবিনা তুমি? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

লজ্জায় লাল হয়ে সাবিনা বলে, না, কয়েকদিন আপনি আমাদের বাড়ি যাননি তাই...

আর বলতে হবে না। এই হতচ্ছাড়া জ্বরটাই এর জন্য দায়ী। তুমি এসেছ আমি ভাবতেই পারছি না।

না, না, আমি ভাবলাম।

থাক্ থাক্, আর অজুহাত দিতে হবে না। তুমি এই চেয়ারে বোসো। বিছানার পাশে চেয়ারটা টেনে জড়োসড়ো হয়ে বসে সাবিনা।

নবারুণ সাবিনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কী ভাবছ সাবিনা?

না, কিছু না। আপনি তো এখন ভালোই আছেন। আমি তাহলে আসি।

আসি বললেই কী হয়। আমার মার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।

এই কথা বলায় সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে হাতে মিষ্টির প্লেট আর জলের গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢোকে। আর তার পিছনে পিছনে এক মহিলা। দেখেই খুব সম্ভ্রান্ত বলে বোঝা যায়। মাথায় লাল টকটকে সিঁদুর, কপালে টিপ।

তাহলে তুমিই সাবিনা?

সাবিনা উঠে এসে ওনাকে প্রণাম করে।

থাক্ থাক্, নবর কাছে তোমার কথা শুনেছি। ও তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তুমি নাকি কলেজের মান বাড়িয়ে দেবে। আরও কত কী! তবে তোমাকে দেখে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান তোমাকে সৌন্দর্যটাও ভালোভাবেই দিয়েছেন।

লজ্জায় লাল হয়ে যায় সাবিনা। গুটিগুটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। মার কথা শুনে মিটিমিটি হাসে নবারুণ।

তা, তোমরা বন্ধুরা বসে গল্প করো, আমি যাই, আমার কত কাজ। এই বলে গিন্নিমা ঘর থেকে চলে গেলেন।

নাও, খেয়ে নাও।

আমি এত খাবার কি খেতে পারি?

ওসব বললে হবে! আমার মা যখন পাঠিয়েছে তোমাকে খেতে হবে। মা কিন্তু খুব কড়া।

হেসে ওঠে সাবিনা। আপনার শরীর খারাপ, আপনি একবারও আমাকে জানাননি।

আরে, এতে জানাবার কি আছে। সামান্য তো জ্বর। জানতাম দু-একদিনের মধ্যেই সেরে যাবে। তা তুমি যে এত উতলা হয়ে এখানে চলে এলে?

আমি আপনার সঙ্গে একদম কথা বলব না। আমি এদিক দিয়ে এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিলাম। আপনার বাড়িটা রাস্তায় পড়ায় একবার দেখতে এলাম।

ও, তাহলে আমাকে দেখতে আসোনি।

না না তা নয়, আপনি কয়েকদিন আসছিলেন না তাই একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। এই কথাটা বলেই নিজেই লজ্জা পেল সে।

দুশ্চিন্তা কেন হবে! কিন্তু সত্যিই দুশ্চিন্তা হয়েছিল। সে ভেবে পায় না কেন নবারুণকে না দেখতে পেলে তার দুশ্চিন্তা হয়।

নবারুণ সাবিনার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসতে থাকে।

সাবিনা, কাল পরশুর মধ্যে আমি নিশ্চিত ভালো হয়ে যাব। তারপর আমার প্রথম কাজ হবে তোমার সঙ্গে দেখা করা।

সাবিনা অনেক চিন্তামুক্ত হয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। বাড়ির সামনে আসতেই দেখে বাড়ির সামনে জটলা। ঐ জটলায় তার বাড়ির আশেপাশে থাকা করিমচাচা, রহিমচাচা আরও কিছু কম বয়সি ছেলেকে সে দেখতে পেল। সে বাড়ির কাছে আসতেই সবাই কেমন যেন তির্যক চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। বাড়িতে ঢুকতেই মা তাকে ঘরে টেনে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলে, সাবিনা ওরা শাসিয়ে গেছে।

কেন, আমরা কী করেছি? আর বাইরে যাদের দেখলাম তারাই বা কারা? অনেকের তো মুখই চিনি না।

তুই চিনবি কী করে? আমিই তো চিনি না। বাইরে থেকে এসেছে। ওরা আমাদের এই গ্রাম থেকে চলে যেতে বলেছে। নয়তো ওরা আমাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে।

কেন, আমরা কী দোষ করলাম?

ওরা বলে গেছে ঐ যে তোর বন্ধু আমাদের বাড়ি আসে সে যেন আর এখানে না আসে। ওদের দাবি কোনো হিন্দুর ছেলে নাকি আমাদের মতো কোনো মুসলমান মেয়ের সঙ্গে মহব্বত করতে পারবে না।

বুকের ভিতর ছ্যাৎ করে ওঠে সাবিনার।

ঐ ছেলেগুলোর মধ্যে একজনকে দেখলাম। তোর মনে আছে যার সঙ্গে তোর বিয়ে হবার কথা ছিল, কুতুব মিঞার ছেলের ঐ ছেলেটা সবথেকে বেশি হুমকি দিচ্ছিল।

এবার ভয় পায় সাবিনা। ও ভেবে পায় না বন্ধুত্বের মধ্যেও ধর্ম! সে বুঝতে পারে হিন্দু-মুসলমান সব বাজে কথা। অনেকদিনকার রাগ পুষে রেখেছে ঐ শয়তান ছেলেটা ধর্মের নাম দিয়ে তার ক্ষতি করতে চায়। তবুও সাহস জোগাতে মাকে বলে, আম্মা তুমি ভয় পেয়ো না। ওরা ভীতুর দল। তখনকার মতো মা মেয়ে একটু শান্ত হয়। অন্যদিনের মতো ছোটো খাটে পাশাপাশি দুজন শুয়ে পড়ে। অনেক রাত পর্যন্ত সাবিনার চোখে ঘুম নেই। কালই নবারুণকে সব কথা বলতে হবে।

পরদিন সকাল হতেই সাবিনা মোবাইল থেকে নবারুণকে ফোন করে, আপনি কেমন আছেন?

আজ আমি একদম ফাস্ট ক্লাস। একদম সুস্থ।

আপনি আজ একটু দেখা করতে পারবেন?

অবাক হয়ে যায় নবারুণ। এই মেয়ে বলে কী! নিজে থেকে বলছে দেখা করতে।

গম্ভীর হয়ে বলে, কোথায় দেখা করতে হবে? তোমাদের বাড়িতে?

না না, বাড়িতে নয়। আমাদের গ্রামের ধারে যে পুকুর আছে, যাকে সবাই তালসুপুরির পুকুর বলে, তার পাড়ে যে অশ্বত্থ গাছটা আছে তার নীচে।

ঠিক আছে, আমি ঠিক পৌঁছে যাব।

বিকেলের আলো সবে পড়ে গিয়েছে। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাবার লাল আভা সমস্ত আকাশকে যেন গ্রাস করছে। তারই প্রেক্ষাপটে দুই তরুণ-তরুণী। সাবিনা গতকালের সব ঘটনা নবারুণকে বলে। তাকে অনুরোধ করে সে যেন আর তাদের বাড়িতে না যায়।

হেসেই উড়িয়ে দেয় নবারুণ। তুমি দেখছি দারুণ ভীতু। আজ একটা কথা তোমায় না জানালেই নয়। আমি অনেকদিন ধরেই বলব বলব করেও সাহস পাচ্ছিলাম না।

সাবিনা নবারুণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী এমন কথা যা বলতে নবারুণ সাহস পাচ্ছে না।

নবারুণ হঠাৎ সাবিনার হাতটা চেপে ধরে, সাবিনা আমি তোমায় খুব ভালোবাসি।

সাবিনা কেঁপে ওঠে। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না। চোখের কোণে চিকচিক করে ওঠে দুফোঁটা জল। গলা বুজে আসে। এই খুশির কথা কাকে জানাবে! মনে হচ্ছে যেন সারা পৃথিবীকে চিৎকার করে বলে আমি সবচেয়ে সুখী মানুষ। কিন্তু কথা বলতে পারে না। নবারুণের হাতটা আরো জোরে চেপে ধরে।

অস্তগামী সূর্যের লাল আভা যেন ওদের জন্য আরো বেশীক্ষণ আকাশে রক্তিম করে রাখে। শুধুমাত্র ওদের জন্যই। দুজনের মুখে আলোর ছটা তাদের আরো সুন্দর করে তুলেছে। দুটি তরুণ প্রাণের আবেগ যেন হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচ সব জাগতিক বাধাকে অতিক্রম করে আলোর পথযাত্রী হয়েছে।

দু-জন হাত ধরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ দুজনই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা দুর্বৃত্তের দল, যারা আগের দিন শাসিয়ে গিয়েছিল, তারা দলবল নিয়ে পেছন থেকে লাঠির আঘাতে তাদের রক্তাক্ত করে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে ওঠে। সারা শরীর রক্তে মাখামাখি হয়েও নবারুণ সাবিনার হাতটা ছাড়ে না। খরবটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পৌঁছয় জাহানারার কানেও। পাগলের মতো সে ছুটে যায় পুকুরের দিকে। মেয়ে সাবিনা আর ঐ নবারুণের রক্তাক্ত দেহ দেখে জ্ঞান হারায় জাহানারা। জ্ঞান ফিরলে দেখে সাবিনা আর নবারুণকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুজনেই হয়তো আর নেই।

দুর্বল শরীরে যেন অসুরের শক্তি ফিরে আসে জাহানারার।

কোনো দিকে না তাকিয়ে ছুটে যায় বাড়ির দিকে। ফিরে আসে একটা ধারালো দা নিয়ে। সে কানাঘুষোয় শুনেছিল তার মেয়েকে খুন করেছে ঐ করিম শয়তানটা। শয়তানের দল ছেলেমেয়ে দুটোকে খুন করার পর গ্রামেরই শেষে একটা পোড়ো বাড়ির ভেতর বসে নেশা করছিল। সেখানে গিয়ে পৌঁছয় জাহানারা। কোনো কিছু বোঝার আগেই দাখানা বসিয়ে দেয় কুতুবের মাথায়। গলগল করে রক্ত বেরোতে থাকে। বাকি সাঙ্গারা ভয়ে যে দিকে পারে পালিয়ে যায়।

ঐ রক্তাক্ত দা দিয়ে জাহানারা এবার ছুটে যায় থানার দিকে।

স্যার, আমাকে ধরুন। আমি খুন করে এসেছি। আমার মেয়ের খুনিকে আমি ঠিক শাস্তি দিয়ে এসেছি।

জেলে খুব ভালো ব্যবহার করার জন্য জাহানারার শাস্তি অনেক কমে গিয়েছিল। একদিন জেলার সাহেব এসে তাকে বলল, জাহানারা, তোমার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে। কালই তোমাকে জেল থেকে ছাড়া হবে। তুমি এখন কোথায় যাবে?

কোথায় যাব? কোথায় যাব? ভাবে জাহানারা। তার বাড়িটা নিশ্চয়ই কেউ দখল করে নিয়েছে। আর ঐ ঘরে গিয়েই বা সে কি করবে? সে ঠিক বুঝতে পারে না কী করবে! কোথায় যাবে!

পরদিন জেলের সমস্ত কাজকর্ম সেরে যখন জাহানারাকে জেল থেকে বার করা হবে সেই সময় একজন খবর দিল, জাহানারার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।

জাহানারা অবাক হয়। কেউ তার সঙ্গেও দেখা করার মতো আছে তা তো তার জানা ছিল না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার সামনে হাজির হয় এক যুবক। মুখটা চেনা চেনা ঠেকে জাহানারার।

আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না আম্মা। আমি নবারুন।

নবারুণ?

হ্যাঁ, আমি নবারুণ। আপনি হয়তো শোনেনি সাবিনাকে না বাঁচাতে পারলেও ডাক্তাররা আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। আপনাকে আমি নিতে এসেছি আমাদের বাড়িতে।

তোমাদের বাড়ি? তোমাদের বাড়িতে সবাই মেনে নেবে এই খুনিকে?

চলুন না, বাড়িতে গিয়েই দেখবেন।

আর কথা বাড়ায় না জাহানারা। ছেলেটির সঙ্গে পা বাড়ায় তাদের বাড়িতে। বিরাট বাড়ি। একটা ঘরে নিয়ে তাকে বসতে বলে নবারুণ। সেখান থেকে সদ্য বিধবা তার মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, এসে জাহানারাকে দেখে জড়িয়ে ধরেন। তারপর দুজনে এক সঙ্গে নবারুণের পেছনে পেছন একটা ঘরে ঢোকে। চোখে পড়ে দেওয়াল জুড়ে একটা বড়ো ফুল দিয়ে সাজানো পেইন্টিং। সাবিনার হাসিমুখ। কান্নায় ভেসে যায় জাহানারার দুচোখ। ঝাপসা দেখায় সাবিনাকে।

ভারতীয় মার্গসঙ্গীত ও আজকের প্রজন্ম

লিপিকা ভট্টাচার্য

অনেকের মতে, বর্তমান প্রজন্মের প্রযুক্তিনির্ভর কার্যকলাপে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের সনাতনী ধারার, কৌলিণ্য ও আভিজাত্য আজ যেন তার স্বরূপ হারাতে বসেছে। পাশ্চাত্য সুরের অন্ধ অনুকরণ ও নানাপ্রকার সংস্কৃতির মিশেলে গড়ে ওঠা ব্যাকরণহীন সুর তালের ভয়ঙ্কর দাপটে ভারতীয় মার্গ সংগীতের গভীরতা ও আধ্যাত্মিকতা যেন অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে—অর্থাৎ, এবার নতুন ভাবনাচিন্তা করার সময় এসেছে । তবে একথাও মনে রাখতে হবে, আজ আধুনিক সংগীতের সমাজে যে চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা কিন্তু কালের বিবর্তনবাদ, প্রথাগত শিক্ষার অভাব ও উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। তাই বর্তমান প্রজন্মের এ হেন রুচিগত ও আচরণগত পরিবর্তনের জন্য সমাজ কিন্তু তার পরোক্ষ দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না। আজকের পৃথিবী আগের তুলনায় অনেক বেশি গতিশীল। বিজ্ঞানের কল্যাণে সারা পৃথিবীর সংগীত এখন হাতের নাগালের মধ্যে এবং তাদের পারস্পরিক তুলনা, পরীক্ষামূলক ব্যবহার ও অনুকরণের সুযোগও বর্তমান প্রজন্মের সাধ্যের আওতায়—তাই হরেকরকম কোলাজের মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্ম এক নববিস্ময়সৃষ্টিকারী পরশপাথর সন্ধানে ব্যাকুল, যার মাধ্যমে অতি সহজেই পৌঁছানো যাবে সাফল্যের চূড়াটিতে, যেখানে যশ, সম্মান, খ্যাতি, অর্থ ও আধুনিক বিলাসবহুল জীবনযাত্রার এক বিচিত্র সমাহার অপেক্ষমান।

এই লক্ষ্যস্থিরের মূল্যবোধই সমস্যার মূল উৎস। কারণ সাফল্যের মাপকাঠি কিসের ভিত্তিতে মূল্যায়িত হবে, পার্থিব সুখ না আধ্যাত্মিক শান্তি —এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় মার্গসংগীতের ভিত্তি কিন্তু আধ্যাত্মিকতা, যা জ্ঞান ও বৈরাগ্যভিত্তিক চিরন্তন আনন্দের সন্ধান দেয়। সেই আনন্দপ্রাপ্তির জন্য আজকের প্রজন্মকে পার হতে হবে সংগীতের প্রথাগত শিক্ষার এক দীর্ঘ চড়াই উতরাই পথ, যার অন্য নাম অনন্ত সাধনা। কঠিনতম এ সাধনার পথে সম্বল শুধু অসীম ধৈর্য, স্থৈর্য এবং আকণ্ঠ পিপাসা। শ্রীমদভাগবত গীতার ধ্যানযোগ-এর একটি শ্লোকে এই সাধনার বর্ণনা লক্ষিত হয়

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা মৃতা
যোগীনো যতচিত্তস্য যুন্ডজতো যোগমাত্মন

বাতাস না লাগা দীপশিখার মতোই সাধকের চিত্ত হবে স্থির, অচঞ্চল ও ধ্যানমগ্ন। পরম ভারতীয়তার প্রাচীন সনাতনী রূপ প্রকাশিত হয় শ্লোকটির মধ্য দিয়ে। কিন্তু বাস্তবের প্রেক্ষাপট এই সাধনাসিদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, আজকের পৃথিবীতে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরই এক অলিখিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়, তার শৈশব-কৈশোর পার হয়ে যায় পুঁথি-পুঁজির বিশাল কার্যক্রমে ঠাসা এক ক্লান্তিকর পথের ইঁদুরদৌড়ে ছুটতে ছুটতে... এতটুকু পিছিয়ে পড়লে তার মনের নীল আকাশ হতাশার কালো মেঘে ঢেকে যায়, তার বিদ্যুতের ঝলকানি অপরিপক্ক হৃদয়টিকে ক্ষতবিক্ষত করে যায়। অবশেষে একদিন সাফল্যের ধ্বজা তুলে সে চড়ে বসে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সোনার তরীটিতে ও পাড়ি দেয় অবশিষ্ট জীবনসমুদ্রের পথে। এই পার্থিব পরম পাওয়াটুকুর জন্য তার আক্ষরিক শিক্ষার প্রয়োজন হলেও দীক্ষার প্রয়োজন হয় না। তাই তার মূল্যবোধও গড়ে ওঠে নিজের আবর্তটুকু ঘিরে,

সেই পরিধির সীমারেখা পর্যন্ত। ভারতীয় মার্গ সংগীতের ব্যাপ্তি ও সীমাহীন আনন্দলাভের উপলব্ধি থেকে সে বঞ্চিত হয়, কারণ তার মূল্যবোধের সংজ্ঞা ভিন্ন। আজকের সমাজই তাকে সীমিত মূল্যবোধ সম্বন্ধে শিক্ষিত করে। পক্ষান্তরে, অন্য একটি সমস্যাও প্রকট হয় যা হল প্রাচীন ভারতীয় মার্গসংগীতের প্রতি আজকের প্রজন্মের আকর্ষিত না হওয়া। এই বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, শাস্ত্রীয় সংগীতের দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাচীনকাল থেকে গুরুকুলের ঘরানাকেন্দ্রিক অনমনীয় মনোভাব সমস্যাটির অন্যতম কারণ বলা যায়। তাই সাধারণ জনজীবনে শাস্ত্রীয় সংগীত আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠে না, থেকে যায় কয়েক যোজন দূরে। যুগ যুগ ধরে এই পরম সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে থাকে আপন সীমানায়, তার চৌহদ্দি পেরিয়ে আমজনতার প্রথাগত শিক্ষা কার্যক্রমে প্রবেশ করতে পারে না। প্রাচীন ভারতের মহার্ঘ্য ধনটি তাই থেকে যায় বর্তমান প্রজন্মের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তার দিশা না পেয়ে কালের উত্তরসূরীরা হাতড়ে বেড়ায় আধুনিক প্রযুক্তিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংক্ষিপ্ত পথ, খুঁজে ফেরে পরশপাথর।

এ প্রসঙ্গে এক বিখ্যাত নোবেলজয়ী বাঙালির কথা মনে হয়। নাম তাঁর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে সমসাময়িক সময়ের মেলবন্ধন গড়ে যিনি তৎকালীন ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ, টপ্পাঙ্গের গানের শব্দচয়নে একদিকে যেমন ছুঁয়ে গেলেন মানবহৃদয়ের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুভূত আবেগের ঢেউ, অন্যদিকে তেমনই একই সৃষ্টির সুরে রেখে গেলেন ভারতীয় মার্গসংগীতের স্বমহিমা, গভীরতা, প্রশান্তি! তাই হতাশাই শেষ কথা নয়। আজকের প্রজন্মই প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরসূরী, ধারক ও বাহক। তাই বর্তমান প্রজন্মকেই সাজিয়ে তুলতে হবে নবরূপে! একদিকে বিশ্বায়নের যুগে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বভ্রাতৃত্বের ডাক, অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের সনাতনী রূপরেখাও ফুটিয়ে তুলতে হবে সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে। আদিরূপের সৌন্দর্য প্রকাশিত হবে নবরূপে! পুঁথিগত কার্যক্রমের সমান্তরালেই বেঁচে থাকুক মার্গসংগীতের প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি, পরস্পরের পরিপূরক হয়েই সম্পূর্ণ হোক বৃত্ত, যে বৃত্ত থেকে নির্গত অনন্ত অমৃতধারার দ্যুতি প্রবাহিত হোক ব্যক্তি থেকে সমাজে, সমাজ থেকে দেশে, দেশ থেকে সমগ্র বিশ্বে! হোক সেই মহাযজ্ঞের আয়োজন, যে যজ্ঞে 'আত্মপ্রদর্শন নয়, সত্য প্রদর্শন'—এই মহামন্ত্রে চেতনা জাগ্রত হোক, যজ্ঞের হোমানলে শাস্ত্রীয় সংগীত, লোকসংগীত, পাশ্চাত্য মার্গসংগীত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের ঘৃতাহুতি অর্পিত হোক বর্তমান প্রজন্মের মাধ্যমে, ভিন্ন ভিন্ন নদীরূপে তারা মিশে যাক একই আধ্যাত্মিকতার গভীর সমুদ্রে—দূষণমুক্ত সংস্কৃতির ধারা ছড়িয়ে যাক আকাশে-বাতাসে... সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গিতেই যুগে যুগে কালে কালে প্রাচীন ভারতীয় সনাতনী রূপরেখার ধারা বেঁচে থাকুক তার স্বমহিমায়!!!

গল্প

স্মৃতিদাগ

শৃন্বন্তী চক্রবর্তী

বহুদিন হল মিনু নেই। অনেকদূরে চলে গেছে সে। খুঁজলেও আর কাছে পাবে না ধৃতি। তার বড়ো মেয়ে ছিল সে। মানবজীবন কত আঘাতেই ক্ষত-বিক্ষত হয়। দিন যায়, ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসে ক্ষত। নতুন আশার আলোয় সে বাঁচতে চায়। সেই আলো তার ছোটো মেয়ে মিলি, আত্মিকা। আজকাল কোন ঘোরে যে বাস করে মিলি, বুঝতেই পারে না সে। একরত্তি মেয়েটা দিদিকে খুঁজেই চলে। আর বলে ওঠে, 'এই তো দিদি, অ্যাই কোথায় যাচ্ছিস'—আশ্চর্য। ভয় হয় ধৃতির। এও কি সম্ভব!

নানা সম্ভব-অসম্ভবের দোলাচলে ধৃতির দিন কেটে যায়। মীনাক্ষী আর আত্মিকা তার দুই মেয়ে। মীনাক্ষী বড়ো, ছোটোবেলায় আপনমনেই খেলত, মিষ্টি সুরে গাইত। ছোটো বোন মিলি আসতেই পেল খেলার সাথী। দিব্যি সুন্দর সময়েরা এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন! সেই দিনটার কথা ভাবলে আজো ধৃতি কেঁপে ওঠে। সাঁতার তো ভালোই জানত মিনু। কী হল তাহলে সেদিন!

'মিলি, দুধটা খেয়ে নাও, ঠান্ডা হচ্ছে', নমিতার গলা শুনে সম্বিত ফেরে ওর। একজন সর্বক্ষণ দেখাশানোর লোক রেখেছে। অন্তত বেশি করে যাতে খেয়াল করা যায়! দূরে বাইরের জানলা দিয়ে একভাবে চেয়ে আছে। কিছু বছর হল মিলির সাইকোথেরাপি চলছে। ধৃতিই নিয়ে যায়। এক-একসময় কী যে আনমনে বলতে থাকে মিলি; এই খুশি হয়ে কথা বলছে,

কেউ গান গাইতে বললে দিব্যি গাইছে। কিন্তু যেই ওর দিদির কথা উঠত, কিরকম যেন আচরণ শুরু করত। ওর নাম ধরে ডাকলেও সাড়া দিত না। একদিন, সৌমিলী কথায়-কথায় একবার মিনুর কথা তুলেছিল, মিলি মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ বসে থাকল, নাম ধরে ডাকলেও সাড়া মিলল না, হঠাৎ সে সামনে তাকিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত গলায় বলে 'উঠল একদম ঠেলা মারবি না আমায় তোরা, সরে যা বলছি'—একি রূপ মিলির! ঘাবড়ে যায় ধৃতি। সেকেন্ডেই নিজেকে সামলে নিয়ে নমিতা ছুটে এসে মিলিকে শক্ত করে চেপে ধরল। সৌমিলী ভয়ে খাবি খেতে থাকল, 'যেভাবেই হোক, একজন ভালো মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখা। এ নইলে বাড়তে থাকবে।' সত্যি! বেড়েই চলেছে মিলির এমন অদ্ভুত আচরণ। যেন নিজের মধ্যেই নেই মিলি। একটা সম্পূর্ণ অন্য চরিত্র।

কর্মসূত্রে স্বামী মুম্বইয়ে থাকে। ট্রান্সফারেবল জব। নিরুপায় অপূর্ব। ধৃতিকে একাই গোটা সংসার সামলাতে হয়। ধৃতি নিজেও একজন সংগীতশিল্পী। নানা জায়গায় ঘুরে গানের শো করে ও। এমনকি বাড়িতেও গানের স্কুল রয়েছে তার। ইদানীং গানের শো করা বন্ধ রেখেছে ধৃতি। মিলিকে একটু বেশি সময় দেওয়াই ওর লক্ষ্য। অবশ্য ও যে একেবারেই বেখেয়ালি ছিল, তা কিন্তু নয়। মিনু মিলি দুজনকেই সমানভাবে দেখে রাখত। তবুও, কেন যে সেদিন মিনুকে বেরোতে দিল! মানা করলে আজ মিনু তার মায়ের সঙ্গে বসেই গান গাইত, খিলখিল করে হেসে গল্প করত, বোনকে আগলে রাখত। একমনে ভাবে ধৃতি। একটু অন্যভাবে ছবি আঁকার চেষ্টা করে সে। মনকে প্রবোধ দেয় বারবার।

কাউন্সেলিং ভালোই হয় মিলির। D.I.D, অর্থাৎ Dissociative Identity Disorder, এই বিরল রোগে আক্রান্ত মিলি। ডাক্তার বলেইছেন, এই রোগের নিরাময় একপ্রকার অসম্ভব। যত ট্রিটমেন্ট চলবে, তার সাহায্যেই একমাত্র ভালো থাকবে সে। এ মানুষের এমনই এক মনোরোগ, যা কিনা একজনের চিন্তা, স্মৃতি, অনুভূতি ও কাজের মধ্যে এবং আত্মপরিচয়ের মধ্যে সংযোগের অভাব তৈরি করে। নানা চরিত্রের মধ্যে ঘারোফেরা করে এরা। কী অদ্ভুত আমাদের মনের গতি। দিশেহারা লাগে ধৃতির। মিনু চলে যাওয়ার পর থেকে মিলি খুব একা হয়ে গেছে। একটা বড়ো আঘাত পেয়েই কেমন যেন হয়ে গেল মেয়েটা। নমিতা আবার বলে, 'সোনামণিকে তেনারায় ধরেছে, ও ওঝা ছাড়া হবে না।' এইসবে এমনিতেই ওর বিশ্বাস নেই। কিছু প্রতিবেশীও গায়ে পড়ে এরকম মন্তব্য করেছে। অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে ধৃতি। বুক ভরে শ্বাস নেয় সে। জল্পনার কালোমেঘকে অতিক্রম করার সাহস খুঁজে নেয়।

বাড়ির পাশে লাগোয়া পুকুরটাকে আজো বিভীষিকা লাগে ওর। ধৃতিরা যেখানে থাকে, সেখানে চারপাশে আধুনিকতার ছাপ থাকলেও, এই ডোবাটিকে কেউ বুজিয়ে দেয়নি। বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি গজিয়ে উঠলেও এই ডোবাটা নিজের সাবেক রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। অনেকের কথায়, এই ডোবাটার জন্য পাড়াটা হাওয়া পায়। নইলে যে হারে বিল্ডিং উঠছে, তাতে হাঁসফাঁস হওয়ার জোগাড়! দক্ষিণের জানলা দিয়ে একফালি ডোবাটাকে দেখে চেয়ে সে। যেটুকু দেখা যায়, তাতে বিশেষ লাভ হয় না। ও কি পারত মিনুকে সতর্ক করতে? একরাশ স্মৃতি এসে ভিড় জমায়।

'অনেকটা সাঁতরে গেলাম দাদা, পেলাম না। বহু পুরনো ডোবা, একটু বেশি গভীরে ঢুকলে বিপদ আছে', পাড়ার ক্লাবের দুটি ছেলে চেষ্টা করেছে খোঁজার, পায়নি। কাউন্সিলার নৃপেনবাবুর তৎপরতায় শেষে জলে ডুবুরি নামানো হল। তারা অনেক গভীরে নামল, কিন্তু মিনুকে পাওয়া গেল না। 'বহু পুরনো ডোবা তো, চোরা মাটির জন্য হয়তো—' কথাটা শেষ হয় না ডুবুরির; ধৃতি জ্ঞান হারায়।

মিনুর দুই বন্ধু, তিয়াসা এবং দীপ্তি। তিয়াসারা ওই ঘটনার পরে সপরিবারে দিল্লি চলে যায়। দুর্ঘটনার দিন ওদের সঙ্গেই মেয়েটা খেলছিল বিকেলে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব ধৃতি সেইভাবে কথা বলতে পারেনি ওদের সঙ্গে। তবে অপূর্ব চেষ্টা করেছিল। ব্যর্থ হয় ওদের পরিবারের জন্যে। আজ অনেকগুলো বছর পেরিয়ে এলেও মনে হয় কথা বলা জরুরি ছিল। একটা কোথাও যেন অসংগতি অনুভব করে সে। দীপ্তিকে অনেকবারই তিয়াসার ওপর দোষ দিতে শুনেছিল পাশের বাড়ির বৌদি। সত্যি কিনা জানে না সে। কিন্তু পরের দিন তিয়াসার পরিবার থেকে কেউ আসেওনি দেখা করতে। অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল ওরা। এমনকি উভয়ের পারিবারিক একটা হৃদ্যতাও হয়ে গিয়েছিল। এতটা দূরত্ব হয়ে যাবে, আশা করেনি ধৃতি। দীপ্তিরাও এই পাড়া ছেড়ে চলে গেছে। এইসব মিলিয়ে কোথাও একটা খটকা লাগে। কিন্তু সে অপারগ। এই অগণিত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার কেউ সামনে নেই। ধৃতি ভাবনার সমুদ্রে ডুবে থাকে।

'মা, তুমি গান করবে না?' মিলির ডাকে ভাবনায় ছেদ পড়ে। রবিবার বিকেলে সূর্যাস্তের রংটা যেন করুণ রাগিনীর সুর ধরেছে। জানলা থেকে সরে আসে ধৃতি।

'তুমি জানলায় কী দেখছিলে মা?'—চমকে যায় ধৃতি। সেই ডোবাটা কি মিলি দেখতে পেয়েছে? এক পলকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে সে মিলিকে। 'কই, কিছু না তো! তুমি গান করতে চাও?' একটু অন্যদিকে নিয়ে গেল কথাটা।

'আমি তো এখানে দাঁড়িয়ে গাইছিলাম, তুমি শোনোনি?' সত্যি! খুব অন্যমনস্ক ছিল ধৃতি। সময়োপযোগী কোনো কথা না পেয়ে বইয়ের টেবিল গোছাতে লাগল। হঠাৎ ডোরবেল বেজে উঠল। একছুটে 'নমিতা মাসি' বলে ডাকতে ডাকতে চলে গেল মিলি। কিছু অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি থেকে পালাতে ইচ্ছে করে ওর। মিলির অস্বাভাবিক আচরণকে প্রশমিত করতে নানা উপায় অবলম্বন করতেই হয় তাকে।।

সন্ধ্যায় ঘরে থমথমে ভাবটা কিছু গুঞ্জনে কেটে গেল প্রায়। ধৃতির কয়েকজন শিল্পী বন্ধু এসেছে। একটা সংগীতের আসর বসবে আজ। হালকা হয় ধৃতি। যতক্ষণ গানে ডুবে থাকা যায়, একটা অন্যজগতে চলে যায় সে। নমিতাকে চা আর টায়ের ব্যবস্থা করতে বলে সে চলে আসে মজলিশে।

'আজ কিন্তু তোকে ছাড়ছি না ধৃতি। চারটে গান গাইতেই হবে', কৃষ্ণার উপরোধে হাসে সে। সুকন্যাও তাতে সায় দেয়।

বেশ ফুরফুরে লাগে নিজেকে। হারমোনিয়াম নিয়ে বসে পড়ে ধৃতি। 'তবে আমি শুরু করি', গায় সে। 'সারাজীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ'-ওর খুব প্রিয় গান। সুকন্যারাও গলা মেলায়। মুহূর্তে এক মনোরম সুরেলা আবেশ জাগিয়ে দেয় চারপাশ।

'সোনামণি, তুমি কোথায় গেলে?' নমিতার সজোরে ডাক ছন্দপতন ঘটাল। মিলিকে ডাকছে না! মিলি তো এই ঘরেই বসেছিল। ধৃতির সঙ্গেই। ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়। নেই তো মেয়েটা। গেল কোথায় তাহলে! অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে ধৃতি। ওরা। সবাই উঠে পড়ে। মাধুরী বলে, 'এই তো পাশেই বসেছিল মিলি, আমরা কেউ দেখতে পেলাম না!' সবাই খোঁজা শুরু করে। কেবল ধৃতি, সে কেমন অক্ষম হয়ে পড়েছে। একটুও পলক ফেলছে না। সৌমিলী এগিয়ে আসে তার কাছে।

'কিরে, কী হয়েছে তোর? কথা বলছিস না কেন? ধৃতি, কি রে'—দুইবার ঝাঁকুনি দেয় ওকে। ধৃতি তখন যেন ফিরে গেছে ফেলে আসা স্মৃতির পাতায়। মিনু যেন এগিয়ে যাচ্ছে সেই ডোবাটার কাছে। সে চিৎকার করে বলে ওঠে, 'মিনু, যাস না, কথা শোন'—

আবীরার জলের ঝাপ্টায় সম্বিত ফেরে ধৃতির। 'তুই চল আমাদের সঙ্গে, মিলিকে তোকেও খুঁজতে হবে'—ঠিক। মিলিকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। একটা সুন্দর জগৎ সে দেবে মিলিকে। বেরিয়ে খুঁজতে থাকে মিলিকে। ডোবাটার কাছেই যায় ও। অন্ধকারের কালো রংটা মোবাইলের আলোয় ফিকে হয়েছে। কিন্তু, মিলি কোথায়! একটু বাঁদিক ঘেষে এগোতেই এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখে পড়ে।

মিলি ডোবার জলটায় নেমে পড়েছে। একটু একটু করে এগোচ্ছে আর কী যেন বিড়বিড় করছে। সবাই আঁতকে ওঠে তখন। ধৃতি শুধু স্থির। সেও ধীরে ধীরে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে সেই ডোবার জলে নেমে পড়ে। আবার চারপাশে ক্ষণিকের কলরোল উঠলেও ধৃতির কানে তা পৌঁছায়নি। সে তখন তার মিলিকে স্নেহের আঁচল পেতে রক্ষায় মগ্ন। মাতৃত্বের এই আধখানা জগৎকে সে কিছুতেই হারাতে দেবে না। মিলির হাত ধরে সে।

অনেকদিন হল ধৃতি মিলিকে নিয়ে চলে এসেছে অপূর্বর কাছে। ব্যাঙ্গালোরে। নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ, নতুন আলাপ—সব মিলিয়ে এই আনকোরা পরিবেশে মিলি খুব আনন্দে আছে। এখানে কাউন্সেলিং চলছে সপ্তাহান্তে। আর তেমন কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। নিজের বাড়ির গণ্ডির বাইরে আরো যে একটা জগৎ আছে, ধৃতি তা জানলেও সাড়া দিতে চায়নি। কিন্তু মিলির জন্য সে নতুন এক জগৎ তৈরি করতে চায়, যেখানে মা তাকে স্বনির্ভর হতে শেখাবে। বন্ধু হবে মা। মিনু, সে ধৃতির আরেক জগৎ হয়ে থাক। তার প্রতি স্মৃতির পাতায় ভরা থাক সে। তার স্মৃতিদাগ হয়তো অকালেই মলিন হয়ে যাবে নতুন দৈনন্দিনতার কড়চায়।

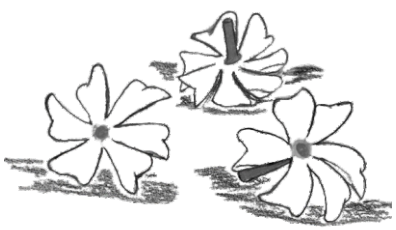

গল্প

নৃপেনবাবুর গ্যাঁড়াকল

সুস্মিতা কৌশিকী

সকাল সকাল ব্যাগটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিধুমুখী খুব আদুরে গলায় বলল 'ওগো শুনছ, আজ একটু বড়ো সাইজের বাটা এনো না গো, সর্ষেবাটা পাতুরি করব।' তারপর প্রায় স্বগতোক্তির মতো বকে যেতে থাকে, 'খুকু-দুলালকে কত দিন হল কিছুই পাঠানো হয় না। দুলাল আমার হাতের রান্না বড্ড ভালো খায়। ওরা ছেলেমানুষ। ওরা কি আর রকমারী রান্নার হ্যাপা সামলাতে পারে! তার উপর দুলালকে আবার সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হয়। খুকু কী আর পেরে ওঠে একা হাতে এত সব!'

নৃপেনবাবু এটাই বুঝে উঠতে পারেন না, বিধুমুখী এই সংসারের সমস্ত ঝক্কি ঠেলে যদি সাত সতেরো পরিপাটি রান্না করে খাইয়ে তাঁকে সময় মতো অফিসে পাঠাতে পারে, তাহলে তার মেয়ে খুকু কেন পারবে না! ওই তো আমিটি-তুমিটির সংসার। এখনও ছানাপোনাও হয়নি। সংসারে দু-দুটো ঝি খাটছে, তবু নাকি তারা পেরে ওঠে না! কালে কালে কত কী যে দেখতে হবে! হরি হে, রাধামাধব...

খুকু ওরফে লাবণ্যপ্রভা নৃপেনবাবুর একমাত্র মেয়ে। গত অঘ্রাণে তার বিয়ে দিয়ে নৃপেনবাবু নিজের সবচেয়ে বড়ো কর্তব্যটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন আর এই কারণে মনে মনে যথেষ্ট উৎফুল্লতাও বোধ করেন। একমাত্র

মেয়ে বলেই নয়, লাবণ্য অত্যন্ত সুশীলা। লেখাপড়া, গৃহকাজে বরাবর মন ছিল তার। কিন্তু হাজার হোক, মেয়ে তো! বাপের মায়ের স্নেহের আঁচলে তো চিরকাল বেঁধে রাখা যায় না। তাই উপযুক্ত কর্মটি উপযুক্ত সময়ে সেরে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিয়ের পরেও বাপের কাছে মেয়ের স্নেহ ভালোবাসা, আদর-আবদারের অভাব হয়নি কোনো সময়। কিন্তু সাধের জামাই বাবাজীবনের উপর নৃপেনবাবু কিছুটা খাপ্পা। অমন হাড় হাভাতে হ্যাংলা ছেলে তাঁর নিজের কেন, ভূ-ভারতে কারো জামাই হতে পারে , এটা নৃপেনবাবু বিশ্বাস করেন না। সবচেয়ে রাগ হয় বিধুমুখীর আদিখ্যেতা দেখে। ফি হপ্তা মাছের পাতুরি, মাংসের কোরমা রান্না করে ওবাড়ি পাঠানো চাই। ছুটির দিনে কোথায় খেয়েদেয়ে ভাতঘুমে একটু শরীর জুড়োবেন, সারা সপ্তাহের ক্লান্তি দূর করবেন তা নয়, মাছ মাংসের বাটি হাতে ছুটতে হবে ওবাড়ি। কিন্তু গিন্নির মুখের উপর কিছু বলার মতো বুকের পাটা নৃপেনবাবু নেই, ছিলও না কোনোদিন। অগত্যা ব্যাগ হাতে মেনিমুখো হয়ে বাজারে যাওয়াই আশু কর্তব্য বলে মনে হল আপাতত।

শরতের মাঝামাঝি , আকাশে নীল মেঘেরা ভেলা ভাসিয়ে দিব্যি উদাসীন, অথচ গরমের কমতি নেই। যেন কোথাও থেকে একটু ঠাণ্ডা বাতাসও শহরে ঢোকার অনুমতি নেই। এক গুমোট গুহা।

বিধুমুখী আজ খুশিতে ডগমগ। খুন্তিকে দিয়ে সর্ষে বাটিয়ে নিচ্ছে শিলনোড়াতে, পাকা দেখে কাঁচালঙ্কা সহ। এ সবই বিধু শিখেছে নৃপেনবাবুর মায়ের কাছ থেকে। ঝাড়া পাঁচটি বছর শাশুড়ির কাছে শিক্ষানবিশি করতে হয়েছিল এজন্য বিধুকে। আজ সে নিজেই শাশুড়ি। চলছে জামাই সৎকারের আয়োজন। বাজারসুদ্ধ ব্যাগ হাতে ধরিয়ে দিয়ে নৃপেনবাবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। সেই সঙ্গে সুযোগ বুঝে এককাপ গরম গরম কড়া লিকার চায়ের আর্জিও পেশ করে এলেন। সকালের চায়ে এখনো শরীরের জড়তা ভাঙেনি। ব্যাগ হাতে বিধুমুখী খুশি হয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

নৃপেনবাবু খবরের কাগজটা মুখের সামনে মেলে ধরে অপেক্ষা করে বসে আছেন। চা এই আসে কি সেই আসে! কিন্তু না, সে চায়ের পাত্তা নেই। চা এখনো এল না, এল হুংকার। রান্নাঘর থেকে। রীতিমতো রণহুংকার যাকে বলে। গগনভেদী চিৎকার। নৃপেনবাবু নাদুসনুদুস লোক। ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠতে, নিজেকে গুছিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে একটু দেরি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিমধ্যে বিধুমুখী বাড়ি মাথায় তুলেছে।

নিচে নেমে তো নৃপেনবাবুর চক্ষু চড়কগাছ। দেখেন বিধুমুখী হাতে ৭ নম্বরের একজোড়া বাটা'র হাওয়াই চপ্পল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, গরম নিঃশ্বাসের হল্কা দূর থেকেই উপলব্ধ। দুটি শিং থাকলে নির্ঘাত.... নৃপেনবাবুর বুক ঢিপঢিপ। রাগে দুঃখে আবেগের উচ্ছ্বাসে কাঁদকাঁদ বিধুমুখী চপ্পলজোড়া নৃপেনবাবুর মুখের সামনে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো, 'এই তোমার বাটা মাছ!'

কী বলবেন নৃপেনবাবু! তিনি নিজেই কি ছাই জানেন নাকি কী হয়েছে তাঁর! খুব পুরনো রোগ নয়। মাস তিনেক হবে। তিনি অর্ধেক অর্ধেক কথা দিব্যি ভুলে যাচ্ছেন। আর তাতেই এই বিপত্তি।

প্রথমটায় তো তিনি বুঝতেও পারেননি। ভেবেছেন বয়স হয়েছে। অফিসে কাজকর্মের চাপে হয়তো বা এমন হচ্ছে। তার মধ্যে গোদের উপর বিষফোড়ার মতো ঐ ছোকরা অফিসার এসে জুটেছে। ছোকরাকে মোটেই পছন্দ নয় নৃপেনবাবুর। কোট-টাই পরে একেবারে বাবুটি। বয়োজ্যেষ্ঠদের বিন্দুমাত্র সম্মান দিতে জানে না। কিন্তু হাজার হোক অফিস বস বলে কথা। অফিসে আসতে দু-পাঁচ মিনিট এদিক-ওদিক হয়েছে কি কেবিনে তলব! অথচ নৃপেনবাবু এই অফিসের সবচেয়ে সিনিয়র এমপ্লয়ি। এক সময়ের ট্রেড ইউনিয়ন করা লোক। ও ছোকরা যেন এসব জেনেও না জানার ভান করে। কাউকে পাত্তা দেয় না। তাই নৃপেনবাবুর মতো মানুষকেও একটু সমঝে চলতে হয়।

তা যাই হোক, সেদিন হয়েছে কি—বেলা আড়াইটে নাগাদ সদ্য টিফিন সেরে গুঁড়ো মশলা আর মৌরী সহ একখানা পান মুখে গুঁজে একটু আয়েস করে বসেছেন মাত্র। অমনি বেয়ারা এসে খবর দিল, 'বাবু ডাকচেন'। ব্যাজার মুখে পান চিবোতে চিবোতেই নৃপেনবাবুকে উঠে যেতে হল সাহেবের চেম্বারে। সাহেব যেন মহাব্যস্ত। ফাইলপত্র থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'নৃপেনবাবু, তনিম কোম্পানির সেলস হেড মিসেস ব্যানার্জিকে একটা চিঠি করতে হবে। আমাদের লেটেস্ট প্রাইজ লিস্টটা ওদের জানিয়ে দেওয়া দরকার । আর খেয়াল রাখবেন এবারেও টেন্ডারটা যেন আমাদের ফেভারেই থাকে। বেশ একখানা সরেস করে চিঠি ড্রাফ্ট করে নিয়ে আসুন তো। আমি দেখে দেব, তারপর ডেসপ্যাচ করবেন।'

এই অফিসে নৃপেনবাবুর সাতাশ বছর হল। কেবল এ চেয়ার থেকে ও চেয়ার হয়েছে, শহরের অন্য ব্রাঞ্চ অফিসে পর্যন্ত বদলি করারও সাহস দেখায়নি কেউ, আর এই ছোকরা বলে কি না চিঠি দেখে তারপর ডেলিভারি! চিঠির ড্রাফ্ট করতে করতে চুল পেকে ঝরে গেল সব আর এখন এসব শুনতে হচ্ছে। কলি, ঘোর কলি! আবার ছোকরা বলে কিনা মশলাদার পান মুখে দিয়ে চেম্বারে ঢুকবেন না। গন্ধে গা গুলোয়! আস্পর্ধা কত!

নৃপেনবাবু কাজের মানুষ একথা সত্যি। শ্রমিক স্বার্থে ট্রেড ইউনিয়ন করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। তা বলে অন্যায়ভাবে

সুযোগ নেননি কোনোদিন। নিজের কাজের গুণেই অফিস তাঁকে ধরে রেখেছে এতদিন। নইলে তাঁর বয়সি অনেককেই এককালীন কিছু দিয়ে ভি .আর .এস. নিতে বাধ্য করেছে কর্তৃপক্ষ।

এদিকে নৃপেনবাবুও হেরে যাবার পাত্র নন। সময় নিয়ে বেশ করে একখানা সরেস চিঠি ড্রাফ্ট করে ঠোঁটে কোণে মুচকি হাসি ঝুলিয়ে স্যারের চেম্বারে হাজির হলেন। ছোকরা বসতে বলা তো দূরের কথা, চোখের ইশারায় চিঠিখানা রেখে চলে যেতে বললেন।

সমস্ত উৎসাহে কে যেন একপ্রস্থ জল ঢেলে দিল। প্রায় নিভে গিয়ে নৃপেনবাবু ফিরে এলেন নিজের চেয়ারে। ভেবেছিলেন এমন সুন্দর ড্রাফটিং, এর জন্য ছোকরার কাছে নগদ ধন্যবাদটা পাবেন। কিন্তু আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাছে কোনো কিছু প্রত্যাশা করাই বৃথা। এরা কেবল জানে যন্ত্রের ব্যবহার, প্রকৃত গুণীর কদর করতে জানে না মোটেও।

তা ডাক অবশ্য পড়েছিল আবার। প্রায় ঘন্টা দুই পরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন অফিসার। নৃপেনবাবুও ভেজা বেড়ালের মতো মুখ, কিন্তু মনে প্রফুল্লতা নিয়ে ঢুকেছিলেন অফিসারের চেম্বারে। ঘরে ঢুকতেই সামনের চেয়ারে চোখ রেখে বসতে বললেন অফিসার। নৃপেনবাবু তো বিগলিত প্রায়। এবারে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নৃপেনবাবু দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন 'পড়ুন, কী লিখে এনেছেন, নিজেই পড়ে দেখুন।'

সম্বোধনটা ঠিকই ছিল। তারপর কী যে হল! চিঠি পড়তে গিয়ে নৃপেনবাবুর নিজেরই কান লাল হয়ে উঠছিল। এ তো আদ্যন্ত সরেস এক প্রেমপত্র। পুরো চিঠি আর পড়া হল না। ধুতির ভিতর ঠকঠক করে পা দু'টি কাঁপতে লাগল। নৃপেনবাবুর আবার বারবার ইউরিনালে যাওয়ার ধাত। তারই মাঝে স্পষ্ট দেখলেন ছোকরা চিঠিখানা ওয়েস্ট পেপারবিনে না ফেলে সুন্দর ভাঁজ করে নিজের কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। জানি না কী করবেন তিনি! হরি হে রাধামাধব, রক্ষা করো।

ভবতারিণী সহায়। ঘরে ও অফিসে দুটি বিষয়ই বেশি দূর গড়ায়নি। পরের রোববার গিন্নিকে বাটা মাছের সঙ্গে গলদা চিংড়ি আর ভালো দেখে পাঁঠার মাংসই শুধু এনে দিয়ে ক্ষান্ত হননি, গিন্নি হাসিমুখে দু-হাত ভরে রাঁধলে সেগুলো টিফিন বক্সে ভরে খুকু ও জামাইয়ের জন্য দিয়ে এসে গর্বের হাসি হেসেছিলেন নৃপেনবাবু। আর অফিসারও সেই চিঠির প্রসঙ্গ আর না তোলায় বিষয়টা ওখানেই ধামাচাপা পড়েছে।

এই যে নৃপেনবাবু কোনো কোনো বিষয় অর্ধেক অর্ধেক বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন সেটা নিয়ে তিনি একদম চিন্তা করেননি তা নয়। তবে তাঁর স্থির বিশ্বাস যেহেতু তিনি জামাইবাবাজী ও ছোকরা অফিসারকে বিশেষ সুনজরে দেখেন না, তাই হয়তো তাঁর অবচেতনও চেয়ে থাকতে পারে কিছু কিছু বিষয় ভুলে যেতে। ফ্রয়েডেরও তো কী সব তত্ত্ব টত্ত্ব আছে এগুলোর উপর। তা এসব তো আর গালগল্প নয়, সব বিজ্ঞান।

কিন্তু নতুন করে হয়েছে এক বিপত্তি, যা নিয়ে ফ্রয়েড সাহেবও বিবৃতি দিতে ব্যর্থ হবেন নির্ঘাত। আর মুশকিল হল, সে কথা কাউকে তিনি বলতেও পারছেন না। বিশেষ করে বিধুমুখীকে তো একদমই নয়। সে একবার এসব কাণ্ড জানতে পারলে সংসারে কুরুক্ষেত্র বাঁধাবে। চিন্তা হচ্ছে সেটা নিয়েই।

এই দুদিন আগের কথা। নেয়ে খেয়ে ফিটফাট ধুতি পাঞ্জাবি পরে, পামশু চমকিয়ে রোজকার মতো অফিসে যাবার জন্য ৪৫ বি বাস ধরবেন বলে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে তিনি। বাস এল। উঠে পড়লেন। খুব বেশি ভিড় নেই । প্রথম স্টপেজ আসতেই একজন যাত্রী নেমে গেলে বসার জায়গাও পেয়ে গেলেন। জানালা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছিল আর চোখে ভাতঘুম। বাস থেকে নেমে মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেল। সারি সারি দু-দিকে দোকান মাঝখান দিয়ে চাপা রাস্তা। দোকানে-দোকানে ঝুলছে লাল জবা ফুলের মালা। ধূপকাঠি, ধুনো, ফুল বাতাসার মিলিত সৌরভে মনটা মা মা করে ডেকে উঠল। সোজা গিয়ে ভবতারিণী মায়ের মন্দিরে গড় করে প্রণাম করে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলেন নৃপেনবাবু। ছোটবেলার কত কথা এক এক করে মনে এসে ভিড় করতে লাগল। বাবা করতেন পুরুতের কাজ। গঙ্গার ঘাটে শান্তি স্বস্ত্যয়নের কাজ লেগেই থাকত। নিপু ছিল বাবার সঙ্গী। খাটত ছোটখাটো ফাইফরাশ। যখন যেমন দরকার। এই নিপু এটা এগিয়ে দে, নিপু কুশগুলো নিয়ে আয়। কাজ শেষে চাল কলা টাকা পয়সা গুটিয়ে নিয়ে মায়ের কাছে হাজির করাই ছিল ছেলেবেলার নৃপেনবাবুর কাজ। আহা, কী আনন্দময় ছিল সেইসব দিনগুলো! মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন বাবার বন্ধু। দেখা হলেই বলতেন, 'যা যা নিপু গঙ্গায় ডুব দিয়ে আয়। গঙ্গা চান করলে পুণ্যি হয় রে ব্যাটা। সাত জন্মের পাপ ধুয়ে যায়। তোর জন্য মায়ের ভোগের প্রসাদ রেখেছি, যা আগে নেয়ে আয় দিকিনি।'

কতদিন এমন গঙ্গা নাওয়া হয়নি। আজ এমন একটা সুযোগ এসেছে, হয়তো মা ভবতারিণীই তাঁকে ডেকে এনেছেন। খানিক নেয়ে নেবেন নাকি এমনই দোনোমনায়। ঠিক তখনই 'আরে, নিপুদা না?' মেয়েলি কণ্ঠের সুরেলা ডাক কানে এল।

অনেকদিন পর ওই নামটা কানে পড়তেই নৃপেনবাবু কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। বাবা-মা গত হয়েছেন প্রায় বছর পনেরো হল। গ্রামের বাড়ির সব পাট চুকিয়ে দিয়ে নৃপেনবাবু এখন পুরোদস্তুর শহুরে। 'নিপু' নামটা গলার পৈতের মতো

গ্রামেই ছেড়ে এসেছেন। আজ আবার হঠাৎ এতদিন পর কে তাঁকে পুরনো নাম ধরে ডাকে! খুব খানিক অবাক হলেও, নৃপেনবাবুর কানে এই পুরনো নামটা যেন মধুর সুরে বর্ষিত হল। পেছন ফিরে দেখেন বিধুমুখী, সলজ্জ হাসছে, হাতে তার পুজোর থালা, তাতে দূর্বা , তুলসি, চন্দন, সিঁদুর, বাতাসা, সন্দেশ।

'বিধু, আমার বিধু।' নৃপেনবাবু ভাবছেন সেই তরুণীমুখ। সেই পঁচিশ বছর আগের বিধুমুখীকে—লালপাড় শাড়ি, কপালে টিপ তখনো সিঁথিতে সিঁদুর ওঠেনি। বিয়ে হওয়ার আগে একদিন তাঁদের চার চোখ এক হয়েছিল এই গঙ্গার ঘাটে। লাজুক মুখে নৃপেনবাবুর হাতে গুঁজে দিয়েছিল একখণ্ড বাতাসা, নলেন গুড়ের সন্দেশ আর প্রসাদীফুল।

আজ আবার বড়ো সাধ হচ্ছে এই গঙ্গার ধারে বসে নিত্যদিনের খিটিমিটি ভুলে বিধুর সঙ্গে দুটো ভালোবাসার কথা কইতে।

নৃপেনবাবু সহাস্যমুখে বিধুমুখীর হাতদুখানি ধরে আদর করে বসালেন পাশে। কিন্তু কীভাবে শুরু করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। রোজকার বিধুমুখী আর আজকের বিধু তো এক নয়। তিনি চুপ করে আছেন। এদিকে বিধুর মুখে কথার ফুলঝুরি তখন। কত কথাই যে সে বলে যাচ্ছে তার কিছু নৃপেনবাবুর কানে আসছে কিছু আসছে না। নাহ্, মাথাটা ঠিক কাজ করছে না। 'বিধু, তুমি একটু বোসো, আমি বরং গঙ্গায় একটা ডুব দিয়েই আসি।' নৃপেনবাবুর ধারণা গঙ্গায় দুটো ডুব দিয়ে এলে মাথাটা পরিস্কার হয়ে যাবে।' তুমি বরং তোমার গলায় জড়ানো গামছাটা আমায় দাও, তারপর জমিয়ে গল্প করব দুজনে।' গামছাটা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতেই স্পষ্ট কানে এল, 'নিপুদা যে কি না! এত বছর পরেও বিধুদির আঁচলে বাঁধা পড়ে আছেন। বিধুদিকে ছাড়া আর কোনো মেয়ের মুখ চোখেই পড়ে না। সেই প্রথম দিন থেকে ইশারার পর ইশারা দিয়ে যাচ্ছি। তা তিনি বুঝলে তো! হাঁদা গঙ্গারাম কোথাকার!'

হুমম ...এবার ঠিক চিনতে পেরেছেন নৃপেনবাবু। চমকে পেছন ফিরতে গিয়ে ধুতির খুঁটে পা জড়িয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন আর কী! ভাগ্যিস অবিনাশবাবু ধরে ফেলেছেন।

অবিনাশবাবু নৃপেনবাবুর এক সময়ের সহকর্মী। এক অফিসে কাজ করেছেন দীর্ঘ দিন। সেই সুবাদে সুসম্পর্ক। বারাসতের বাঞ্চ অফিসে ট্রান্সফার হয়ে গেছেন বছর খানেক আগে। এতদিনে আবার দেখা। 'আরে আরে নৃপেনদা, কি করছেন কি! আর একটু হলেই তো পড়ে যেতেন। এই বয়সে এত ছোটাছুটির কী আছে? গঙ্গা স্নান করতে এসেছেন ধোপদুরস্ত বাবুটি সেজে? ব্যাপারটা কী মশাই অফিস আওয়ার্সে গঙ্গাস্নান? আপনাকে তো বহুদিন দেখেছি, অকারণে অফিস কামাই করার লোক তো আপনি নন মশাই। আর সাজগোজটিও তো বিলক্ষণ অফিসের বড়বাবুর!'

সম্বিত ফিরল নৃপেনবাবুর। তাই তো! তিনি ধরেছিলেন ৪৫ বি বাস , অফিসে যাবেন বলে , আর তিনি কি না এলেন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে! এ তো ভারী আশ্চর্যের কথা। আর তার চেয়েও বড়ো আশ্চর্যের কথা ওই নারী কণ্ঠ। এ তো বিধুর গলা নয়, এ কণ্ঠ তিনি বিলক্ষণ চিনতেন একসময়। এ যে চন্দ্রমুখী'র। বিধুমুখীর খুড়তুতো বোন। বিধুর মাস ছয়েকের ছোটো। সবাই একই গাঁয়ের বলে নৃপেনবাবু বিয়ের আগে থেকেই চিনতেন। বিধুর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হবার পরও একাধিক বার বিভিন্ন ইশারা-টাশারা করেছিল নৃপেনবাবুকে। যদিও তিনি মোটেও পাত্তা দেননি সেসব। শুনেছিলেন কম বয়সে মেয়েটি একবার কার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। বাড়ির লোকজন আবার ফিরিয়েও এনেছিলেন। তাছাড়া তখন তাঁর সমস্ত মন জুড়ে শুধুই বিধুমুখী—তাঁর আদরের বিধু।

তাঁদের বিয়ের চারদিনের মাথায় গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল চন্দ্রমুখী। গঙ্গাস্নান করে ভবতারিণীর পুজো দেবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই বিপত্তি ঘটিয়েছিল সে। আর সেজন্যই তো তাঁদের অষ্টমঙ্গলার গিঁট খুলতে শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া হয়নি। এখনও সব স্পষ্ট মনে আছে নৃপেনবাবুর।

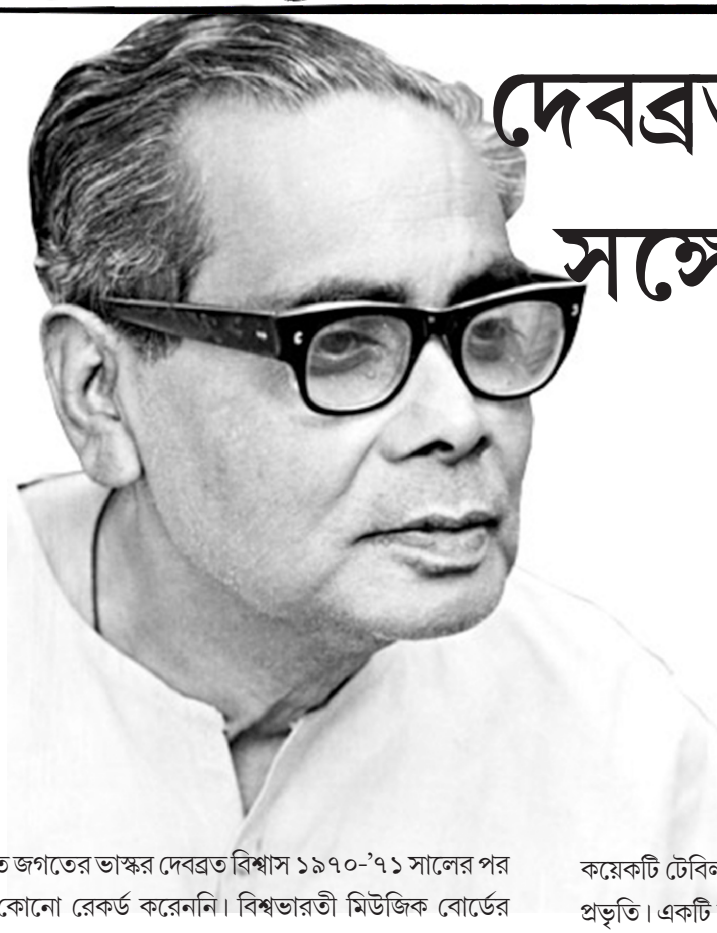

দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে কিছুক্ষণ

অরুণদেব গুপ্ত

রবীন্দ্রসংগীত জগতের ভাস্কর দেবব্রত বিশ্বাস ১৯৭০-'৭১ সালের পর আর নতুন কোনো রেকর্ড করেননি। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের জনাকয়েক পরীক্ষক—তথাকথিত কিছু রবীন্দ্রসংগীত বিশারদ নানান অজুহাতে তাঁর বেশ কয়েকটি রেকর্ড অনুমোদন না করায় শিল্পীর গভীর আত্মসম্মান বোধ তাঁকে নতুন গান রেকর্ড করতে বাধা দিয়েছে। রেকর্ডে তাঁর কণ্ঠে নূতন গানের সুর আর শুনতে না পাওয়ার বেদনা সকল রবীন্দ্রসংগীতানুরাগীকেই ব্যথিত করবে। এই সমস্ত কারণে বেশ কিছু প্রশ্ন বহুদিন থেকেই আমাদের মনে জেগে উঠছিল। তা নিয়ে একদিন সকালে আমরা তাঁর বাড়িতে হানা দিই। ১..... ই, রাসবিহারী অ্যাভেন্যুর সদর সকলের জন্যই অবারিত। সুতরাং দেখা পেতে কোনো অসুবিধা হল না।

সদর দিয়ে ঢুকতেই গম্ভীর কণ্ঠের আহ্বান ভেসে এল—'আসেন'। সিঁড়ির পাশের ছোট্ট ঘরটার দরজায় দাঁড়ালেই ভিতরের সবকিছু দেখা যায়। দক্ষিণে দুটো জানালা। তার পাশে একটি ছোটো চৌকি, তাতে যেরকম রাশিকৃত জিনিস তা দেখে মনে হয় চৌকি তার আসল কাজ অনেকদিন আগেই ভুলে গেছে। জানালার উল্টোদিকের দেয়ালে কয়েকটি টেবিল। তাতেও স্তূপীকৃত বই, পানের সরঞ্জাম, ওষুধ প্রভৃতি। একটি বড়ো স্টিলের আলমারি। এই সবের মাঝখানে একটা স্টিলের হেলানো চেয়ারে বসে একজন ভদ্রলোক সামনের স্ট্যান্ডে রাখা হারমোনিয়ামের উপর গোটাকয়েক আলু-পেঁয়াজ ছাড়াচ্ছেন। বোঝা গেল একমাত্র গানের সময়েই এটার স্বরূপ বেরোয়, অন্যসময়ে টেবিলের ছদ্মবেশেই বেচারাকে থাকতে হয়। বৃদ্ধ মানুষটির পরণে একটি হাফ হাতা ছাইরঙের পুলওভার ও একটা বাটিকের .....। আমরা চারজন ..... উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বসার জায়গা—চারটি বেতের টুল এসে হাজির হল। সেগুলিকে ..... বিন্দুমাত্র জায়গা রইল না।

ওঁর স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, 'হাঁপানি তো আছেই। তার ওপর কয়েকদিন আগে মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘরের মধ্যে পড়ে গেলাম। সেই থেকে কোমরে ও পায়ে এমন ব্যথা যে ক্রাচ্ নিয়ে চলতে হচ্ছে। দেখালেন ব্যথা কমাবার জন্য Suganril ট্যাবলেট্ খাচ্ছেন। হঠাৎ নজরে পড়ল খাটের

ওপর এক খণ্ড পিচবোর্ডের ওপর লেখা 'দয়া করিয়া বিশেষ কারণে আমায় কেহ ছুঁইবেন না'। কী ব্যাপার প্রশ্ন করতেই একগাল হেসে বললেন জর্জদা, 'হাঁপানির জন্য এক ভদ্রলোক একটা মাদুলি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন অশুচি রমণী, অশৌচ, আঁতুড় ও অন্যান্য অপবিত্র লোককে স্পর্শ করলে অসুখ বাড়বে। তিনি বলেছেন এই বিধান স্বয়ং শিবের। আমি তো আর লোককে অপবিত্র কিনা জিজ্ঞাসা করতে পারি না—তাই এই ব্যবস্থা। তবে আমিও তাঁকে বলেছি, আমার সঙ্গেও বহুদিন আগে একবার শিবের দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছেন—'আমিই মানুষ সৃষ্টি করি তবে কিসের আঁতুড়, আমিই মানুষকে মৃত্যু দিই তবে কিসের অশৌচ। আমিই রমণীদের সৃষ্টি করি তবে কিসের অশুচি? আপনার শিব আপনাকে ব্লাফ দিয়েছেন।'

এবার শুরু হল আমাদের প্রশ্নবান।

প্রশ্ন এককালের কট্টর বামপন্থী হলেও আজ আপনার ঘরে সাঁইবাবার ফটো কেন?

কৌটো থেকে ছেঁচা পান মুখে ফেলে হেসে বললেন দেবব্রত বিশ্বাস—'আমি সাঁইবাবার ভক্ত নই, উনিই আমার ভক্ত। উনি সুদূর কানাডা থেকে আমার ঘরে গান শুনতে এসেছেন। উনি শূন্য থেকে কলম, রসগোল্লা ইত্যাদি আনতে পারেন কিন্তু শূন্য থেকে পঞ্চাশ হাজার মণ চাল আনার ক্ষমতা ওঁর নেই। থাকলে তা তিনি সকলকে দিতেন। তবে আমি ওঁর ভক্ত হতে যাব কেন?' এরপর একসময় বললেন, 'ওঁর ছবিতে বিভূতি পড়ে না, কিন্তু ধুলো পড়ে।'

প্রশ্ন আপনি ইশ্বর মানেন?

হাঁপানির চোটে ওঁর দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। মুখে খানিকটা স্প্রে দিয়ে বললেন, 'একটা খুব গোলমেলে ব্যাপার। ছোটোবেলা থেকে ব্রাহ্ম মন্দিরগুলিতে ও ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানে গান গেয়েছি। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা আমার মনে বাসা বাঁধাতে পারেনি। তবে আমার মনে হয় সব কিছুর মূলেই রয়েছে এক অলৌকিক শক্তি। সেই শক্তি যেখানে বলে ভূমিকম্প সেখানে ভূমিকম্প হয়। যেখানে বলে ঝড় সে অঞ্চল ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত হয়। সেই শক্তিই মানুষকে সুবুদ্ধি অথবা দুর্বুদ্ধি দেয়। সেই শক্তির প্রভাবেই প্রশ্ন করে আমাকে উত্যক্ত করার বদ্‌বুদ্ধি আপনাদের মাথায় এসেছে।'

প্রশ্ন রেকর্ডের মতো মঞ্চে বা বেতারে আপনি বহুল পরিমাণে বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যবহার করেন না কেন?

উত্তর মঞ্চে বেশি বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যবহার করলে ব্যয় খুব বেশি হয়। আর বেতারে নির্দিষ্ট কিছু বাদ্যযন্ত্রের মধ্যেই গাইতে হবে। সেইজন্য ঐ দুই ক্ষেত্রে বেশি Instruments ব্যবহারের সুযোগ নেই।

প্রশ্ন 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত' বইতে আপনি লিখেছেন যে আপনি ব্রাত্য অর্থাৎ হরিজন। কিন্তু আপনি তো ব্রাহ্ম। তবে ব্রাত্য বলার কারণ কী?

উত্তর ব্রাত্য মানে বিধর্মী বা ম্লেচ্ছ। আমি ব্রাহ্ম, একপ্রকার ম্লেচ্ছই তো। তাছাড়া ছেলেবেলায় স্কুলে আমার সঙ্গে এক বেঞ্চে কেউ বসত না। সুতরাং আমি ব্রাত্য।

প্রশ্ন 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত' নামটি প্রকাশকের দেওয়া। আপনার দেওয়া নামটি ছিল 'ব্রাত্যজনের পরিকথা'। এই নামের তাৎপর্য কী?

সোজাসুজি উত্তর এড়িয়ে গিয়ে উনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন 'পরিকথা মানে কী?' আমাদের উত্তর ওঁর মনঃপূত হল না। পাশের টেবিলের রাশীকৃত বই থেকে একটি চলন্তিকা বের করে পড়ে শোনালেন, 'পরিকথা মানে; বিস্ময় ও কৌতূহলোদ্দীপক গল্প।' বললেন, 'আপনাদের মতো উপদ্রব তো প্রায়ই আমার কাছে আসে, তাই সবকিছুই হাতের কাছে রাখতে হয়। কিন্তু আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব বলল পরিকথার বদলে রুদ্ধসংগীত দিতে। রুদ্ধ মানে যা থেমে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে—আমার গানকেও তো আমি থামিয়ে দিয়েছি।'

গান থামালে কী হবে? দেবব্রত বিশ্বাসের অসংখ্য গুণমুগ্ধ শ্রোতার ভালোবাসার স্রোত কিন্তু থামেনি। এই তো সেদিন গিয়েছিলেন দক্ষিণ কলকাতার এক ব্রাহ্ম মন্দিরে গান গাইতে। পূর্বেই শিল্পী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে পৌঁছে দেখেন চারিদিকে অসংখ্য লোক। রাস্তা বন্ধ। বেশ কিছুটা দূরে ওঁকে গাড়ি থেকে

নামতে হল। হেঁটে যাবার সময় এক পুলিশ অফিসারকে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, 'আজ এখানে দেবব্রত বিশ্বাস আসছেন। তাই শুনতে এই প্রচণ্ড ভিড়। উদ্যোক্তারা ভিড় সামলাতে না পেরে আমাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। তা আপনিও কি তাঁর গান শুনতে যাচ্ছেন?'

হাসির রেশ না মিলাতেই আবার প্রশ্ন হল, বেশির ভাগ শিল্পীই H.M.V. তে রেকর্ড করেন। কিন্তু আপনি করেন না কেন?

পানের পিক ফেলে সোজা উত্তর দিলেন জর্জ বিশ্বাস, 'অনেকেই তো বিয়ে করেছে—আমি করিনি কেন? প্রথম দিকে H.M.V তে রেকর্ড করেছিলাম। পরে ছেড়ে দিয়েছি। সে সব অনেক ব্যাপার।'

প্রশ্ন ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে আপনার কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর সে রকম কিছু অভিজ্ঞতা নেই। এসে বললেন গান গাইতে হবে। স্ক্রিপ্ট পড়ালেন। রাজি হয়ে গেলাম।

প্রশ্ন আপনার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হয়েছিল তার কোনো প্রতিবাদ

না করে আপনি দূরে সরে গেলেন কেন? এবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উত্তর এল, 'কে বল্লে আমি প্রতিবাদ করিনি? আমি এর অনেক প্রতিবাদ করেছি বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়ে ..... আর এরই প্রতিবাদে রেকর্ড করা বন্ধ করেছি।'

বইটি প্রকাশিত হবার পর মিউজিক বোর্ড ওঁর ..... থাকা একটি গান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—..... was not sung according to the notation সঙ্গে জানিয়েছেন—বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী মিটিং-এ আলোচনা হবে। তারপর দু-মাস কেটে গেছে। কিন্তু আর কোনো চিঠি আসেনি। বহু ব্যক্তি এই অনুযোগ করে শিল্পীকে চিঠি লেখেন যে তিনি অভিমানবশত শ্রোতাদের বঞ্চিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে দেবব্রত বাবু বললেন, 'আমি অভিমানী নই। কিন্তু আমার আছে যৎসামান্য আত্মসম্মান বোধ। বিশ্বভারতীর কিছু মাঝারি কর্তার পায়ে আমি তা বিসর্জন দিতে পারব না।'

এরপর বিদায়ের পালা। তারপর রোগের ভারে জর্জরিত এই শিল্পী নিজের রান্নায় বসবেন। একদিকে দুরারোগ্য হাঁপানি। অন্যদিকে তাঁর প্রতি এই অবিচার। সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী পঙ্কজ কুমার মল্লিকও এই একই ভাবে অপমানিত হয়ে বেতার থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। গানের মালা অর্ধেক গেঁথেই তাঁকে উঠে আসতে হয়েছিল। আজ আমরা কি তারই পুনরাবৃত্তি দেখছি!

জর্জ বিশ্বাস এখন আর প্রায় বাড়ি থেকে বেরোন না। হাঁপানি তাঁকে গান ছাড়তে বাধ্য করেছে, করেছে গৃহবন্দী।

আজকাল মাঝে মধ্যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মমন্দিরেই গাইতে যান। তবে প্রতিদিন বহু নাম না জানা ভক্ত তাঁকে চিঠি লেখে। তিনি প্রতিটি খুঁটিয়ে পড়ে তার উত্তর দেন। চিঠি এবং উত্তরের কার্বন কপি ফাইল করে রাখেন। এইভাবেই বর্তমান দিনগুলি তিনি অতিবাহিত করছেন।

শুধু প্রসিদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত সাধকদেরই নয়, নতুন প্রতিভাধরদেরও বহু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই রকম চলতেই থাকলে একদিন দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথকে নির্বাসিত করে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষই তাঁর স্থান অধিকার করে বসে আছে। পরিশেষে রবীন্দ্রসংগীত জগতের 'হরিজন' এই মানুষটির কয়েকটি কথা কানে বাজছে—'রবীন্দ্রসংগীত জগতে হয়ে গিয়েছিলাম 'হরিজন'। সেই হরিজন হয়েই আমার জীবনের শেষ কয়েকটা দিন অতিবাহিত করতে হবে। শুনতে পাই হরিজনদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চারিদিকে নানা চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত জগতে আমার মতন হরিজনকে একটু ঠাঁই করে দেবার চেষ্টা হবে কিনা জানি না। যদি ভবিষ্যতে সেই সৌভাগ্য কখনো হয় তখন হয়তো আমার কণ্ঠস্বর আমায় ছেড়ে উধাও হয়ে যাবে, কিংবা আমিও হয়তো এই জগৎ থেকে হয়ে যাবো উধাও।'

সাক্ষাৎকারটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে অরুণদেব গুপ্ত সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'আর্জব' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায়। রচনাটি বিস্মৃতির অতল থেকে উদ্ধার করেছেন তরুণ নায়েক এবং অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হল শিবাদিত্য দাশগুপ্তের সৌজন্যে।

সম্পাদক, বাংলা

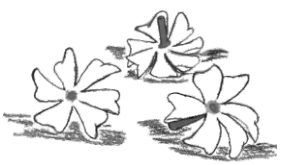

ইস্টবেঙ্গল তুমি কার?

প্রসেনজিৎ মজুমদার

কথা হচ্ছিল বরানগরের একজন বাম কর্মীর সঙ্গে। ভদ্রলোকের ঠাকুর্দা দেশভাগের সময় এক কাপড়ে সপরিবারে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদেশে পালিয়ে এসেছিলেন। ভদ্রলোকের বাবা তখন নেহাৎই কিশোর। অন্ধ ইস্টবেঙ্গল সমর্থক ভদ্রলোক বলছিলেন যে, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের অবস্থা এখন হয়েছে অনেক টা সিপিএম-কংগ্রেসের মতো। একদল সোয়া শো বছরের ক্লাব তুলে সাত বছরের ক্লাবের লেজুড় হয়ে আত্মশ্লাঘা অনুভব করে। আর ইস্টবেঙ্গল? তারা তাদের কর্মকর্তাদের আধাপেশাদারি মানসিকতার জন্য ভারতীয় ফুটবলে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। ভেবে দেখলে ভদ্রলোক কিন্তু খুব একটা ভুল বলছেন বলা যায় না। গত দু-বছর ধরে ইনভেস্টার নিয়ে যে অশান্তিতে

ভুগছে ইস্টবেঙ্গল তা তাদের নিজেদেরই আধাপেশাদার মানসিকতার ফল। প্রথমে কোয়েস তারপর শ্রী সিমেন্ট। নিজেদের শর্তে ইনভেস্টারকে সই করাতে গিয়ে ক্রমশ হাসির খোরাক হয়ে যাচ্ছে বাঙালির গর্বের ফুটবল ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। এক অলীক কুনাট্য বঙ্গে মজেছে যেন দলটা---আড়ালে-আবডালে বলছেন অনেকেই। আরেক মোহনবাগান সমর্থক সুরজিত চক্রবর্তী জানালেন, 'আমি মোহনবাগান সমর্থক হতে পারি কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ছাড়া মোহনবাগান অসম্পূর্ণ। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ডার্বির জন্য। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কর্তারা এতদিন হয়ে গেল একটা সমাধান সূত্র বার করতে পারলেন না? গতবছর শেষ মুহূর্তে দল গড়ে আইএসএলে নবম। এটা কি ওদের মানায়?' নিন্দুকেরা বলছে ক্লাব-থেকে-পয়সা-উপার্জন-করা কর্মকর্তারা বুঝতেই পারছেন ইনভেস্টার ও স্পনসর এক নয়। ইনভেস্টার যেমন ক্লাবের আর্থিক দায়ভার গ্রহণ বহন করবে তেমনি বিনিময়ে ক্লাবের পূর্ণ কর্তৃত্ব চাইবে। ক্লাবের বোর্ড অব ডিরেক্টরসে ক্লাবের দু-জন প্রতিনিধির বেশি থাকবে না। দশজনের কমিটিতে আটজন হবে ইনভেস্টারের লোক। কারণ, আইএসএল খেলার জন্য পাঁচ

বছরে তিনশো কোটি টাকা দিচ্ছে। ফলে, তাদের শর্তেই সব কিছু হবে। এখানে আবেগের কোনো ভূমিকা নেই। আর ঠিক এইখান থেকেই গত এক বছরের অলীক কুনাট্য রঙ্গের সূচনা। সাংবাদিক কুনাল দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ইস্টবেঙ্গল ও শ্রী সিমেন্ট উভয়েরই উভয়কে দরকার। কিন্তু তা বলে চুক্তিপত্র নিয়ে দফায় দফায় কথা বলে অদ্ভুত এই অচলাবস্থা জিইয়ে রাখছে কেন? মুখ্যমন্ত্রী ইনভেস্টার এনে দিলেন। কোয়েস চলে যাবার পর ইস্টবেঙ্গল যা বদনাম কুড়িয়েছিল, তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি ইনভেস্টার যোগাড করা। কর্তারা চুক্তিপত্র পড়তে পারলেন না ছ-মাসেও! অথচ মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন এতদিন! অথচ দল আইএসএলে খেলছে। আগামী মরসুমে কী হবে তা নিয়ে ভাবনাই নেই। শেষ মুহূর্তে সমর্থকদের দোহাই দিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা? 'তাঁর আরো মত, ইস্টবেঙ্গল কর্তারা আসলে কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে ভীত।

কারো কারোর মতে, ইস্টবেঙ্গল কর্তারা হলেন, 'এমনি করে যায় যদি দিন যাক না'র আদর্শ উদাহরণ। ক্লাব কর্মকর্তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল পক্ষের বক্তব্য হল 'শ্রী সিমেন্টকে আম জনতা কি আগে চিনত? ওরা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে টাকা ঢালছে নিজেদের স্বার্থে। ক্লাবের স্বার্থ তো দেখতে হবে।' প্রশ্ন হল, শ্রী সিমেন্ট চুক্তিতে ঠিক কী বলেছে যা থেকে এই বিতর্কের সৃষ্টি! জানা গেছে স্পোর্টিং রাইটস, এক্সিট ক্লজ ও সমর্থকদের যত্রতত্র ঢোকা নিয়ে বিধিনিষেধ এই তিনটি বিষয়ে এসে আপাতত ঠেকে আছে সব। কাটছে না জট। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইস্টবেঙ্গলের এক শীর্ষ কর্তা জানালেন, 'শ্রীর দাবি ফুটবল সহ সব খেলার রাইটস তাদের দিতে হবে। এর অর্থ হল হকি, ক্রিকেট দলও তারা করবে। বাজেট তারা ঠিক করবে। আমরা বলেছি ইস্টবেঙ্গলের যাবতীয় নাম মূলত ফুটবল খেলে। তাই ওই রাইটসটা রেখে বাকিটা আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। ওঁরা অনড়। দ্বিতীয়ত, এই এক্সিট ক্লজটি খুব গোলমেলে। যদি ওরা বা আমরা কেউ একজন চুক্তি ছেড়ে বেরিয়ে আসে তাহলেও স্পোর্টিং রাইটস শ্রী সিমেন্ট আমাদের ফিরিয়ে দেবে না। প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে। ফলে ওরা টিম নামাবে আর আমরা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে ব্যাপারটা দেখব এটা হতে পারে না।' আর সমর্থকদের বিধিনিষেধ প্রসঙ্গে আরেক সদস্য অরিন্দম সেনগুপ্ত জানালেন, 'শ্রী সিমেন্ট তার চুক্তিপত্রে সমর্থকদের অনুপ্রবেশকারী বলেছে। যেটা নিসন্দেহে আপত্তিকর। কারণ ফ্যানবেস ক্লাবের ক্ষেত্রে সমর্থকরাই সব। তাঁদের জন্যই ক্লাব। তাঁদেরকে অস্বীকার করা যায়।' ওকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় নাকি যদি দ্রুত সমাধান সূত্র বার করতে না পারে তাহলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বন্ধ করে দিতে হবে। ইতিমধ্যেই ক্লাব ছেড়েছেন ব্রাইট এনোবাখারে, নারায়ণ দাস, দেবজিত মজুমদার, সার্থক গোলুই, হরমনপ্রীত সিং সহ একঝাঁক তারকা। অপরদিকে হরমনপ্রীত খাবড়া সহ একঝাঁক তারকা শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলে জয়েন করেননি। অরিন্দমবাবু অবশ্য এ ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারলেন না। এদিকে গত ২০ জুলাই ক্লাবের এক্সিকিউটিভ কমিটির একটা মিটিং ছিল। আশা করা হয়েছিল নরম হওয়ার বার্তা দেবেন কর্তারা, কিন্তু তাঁরা প্রাক্তনদের ক্লাবে এসে চুক্তিপত্র দেখে যেতে বলছেন। পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানাচ্ছেন। কিন্তু এতেও কি কোনো সমাধান সূত্র বের হবে? সূত্রের খবর এফএসডিএল এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে যা বলার বলে দিয়েছে। শুধুমাত্র একটা ক্লাবের ওপর ভিত্তি করে আইএসএলের মতো পেশাদার লিগের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে পারে না। কলকাতা লিগের ক্ষেত্রে একই বক্তব্য আইএফএর। পাশাপাশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত, ইরানের প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড় ওমিদ সিং-এর সঙ্গে নিজেরাই চুক্তি করেছিলেন আইএসএল খেলানোর জন্য। বছরে দেড় কোটি টাকার চুক্তি হয়েছিল। শ্রী সিমেন্ট সেই চুক্তির মান্যতা দেয়নি। ফলে ওমিদ সিং-এও আইএসএল খেলা হয়নি। ওমিদ সিং চুক্তি অনুযায়ী টাকা পাননি। তিনি ফিফার দ্বারস্থ হয়েছেন। ফিফা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে নির্দেশ দিয়েছে ওমিদের টাকা মেটাতে—যে টাকা মেটাতে হবে নীতু সরকারদেরই। শ্রী সিমেন্ট যেহেতু ওমিদের সঙ্গে চুক্তি করেনি তাই তারা দায়িত্ব নেবে না। প্রসঙ্গত কোলাডো, জনি আকুস্টা সহ আরো বেশকিছু খেলোয়াড়ের এই ধরনের বকেয়া মিটিয়ে ট্রান্সফার ব্যান আটকে ছিল ইস্টবেঙ্গল। সেক্ষেত্রেও প্রাক্তন ইনভেস্টার কোয়েস দায়িত্ব নেয়নি। ওমিদ সিং-এর জন্য আবারও ট্রান্সফার ব্যানের খাঁড়া ঝুলছে ইস্টবেঙ্গলের মাথায়। এছাড়াও চুক্তি ভঙ্গ হলে শ্রী সিমেন্ট ৬০ কোটি টাকা দাবি করবে ইস্টবেঙ্গলের কাছে। শ্রী সিমেন্টের দাবি ইতিমধ্যেই ওই টাকা তাঁরা খরচ করেছেন। ফলে পড়শি ক্লাব মোহনবাগান যখন চলতি ইউরো কাপ থেকে খেলোয়াড় রিক্রুট করছে তখন ক্লাব ও ইনভেস্টারের দড়ি টানাটানিতে ফুটবল ছেড়ে আরো অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল।

সত্যজিৎ ও নারী

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

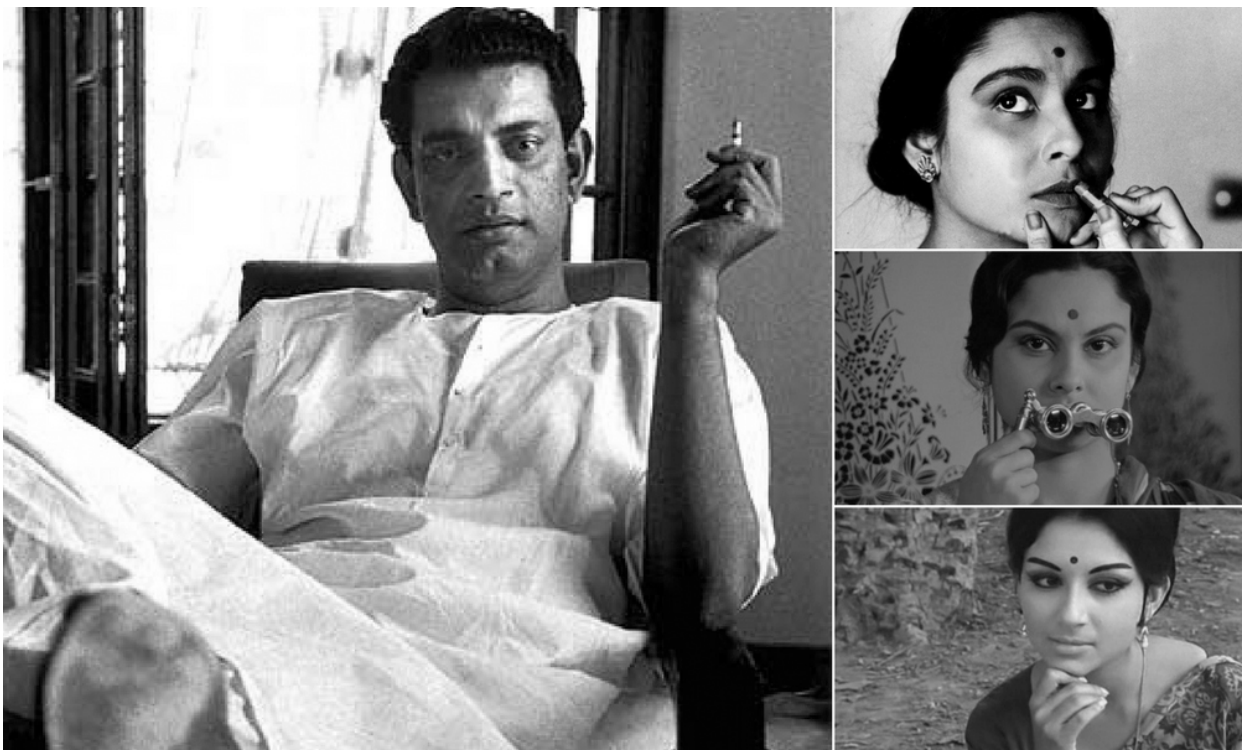

এইমাত্র শেষ হল। কী শেষ হল? গোয়েন্দাগিরি। গোয়েন্দাটি কে? স্বয়ং আমি! আমি করলাম গোয়েন্দাগিরি? ঠিক তাই। কোথায়? ফেলুদার বাড়িতে। এখানে অবিশ্যি ফেলুদা মানে সত্যজিৎ রায়। তিনি বসে আছেন আমার থেকে একটু দূরে। অন্য একটি চেয়ারে। যে চেয়ারে তিনি ছাড়া আর কেউ বসেন না, তাঁর বিশপ লেফরয় রোডের বৈঠকখানায়। তিনিই, আমার এই মার্জারভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে, পড়তে দিয়েছেন আমাকে কয়েকটি লাল খেরোর খাতায় তাঁর অনুকরণীয় হস্তলিপিতে কয়েকটি চিত্রনাট্য। তিনি পাশে বসে অন্য কাজে নিমগ্ন। আর আমি গভীর নিঃশব্দ নিবেশে পড়ছি তাঁর চিত্রনাট্য এবং ডুবছি মুগ্ধ মগ্নতায়। সত্যজিৎ রায়েরই অনুমতির সৌজন্যে তাঁরই বাড়িতে বসে তাঁরই উপর এই গোয়েন্দাগিরির সৌভাগ্য জুটেছে আমার! আর এই দীর্ঘ গোয়েন্দাগিরির শেষে আমি নিশ্চিত, কী নিশ্ছিদ্র পরিশ্রম ও ভাবনার সাধন থেকে তৈরি হতে পারে 'মহানগর' এবং 'সীমাবদ্ধ'-র মতো ছবি! এবং কেমন করে প্রথম প্রেরণা, প্রাণনের বীজটি উড়ে এসে ধীরে ধীরে পৌঁছয় তার নিটোল পরিণতিতে, পরিচালকের কল্পনায় কীভাবে পরতে-পরতে বিন্যস্ত হয় একটি সার্থক চলচ্চিত্র।

আমার গোয়েন্দাগিরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর আবিষ্কার, চিত্রনাট্যের পাশে-পাশে সত্যজিৎ রায়ের মার্জিনাল নোটস বা পার্শ্বলিখন। যে আপাত-অসংলগ্ন বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলি ক্রমে ঘনিয়ে এসে চিত্রনাট্যটিকে তার সংহত পরিণতিতে পৌঁছে দেয়, তারই বাসা ওইসব পার্শ্বলিখনে ছড়িয়ে থাকা বহু বন্ধনীর মধ্যে। সত্যজিৎ রায়ের দীপ্যমান মনের অতুলনীয় প্রকাশ সেখানেই। আমি ক্রমশ আবিষ্কার করেছি, এইসব বন্ধনীধৃত ছোটো ছোটো মন্তব্যের শিকড় কীভাবে চলে গেছে জীবন, বন্ধুতা, ভালোবাসা, প্রেম ও নারীর সঙ্গে সম্পর্কের গভীর গোপনে। বুঝতে পারি, সত্যজিৎ রায়ের নারী-ভাবনায় বিছিয়ে আছে এক অস্পষ্ট

বিধূর রোম্যান্টিকতা। সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যে পার্শ্বলিখনগুলি পড়তে পড়তে আমি ক্রমশ বুঝতে পারি, বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত এই আধুনিক পৃথিবীতেও তিনিই শেষ রোম্যান্টিক, উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস্ নন! সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত থেকে গেছে এই অক্ষয় বিশ্বাস, যে, নারী-পুরুষের বন্ধুতার মতো অঘটন আজও সম্ভব। আজও হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগে জন্মায় প্রণয়। পৃথিবীতে আজও কেউ-কেউ, কখনো-কখনো, কাউকে-কাউকে স্পর্শ করে নিহিত অদৃশ্য গহনে। এবং এই পৃথিবীতে নারীই হয়তো বিলীয়মান আত্মিক শান্তি আর সৌন্দর্যের অন্তিম আধার।

সম্প্রতি সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলি আবার দেখলাম। এবং সেই দেখার ফলে আরো একবার এই সিদ্ধান্তে অটল থাকলাম, আমি অন্তত সুব্রতর ব্যর্থতাবোধে (মহানগর), সোমনাথের নৈরাশ্যে (জন-অরণ্য), কিংবা শ্যামলেন্দুর বিচ্ছিন্নতাবোধে গভীরভাবে সাড়া দিচ্ছি।

এ-কথা ঠিক, সত্যজিৎ রায় শেষ পর্যন্ত আশ্রিত রোম্যান্টিক বোধ ও বিশ্বাসে। তবু তাঁর ছবিতে দেখেছি আধুনিক প্রেমিকের কাপুরুষতা। আধুনিক চাকুরিজীবীর শঠতা। দেখেছি আদর্শের পরাজয়। যৌবনের নিষ্ক্রান্তি। এমনকী একথাও বলতে পারি, জন-অরণ্যে কোথাও আশা করার মতো, ভালোবাসার মতো, ভালোবেসে বেঁচে থাকার মতো কিছুই প্রায় দেখানো হয়নি।

একটি ব্যাপার দেখে কিন্তু আমি বারবার আশ্চর্য হয়েছি। সত্যজিতের চিত্রনাট্যগুলি পড়তে-পড়তে যখনই বুকের উপর চাপ ধরছে, একাকিত্বের যন্ত্রণা অনুভব করছি, তখনই তাঁর চিত্রনাট্যের পার্শ্বলিখন আমাকে এই স্বস্তি দিচ্ছে যে, পৃথিবীতে এখনো আছে ভালোবাসা। এবং বেঁচে থাকতে সবচেয়ে প্রয়োজন ভালোবাসার। যেমন 'কাপুরুষ' চিত্রনাট্যের একটি পাতায় এই পার্শ্বলিখন 'করুণার (মাধবী মুখোপাধ্যায়) চুলে কাঁধে বৃষ্টির জল, অল্প।' আর-একটি জায়গায়, 'করুণা জল খেয়েছে। ঠোঁটের দু-পাশে জল লেগে থাকবে কি?' কী অনন্য দুটি মারজিনাল নোটস! যেন খুলে গেল নারী আবেদনের নতুন অপ্রত্যাশিত জানলা! করুণার মাথায়, ঘাড়ে বৃষ্টির জল। করুণার ঠোঁটের কোনে, জল-খাওয়ার পর, জলের আভাস। সব কিছুর মধ্যেই নারী-হৃদয়ের ঐশ্বর্যের ইশারা—এই প্রাপ্তিটুকু ভুললে চলবে না। একটি দৃশ্যে করুণা তার প্রেমিকের (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) ঘরে ঢুকে দরজার একটি পাল্লা খুলে দেয়। তার গরম লাগছে। তার হাঁফ ধরছে। বোঝা যায়, সে কষ্ট পাচ্ছে ভালোবাসার নিশ্চয়তার অভাবে। কিন্তু তার অন্তরের ঐশ্বর্য এখনো অক্ষত। 'করুণার চুলে-কাঁধে বৃষ্টির জল'—এই একটি মাত্র মন্তব্য করুণার অন্তরের ঐশ্বর্য, তার চরিত্রের লাবণ্য ও কমনীয়তাটি যে শুধু ফুটিয়ে তোলে তাই নয়, আমাদের কাছে এই একটি মন্তব্যের মধ্যে তার হৃদয়ের ভিজে-ভিজে অবস্থার ছোঁয়া এসে পৌঁছয়। 'করুণার ঠোঁটের দুপাশে জলের রেখা লেগে থাকবে কি?' এই আপাত-সামান্য প্রশ্নে সত্যজিৎ রায়ের কান্তিবোধের এমন একটি দিক আমাদের সামনে ফুটে উঠল, যার মধ্যে রয়েছে সন্দেহাতীত ইন্দ্রিয়প্রবণতা, সেন্সুয়ালিটি। করুণা একই সঙ্গে লিরিকাল এবং সেনশুয়াস। এই যুগ্মতা সত্যজিতের একাধিক নারীর মধ্যে বারবার ফুটে ওঠে।

যাওয়া যাক 'কাপুরুষ' ছবির অন্তিম দৃশ্যে। এই দৃশ্যেই করুণার কাপুরুষ প্রেমিক তাকে দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু করুণা আঘাত পেল কি না সত্যজিৎ রায় তা বুঝতে দিলেন না। আমরা দেখছি, সে তার প্রেমিকের কাছে স্টেশনে এসেছে তার ঘুমের ওষুধের শিশিটি ফিরে নিয়ে যাবার জন্য। প্রেমিকের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করার জন্য নয়।

কিন্তু এই প্রশ্নও তো উঠতে পারে, ঘর ভেঙে তার প্রেমিকের সঙ্গে চলে যাওয়ার জন্যও কি আসেনি? এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই সত্যজিতের ছবিতে। এই অন্তিম অ্যামবিভ্যালেন্স অসম্ভব তাৎপর্যময়। কেননা এই অনিশ্চয়তাই করুণার চরিত্রে একটি সম্ভাব্য আয়তন এনে দেয়। আমরা বুঝতে পারি, রোম্যান্টিক সত্যজিৎ ভালোবাসেন চাপা স্বভাবের ইনট্রোভার্ট মেয়েদের। কেননা, তিনি অনুভব করতে পেরেছেন, নারীর চাপা স্বভাব আসে তাদের সাহস ও সংহতি থেকে। যা পুরুষের মধ্যে তুল্য পরিমাণে বিরল।

'মহানগর' ছবির আরতির (মাধবী) মধ্যে এই দৃঢ়তা ও সততা কী পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত! চিত্রনাট্যের এক কোণে একটি পার্শ্বলিখন আমাকে চমকে দিল। মন্তব্যটি আরতির স্বামী সুব্রতর (অনিল চট্টোপাধ্যায়ের ছোটো বোন) বাণী (জয়া ভাদুড়ি) সম্পর্কে। সত্যজিৎ লিখছেন 'ঝগড়ার সময় বাণী পিন্টুকে (সুব্রত-আরতির পুত্র) সরিয়ে নিয়ে যায়।' বাণীর নিজের বয়সই অল্প। সে ফ্রক পরে। তার বয়স অল্প বলেই এই মন্তব্যের তাৎপর্য আমার কাছে অন্তত খুব বড়ো হয়ে দেখা দেয়। বুঝতে পারি, সত্যজিৎ বলতে চাইছেন, মেয়েদের মধ্যে প্রোটেকট করার, আশ্রয় দেবার প্রবণতা প্রায় ইনস্টিংটিভ, ওটা বয়স ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না। সত্যজিতের ছবির প্রায় অধিকাংশ নারী চরিত্রেরই এই দিকটা সবচেয়ে বড়ো হয়ে উঠে আমাদের মুগ্ধ করে। 'নায়ক' ছবির অদিতি (শর্মিলা ঠাকুর) এবং 'সীমাবদ্ধ'-র টুটুলকে (শর্মিলা) আমরা মনে রাখি তাদের মধ্যে ওই সততা ও মমতার জন্যই তো। তারা আশ্রয় দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়েই আসে পুরুষের জীবনে।

এবার সত্যজিৎ রায় নিজে আমাকে বহু বছর আগে নারী সম্বন্ধে কী বলেছিলেন তা হুবহু তুলে দিচ্ছি

'হয়তো তুমি ঠিকই বলেছ। মহিলাদের বিষয়ে আমার ধারণাটা শেষ পর্যন্ত রোম্যান্টিকই হয়তো। সেই কারণেই আমার অধিকাংশ ছবিতে মূল কাহিনি থেকে তাদের আমি একটু সরিয়ে রাখি। তার মানে এই নয় যে তারা গল্পের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। আমি পুরুষদের সঙ্গে তাদের মূল পার্থক্যটা দেখাতে চাই। পুরুষদের কাজের পরিধিটা অনেক বড়ো, তাদের কমিটমেন্টস, ইনভলমেন্টস অনেক বেশি। পুরুষদের কাজের জগৎ থেকে মেয়ের স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন। সুতরাং মেয়েদের মধ্যে—অন্তত আমার ছবিতে আমি যে সব মেয়েদের এনেছি তাদের মধ্যে—একটা নিলিপ্তি, একটা ডিট্যাচমেন্ট আছে। মেয়েদের ওইভাবে একা, নিঃসঙ্গ, আত্মমগ্ন রূপে ভাবতে আমার ভালোলাগে। তাতে মেয়েদের চরিত্রের শক্তি আর সৌন্দর্যের দিকটা আমি সহজে বুঝতে পারি। আমার মনে হয় মেয়েদের মনের জোরটা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি, তাদের এক ধরনের সততা বা ইনটিগ্রিটি আছে যেটা পুরুষদের মধ্যে সচরাচর পাওয়া যায় না। এবং বলতে পারো, মেয়েদের মনের ঐশ্বর্য আমাকে মুগ্ধ

করে। সেজন্য দেখতে আমার ছবিতে মেয়েদের সঞ্চরণ কাজের জগতের চেয়ে ভাবনার জগতে অনেক বেশি। তাদের আমি একটা প্রসেস অফ ইনটেকলেকশন-এর মধ্যে দিয়ে দেখাই। অর্থাৎ তাদের মনটা আমায় ফ্যাসিনেট করে এবং সেটাকে নানা দিক থেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করি।'

'মহানগর' ছবির চিত্রনাট্যে আরো দুটি মার্জিনাল নোটস দেখার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল কত বছর আগে! প্রথমটি, 'বাণী মাটিতে শোয়'। আমি এই বার্তাটি পেয়ে কিছুক্ষণ থমকে যাই। দ্বিতীয় পার্শ্বলিখনটি হল, 'আরতি ঘুমুচ্ছে, সুব্রতর ঘুম নেই।' বাণী মাটিতে শোয়, এই ছোট্ট মার্জিনাল উক্তিটির মধ্যে ছোট্ট মেয়েটির ত্যাগের দিকটা বুঝতে পেরেছিলাম। তার মাটিতে শোয়ার কারণ সে অন্যদের জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বাণীর এই ক্ষুদ্র মহত্ব ও স্বার্থত্যাগ সত্যজিৎকে এতটাই মুগ্ধ করেছে যে তিনি চিত্রনাট্যে সেটি দর্শকদের কাছে আলাদা করে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ অনুভব করেছেন। একটা কথা জানানো খুবই প্রয়োজন। সত্যজিৎ বাণীর ত্যাগের দিকটা কী সহজে দেখালেন! কিন্তু সেন্টিমেন্টালাইজ করলেন না। ছোট্ট মেয়ের মানসিক দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় পেলাম আমরা। বয়সে ছোটো হয়েও বাণী যে ভিতরে ভিতরে অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, সেকথা বুঝতে পারলাম। এর থেকে দুটি জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল। এক, মহিলা-প্রাসঙ্গিক ভাবনায় সত্যজিৎ বাঙালির ভাবালুতা এড়িয়ে চলেন। দুই, তিনি মেয়েদের কখনোই কৃপার বা করুণার দৃষ্টিতে দেখেন না। সত্যজিৎ এই প্রসঙ্গে আমাকে বললেন, 'দৈহিক শক্তিতে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে নিশ্চয় দুর্বল। কিন্তু বুদ্ধিতে কিংবা মানসিক শক্তিতে তারা কোনোভাবে পুরুষদের চেয়ে কম নয়। সুতরাং আমি শেষ পর্যন্ত মেয়েদের প্রতি বিশ্বাস হারাতে পারি না। পুরুষদের চেয়ে তারা অনেক বেশি যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করতে পারে।' মেয়েদের মানসিক শক্তিকে সত্যজিৎ রায় এমন অকপটে স্বীকার করেন বলেই তাদের প্রতি তাঁর ভাবালুতার কোনো প্রশ্নই নেই।

এখানেই অধিকাংশ বাঙালি চলচ্চিত্রকারদের সঙ্গে তাঁর একটা বড়ো পার্থক্য। তাঁর ধারণার মেয়েদের বন্ধুত্ব বা প্রেম শরৎচন্দ্রীয় ধারণার সঙ্গে মেলে না। তাই তাঁর নারী চরিত্রগুলি বাংলা চলচ্চিত্রের সাধারণ নারী চরিত্রগুলি থেকে অন্যরকম। এখানে বাংলা চলচ্চিত্রে যে সব নারীদের দেখতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম বা এখনো দেখি, তাদের কথা একটু বলা দরকার। তাহলে বুঝতে সুবিধে হবে সত্যজিৎ বাংলা ছবির নারী চরিত্রকে কোন নতুন মাত্রায় নিয়ে গিয়ে ভূকম্পনটি ঘটালেন। আগেই বলেছি, বাংলা চলচ্চিত্রে মেয়েদের চরিত্রায়নের মূল কাঠামোটি শরৎচন্দ্র করে দিয়ে গেছেন। তাঁর ষোড়শী, অচলা, পার্বতী, চন্দ্রমুখী, বড়দিদি, বিজয়ায়, ভারতীয় প্রভাব সুদূর ও গভীর বিস্তৃত। সত্যজিৎ রায় নারী চরিত্রায়নে কিন্তু মেয়েদের বড়ো করতে অযথা ভাবালু হয়ে ওঠেন না। কিংবা বদান্যতা দেখান না। সত্যজিতের নারী-চরিত্র নিয়ে মারি সিটন কী বলেছেন তা এখানে স্মরণ করছি! 'সত্যজিৎ রায়ের নারী-চরিত্রগুলির একটিকেও সরাসরি ফেমিনিস্ট বলা চলে না। কিন্তু ছবিগুলি দেখতে দেখতে আমরা আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করি কীভাবে কেমিনিস্ট অ্যাটিটিউডটা গড়ে উঠছে। আসলে সত্যজিতের পুরুষ এবং নারী চরিত্রগুলি সেই সহজাত সৃষ্টিশীলতা থেকে জন্ম নিয়েছে যেটা কোনোভাবেই পুরুষের সুপরিওরিটি কমপ্লেক্সে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। ১৯৬১ সাল থেকে এই ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে বোঝা যায়। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় মনীষা চরিত্রে এই নতুন মোড় নেওয়াটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তারপর 'অভিযান' ছবিতে গুলাবি তার নিজের কলঙ্কিত অতীত সত্ত্বেও নরসিংকে পাপের পথ থেকে সরে আসার

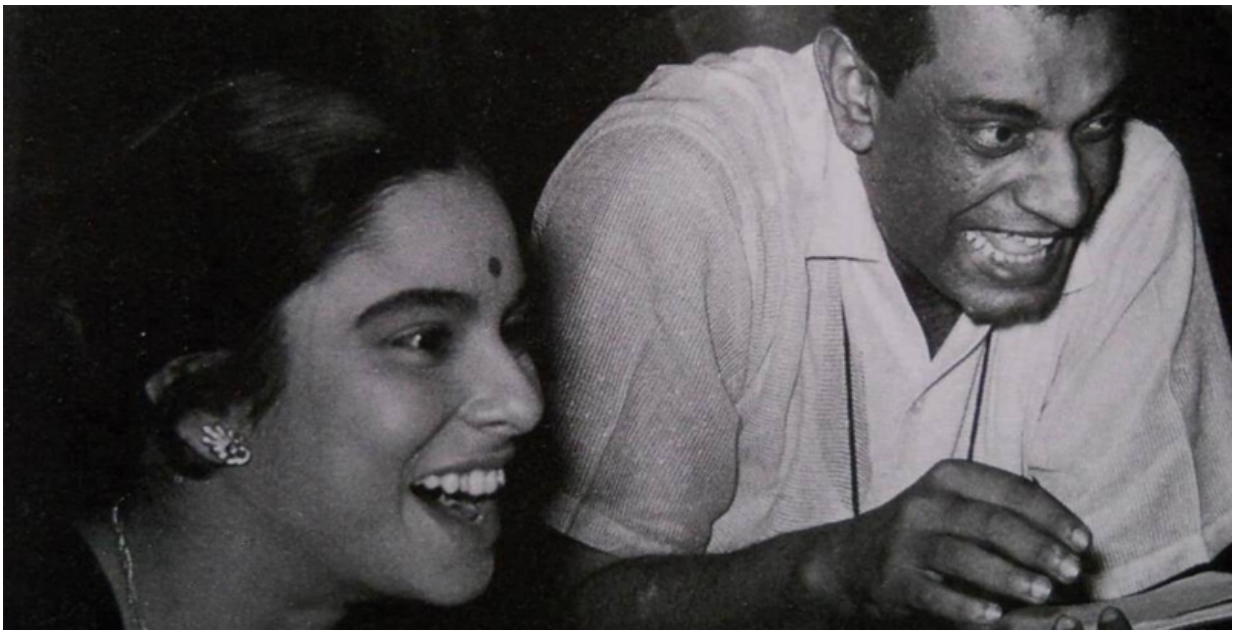

অনুমতি দেয়। 'মহানগর' ছবিতে আরতি একার সাহসে শেষ পর্যন্ত যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তখন কিন্তু সে তার স্বামীকে মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার জন্য পরিত্যাগ করে না। আর 'চারুলতা' তো এমন একটি সময়ের পটভূমিকায় তৈরি যখন সমস্ত পৃথিবীতেই মেয়েরা নিজেদের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করছিল। চারু স্বভাবতই গল্পের মধ্যে সাহিত্য রচনায় এবং ভালোবাসায় তার সাহসের পরিচয় দেয়। আর 'কাপুরুষ' ছবির যে মেয়েটি একদা তার যৌবনে এক কাপুরুষ প্রেমিকের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে চেয়েছিল, সে-ই শেষ পর্যন্ত আপাতমধুর রোমান্সের লোভ সামলে তার নির্বোধ স্বামীর সঙ্গে বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দেবার সাহসী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যদিও এই স্বামীর সঙ্গে সহবাসে তার মাথা ধরে।'

আরো একটি প্রয়োজনীয় কথা হল, নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের উন্মোচনে, সে সম্পর্ক অবৈধ হলেও, সত্যজিৎ রায় সংকীর্ণ অর্থে নৈতিক হয়ে ওঠেন না। দেওরের সঙ্গে চারুলতার প্রেমের সম্পর্কটি তাঁর ছবিতে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সঙ্গে চারুর প্রতি সত্যজিৎ কোনো নৈতিক শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করেন না। কোনো অপরাধবোধের ইশারাও দেন না। আবার 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিতে আমাদের মেয়েদের সেক্সুয়াল স্টারভেসানের ফলে রিপ্রেশনের যে করুণ মূর্তিটা আচমকা চোখে পড়তে পারে সেটি একটি দৃশ্যে

অসংকোচে ধরা দেয়। অথচ কোথাও তিনি অস্পষ্টভাবেও তিরস্কার করলেন না। আবার দৃশ্যটির মর্মস্পর্শী কারুণ্যে কোথাও ভাবালুতার চিহ্নও নেই। অহেতুক নৈতিকতা বা ভাবালুতা আমাদের সংবেদনকে অস্পষ্ট করে দেয় না বলেই আমরা এই দৃশ্যে রিপ্রেসড যৌনচেতনার এমন একটি বেদনাবিধুর প্রকাশ দেখতে পাই, যা বাংলা ছবিতে আগে বা পরে কখনো দেখিনি!

আরো একটি জরুরি বার্তা হল, সত্যজিতের নারী চরিত্রগুলি কখনোই উগ্রভাবে শরীরী নয়। তাদের আবেদনের ইন্দ্রিয়ঘনতা আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় নানা ইশারা ও কৌণিকতার মাধ্যমে। সত্যজিৎ রায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেমন মেয়েরা আপনার চোখে সুন্দর? উত্তরে বললেন

'আমার ছবি থেকেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। আমার কাছে মেয়েদের সৌন্দর্যের রূপটি মূলত ইন্টেলেকচুয়াল। এক ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্যও বলতে পারো। আমার কাছে সৌন্দর্যটা পুরোপুরি দেহের ব্যাপার নয়। বুদ্ধির সঙ্গে তার সম্পর্কটা গভীর।'

এখানেই কিন্তু থামলেন না সত্যজিৎ। কিছুক্ষণ জানলার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন। তারপর বললেন

'মেয়েদের যে-গুণগুলো আমার বিশেষ ভালো লাগে সেগুলো ইন্টেলিজেন্স, গ্রেস এবং সফিসটিকেশন। তার মানে এই নয় যে আমার ছবির সব মেয়েরাই কালচার্ড বা লেখাপড়া জানে। যেমন ধরো, 'অভিযান'-এর গুলাবি (ওয়াহিদা রেহমান) কিংবা 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র ওই সাঁওতাল মেয়েটি (সিমি)—ওরা তো একেবারেই লেখাপড়া জানে না। ওদের মধ্যে কোনোরকম শহুরে সফিসটিকেশনও নেই। কিন্তু ওদের ফিলিংস খাঁটি, জেনুয়িন। এবং ওরা যেভাবে ভালোবাসা, প্রেম, ঘৃণার প্রতি একেবারে স্বাভাবিকভাবে সাড়া দেয়, সেটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং। এবং এই রেসপন্সের মধ্যে ওদের চরিত্রের সৌন্দর্যটা প্রকাশিত হয়। আবার চারুলতার মতো মার্জিত, সেনসিটিভ মেয়ের সৌন্দর্যের মূল ব্যাপারটাও কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল। চারুর সৌন্দর্যের অনেকটাই তার মনের ঐশ্বর্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আমার ছবিতে চারুলতার মনটাকে যতটা পেরেছি, খুলে দিয়েছি। সেটা দেখাতে গিয়ে অমলের প্রতি তার অবৈধ প্রেমটাকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে হয়েছে। অমলের সঙ্গে চারুর ভালোবাসার সম্পর্কটা অসামাজিক। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই চারুর মনের ঐশ্বর্যটা প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং সেটাও আমার কাছে সুন্দর।'

কিছুক্ষণ থামলেন সত্যজিৎ। আবার কিছুক্ষণ চশমা

কামড়াতে কামড়াতে ভাবলেন। তারপর বললেন

'আমার মনে হয়, মেয়েদের সৌন্দর্যের অনেকটাই ধরা দেয় তাদের ধৈর্য ও সহনশীলতার মধ্যে। মেয়েদের প্রেম, ভালোবাসা, বন্ধুতার মধ্যে তাই আমি একটা বেসিক অনেস্টি দেখতে পাই। মেয়েদের চেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষরা অনেক বেশি ভঙ্গুর। সেখানে মেয়েরাই পুরুষকে প্রোটেক্ট করতে পারে। নারীর চেয়ে পুরুষদের সামাজিক প্রতিপত্তি, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, দৈহিক শক্তি অনেক বেশি, অন্তত আমাদের সমাজে। সেক্ষেত্রে পুরুষ যে নারীকে প্রোটেক্ট করবে সেটা আমার কাছে খুব কিছু ইন্টারেস্টিং লাগে না। তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়কর মেয়েদের অন্তরের ঐশ্বর্য,—যেখানে তার আসল সৌন্দর্য। যা দিয়ে সে পুরুষকে প্রোটেক্ট করতে পারে, অনুপ্রেরণা দিতে পারে।'

মারি সিটনকে সত্যজিৎ রায় 'নায়ক' ছবির নায়ক অরিন্দম (উত্তমকুমার) ও নায়িকা অদিতি (শর্মিলা ঠাকুর) বন্ধুতা ও ক্রমশ ভালোলাগার, ভালোবাসার অস্পষ্ট ইশারা নিয়ে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে নারীর ভালোবাসা ও প্রেম বিষয়ে সত্যজিতের ধারণাটি বিশেষ স্পষ্ট। বাংলা অনুবাদে সেই চিঠি

'ম্যাটিনি আইডল অরিন্দম ও অদিতি বলে ওই মেয়েটির মধ্যে ট্রেনে যেতে যেতে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠুক এটা আমি চেয়েছিলাম। ওই সময়টুকুর মধ্যে রোমান্সের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমি ওদের সম্পর্কের একটা চিত্তাকর্ষক ক্রমবিকাশ চাইছিলাম। মনে হল, এক ধরনের অনীহা বা নিঃসাড়তা থেকে কীভাবে ওরা দুজন পরস্পরের প্রতি ক্রমশ সংবেদনশীল হয়ে পড়ল সেটা দেখাতে পারলে তার মধ্যে একটা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আছে। সুতরাং আমি অদিতিকে কিছুটা উন্নাসিক, যুক্তিবাদী, তার্কিক স্বভাবের করে সৃষ্টি করেছি যাতে ওই চলচ্চিত্র নায়কের সহজ ব্যবহারিক লাবণ্য, দৈহিক সৌন্দর্য ও উদাসীন ঔদ্ধত্যের আবেদনে সহজে সাড়া না দেয়। অন্তত ততক্ষণ যতক্ষণ না সে বুঝতে পারছে এই পুরুষটি কোনো এক জায়গায় নিঃসঙ্গ, অসহায়, যার পক্ষে বন্ধুতার প্রয়োজন আছে। যে মুহূর্ত থেকে এই মানুষটি নিজেকে অকপটে প্রকাশ করে মনের ভার হালকা করতে শুরু করল, তখন থেকেই অদিতি বুঝতে পারল ওই পুরুষটির ওপরের রূপটা দেখার আর কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা তার অন্তর্নিহিত জীবনের আভাস সে ইতিমধ্যে পেয়েছে। প্রথমে পুরুষটির প্রতি তার মনোযোগ একান্তভাবে সাংবাদিকের, কিন্তু কিছু পরেই অরিন্দমের স্বীকারোক্তি এমন একটি বিন্দুতে এসে পৌঁছয় যে অদিতি বুঝতে পারে এরপর সেটাকে সাংবাদিকতার কাজে লাগানো অনৈতিক হবে। অদিতির দিক থেকে এবার যেটা আসছে তা হল সংবেদনশীলতা ও সাহায্য করার ইচ্ছে। ওদের দু-জনের পারস্পরিক সম্পর্কটা হয়তো খুব গভীর নয়, কিন্তু একেবারে খাঁটি। অরিন্দমের তুলনায় অদিতি অনেক বেশি বিদগ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের মধ্যে একটি স্বল্পপরিসর পারস্পরিকতা গড়ে উঠতে পারে অদিতিরই প্রচেষ্টায়।'

‘নায়ক’-এর কাহিনিতে আমরা অরিন্দম ও অদিতির মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ বন্ধুতাকে গড়ে উঠতে দেখছি যার মূলে আছে সংবেদনশীলতা, পরস্পরকে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা। উল্টো দিকে ‘সীমাবদ্ধ’-র কাহিনিতে দেখছি কীভাবে শ্যামলেন্দু ও সুদর্শনার মধ্যে সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে আস্তে আস্তে কিছু অভিজ্ঞতা ও ঘটনার উন্মেষে সুদর্শনা শ্যামলেন্দুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কেন এমন হচ্ছে সেটা বুঝতে পারব যখন অরিন্দমের প্রতি অদিতির, আর শ্যামলেন্দুর প্রতি সুদর্শনার রেসপন্সের তফাতটা বুঝতে পারব। অরিন্দমের বিষয়ে অদিতির স্বপ্নভঙ্গের কিছু নেই। অরিন্দমের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় একটি দিল্লিগামী ট্রেনে এবং দিল্লি পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে এ কাহিনির শেষ। ‘সীমাবদ্ধ’ ছবির কাহিনি শুরু হওয়ার আগেই শ্যামলেন্দুর প্রতি সুদর্শনার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা কয়েকটি নির্ধারিত ধারণাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই ধারণাগুলি ক্রমশ মিথ্যা প্রমাণিত হয় শ্যামলেন্দুকে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। অরিন্দম তার মিথ্যা জগৎটা থেকে কিছুক্ষণের জন্য পালিয়ে এল বলেই নারীর বন্ধুত্বে, ভালোবাসার আশ্রয় পেল। অন্য ধারে শ্যামলেন্দু তার কাজের জগতের জমে ওঠা মিথ্যের বোঝাটাকে কিছুতেই ঘাড় থেকে নামাতে পারল না। তাই সত্যিকারের ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এই বিষয়ে সত্যজিৎ রায় আমাকে যা বলেছিলেন

‘যে সব মেয়েরা খুব সেনসিটিভ তাদের মধ্যে এমন একটা সততা, একটা ইনটিগ্রিটি আছে যে তারা যখন ইমোশনালি ইনভলভড্ হয়, তখন পুরুষের কাজের জগতের হাজার নীচতা, স্বার্থপরতা তাদের আঘাত করতে থাকে এবং তারা ক্রমশ এলিয়েনেটেড হয়ে যায়। চারুলতাও তো তাই। সে তার স্বামীর কাজের পৃথিবীতে ইনভলভড্ হতে পারল না। মেয়েদের আমার এইভাবে দেখতে ভালো লাগে। ওদের হৃদয়ের গভীরতাটা, সৌন্দর্যটা এইভাবেই বোঝা যায়। এখানে ‘জন অরণ্য’র প্রসঙ্গ উঠতেই পারে। অনেকেই বলেছেন, আমি নাকি নারীর ব্যাপারে সিনিক হয়ে পড়েছি। তা কিন্তু নয়। ‘জন অরণ্য’ এক ধরনের ব্ল্যাক কমেডি। এ-ছবিতে আমাদের সমাজে দুর্নীতি ও স্খলনকে নানা দিক থেকে দেখানো হয়েছে। সুতরাং মেয়েদের বাদ দিয়ে তো সমাজটাকে দেখানো সম্ভব হত না। আমি দেখিয়েছি যে এই পরিব্যাপ্ত দুর্নীতির শিকার মেয়েরাও। আমার দায়িত্বটা কিন্তু নীতিবাগীশের নয়। আমার ছবিতে যেমন নীতিকথা বলিনি, তেমনি আবার মেয়েদের স্খলনের কথা বলতে গিয়ে অযথা ভাবালু হয়েও পড়িনি। ‘জন অরণ্য’-র মূল কথাটা হল, আজকের পৃথিবীতে টিকে থাকতে গেলে মূল্যবোধের পরিবর্তন প্রয়োজন। সুতরাং, সত্যি কথা বলতে, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই যে নেহাৎ জীবনধারণের তাগিদে মেয়েরাও যদি তাদের মূল্যবোধে পরিবর্তনে বাধ্য হয়, তাহলে তাদের ঘাড়ে অনৈতিকতার দোষটা সম্পূর্ণভাবে চাপিয়ে দিলেই আমাদের কর্তব্য সম্পূর্ণ হবে। এটা আমি বলবই, অন্তত তারা পুরুষদের চেয়ে অন্যায়টা বেশি করেনি। এবং মেয়েদের বেলায় আমাদের অহেতুক কঠোর হওয়াও উচিত নয়। আমি অন্তত মেয়েদের প্রতি বিশ্বাস হারাইনি। মেয়েদের সততা, সিনসিয়ারিটি আমার কাছে আজো খুব বড়ো।’

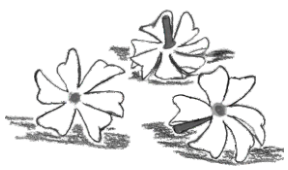

রান্নায় রাজস্থান

স্নিগ্ধা দাশ
নীতিন দাশ

স্নিগ্ধার কথা

চারদিকে বালির পাহাড় দিয়ে ঘেরা চুরু ডিস্ট্রিক্টের পূব দিকে অজানা একটা ছোট্ট শহর—সরদার শহর। এত ছোটো শহর যে বাবার নাম, সরদার শহর আর রাজস্থান লিখলেই চিঠি পৌঁছে যেত। নামটা ৭০০ বছর আগেকার বিকানের রাজবংশের রাজা সরদার সিং-এর নামে, কারণ উনিই এই শহরের স্থাপনা করেন। পিচঢালা রাস্তা খুব কম সেই সময়। বেশিরভাগ রাস্তা বালির। সেখানে আমরা একমাত্র বাঙালি পরিবার।

বাবা ছিলেন নোয়াখালির দেওয়ানজি বাড়ির গুহরায়দের বংশধর। রেঙ্গুন থেকে ডাক্তারি পাস করে ১৯৪৩-এ সোজা সরদার শহরে। আশপাশের প্রায় ১০০-১৫০ গ্রামের রুগিদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

আমরা বড়ো হই মাড়োয়ারি জৈনী পরিবেশে। মাছ মাংস তো দূরের কথা, জৈনীসমাজে পেঁয়াজ রসুন পর্যন্ত নিষিদ্ধ। ডিমও পাওয়া যেত না।

মুসলিম পাড়া থেকে মাঝে মাঝে মাংস আসত। লুকিয়ে রান্না আর লুকিয়ে খাওয়া হত। বন্ধুরা কিংবা প্রতিবেশীরা জানলে একেবারে কেলেংকারি। একঘরে করে দিত। ওরা জানত স্নিগ্ধার বাড়িতে স্পেশাল বাঙালি আলুর দম রান্না হচ্ছে। মাঝে মাঝে সিন্ধি প্রতিবেশীরা মাছ আনতেন। কী মাছ, কোথা থেকে আসত জানি না। তবে আমরা সেসব মাছ খেতে পারতাম না।

আজকাল চারদিকে যখন দেখি বাঙালিরা বাঙালিদের মধ্যে থেকেও নিজেদের মধ্যে বাংলা বলে না, গান বলতে বোঝে লারে-লাপ্পা হিন্দি গান, সুকুমার রায়/রবীন্দ্রনাথের নামই শোনেনি তখন ভেবে অবাক হই যে মা-বাবা কীভাবে ওই পরিবেশে থেকেও বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি, রান্নাবান্না, পূজোআর্চা সব কিছু বজায় রেখেছিলেন।

সাত ভাই-বোনের আমি সবার ছোটো। সবার জন্ম, লেখাপড়া ওখানেই। ছোটো শহর হলেও লেখাপড়া খুব উচ্চমানের ছিল।

যস্মিনদেশে যদাচার। মাড়োয়ারি বন্ধুদের সঙ্গে বড়ো হওয়ার জন্য মাড়োয়ারি ভাষা নিজে নিজেই শিখেছিলাম আর রাজস্থানি রান্না বন্ধুদের মায়েদের কাছে শেখা। বাংলাটা বাড়িতে শেখা। মাড়োয়ারি ভাষায় যদিও আলাদা কোনো লেখার স্ক্রিপ্ট নেই, তাও ওরা নিজেদের একটা ব্যবহারিক লিপিতে ব্যবসার কাজ করে—মোডিয়া লিপি। অনেকটা গুজরাতি লিপির মতো।

বাঙালিদের ঘটি-বাঙালের মতো, রাজস্থানেও প্রান্ত হিসেবে আলাদা আলাদা রান্না। যোধপুর/নাগোর-এ খাবারে খুব ঝাল/তেল দেয়। মাড়োয়ারি খাবার আলাদা, জৈনীদের আলাদা— আর তার মধ্যেও আলাদা—কেউ পেঁয়াজ-রসুন খাবে কেউ খাবে না, শেখাবটী আলাদা আর রাজপুত-জাঠ রান্না একেবারে অন্যরকম।

ছোটোবেলা থেকেই রান্নার খুব শখ ছিল। বাঙালি রান্না মায়ের কাছে আর বিয়ের পরে শাশুড়ি মার কাছে শেখা। আমিষ রান্না প্রায় সব শাশুড়ি মার কাছে শেখা।

বিয়ে দিল্লিতে। বর সহ যৌথ পরিবারের সবাই খাদ্য রসিক। একদিন দাল-বাটি-চুরমা-বানালাম।

কিংবদন্তি বলে রাজপুত সৈন্যরা যুদ্ধে যাবার সময় সঙ্গে প্রচুর বাটি রাখত, কারণ এটা সহজে নষ্ট হয় না, অনেকদিন থাকে। রান্নার প্রণালী দেখা যাক।

দাল

অড়হর ডাল নুন-হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। একটা বাটিতে পরিমাণমতো ধনেগুঁড়ো, লংকা, আমচুর আর হিং জলে গুলে

diahome

DIABETES CARE COMES HOME

Powered By ARH DR. A. RAMACHANDRAN'S DIABETES HOSPITALS

Namashkr Kolkata

Now avail expert Diabetes Care from Diahome at your doorstep

- Diabetologist Consultation ab Tests & Specia
- D
- Dietitian Consultation
- Dedicated Physician Assistant

ECG

Doppler

Biothesiometry

Funduscopy

GET THESE TESTS AT YOUR DOOR STEP

Dial +91-75400 01234 To book an appointment

Scan QR to Download

Apple iOS | Android

Available on the App Store | GET IT ON Google Play

www.diahome.com
care@diahome.com

CORPORATE OFFICE
Diahome, 4th Floor Dr. A. Ramachandran's Diabetes Hospitals, NO 110, Anna Salai, Guindy, Chennai – 600032
Landmark : Opposite to ITC Grand Chola

REGIONAL OFFICE
Diahome, CE-17, Sector 1, Salt Lake, KOLKATA -700064

CHENNAI | KOLKATA | MADURAI

রাখুন। তারপর কড়াইতে ঘি গরম করে জিরা দিন। একটু ভাজা হলে বাটিতে গোলা মশলাটা কড়াইতে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। তারপর ফুটন্ত ডালের মধ্যে ফোড়নটা ওপর থেকে ছেড়ে মিশিয়ে নিন।

বাটি

আটায় নুন, আধকোটা ধনে, আধকোটা মৌরি আর যোয়ান ভালো করে মেশান। বেশ কিছুটা গরম ঘি-এর ময়ম দিয়ে উষ্ণ জলে মেখে নিন। রসগোল্লা সাইজের বড়ো বড়ো গোলা বানান। রাজস্থানে এগুলো ঘুটের আগুনে রোস্ট করে। ওটিজি বা আপ্পে মেকারেও রোস্ট করা যায়। তৈরি হলে গরম ঘিতে চুবিয়ে রাখতে হবে। গরম গরম ডাল দিয়ে খান। আজকাল অবশ্য নানারকম পুর ভরেও বাটি তৈরি করে; যেরকম মসালা বাটি, মেওয়া বাটি ইত্যাদি।

চুরমা

এটা মিষ্টি। চার-পাঁচটা তৈরি করা বাটি ভেঙে গুঁড়িয়ে তার সঙ্গে গুড়ো চিনি মিশিয়ে নিন। ওপরে গোলাপ পাপড়ি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না, অনেকদিন রেখে খাওয়া যাবে।

শীতকালে রাজস্থানে ভীষণ ঠান্ডা পড়ে। বিশেষ করে জয়সলমের, চুরু এই সব জায়গাতে। অনেক দিন সকালে দেখতে পেতাম যে কলের জল জমে গেছে। রাজস্থানের শীত ভয়ঙ্কর। কিন্তু এই ভেবে আনন্দ হত যে এখন আমরা সব ধরনের শাকসবজি—যেমন বেগুন, ফুলকপি, মটরশুটি, বাঁধাকপি, মুলো, পালং ইত্যাদি খেতে পাব আর এখন এই শীতে মা বিশেষ মাটন রান্না করবেন যেটা জল ছাড়া রান্না হয়।

এইটার নাম ছিল হ্যান্ডি মাটন। অনেকটা মাটন রেজালার মতো। দেখা যাক এটা কীভাবে তৈরি হয়।

১ কিলো মাটনের জন্য (একটু চর্বিওয়ালা হলে ভালো) চার টুকরো করে কাটা ৫০০ গ্রাম পেঁয়াজ, ৫ টি ধোয়া আস্ত রসুন, ৩০ গ্রাম বড়ো করে কাটা আদা, ৩০০ গ্রাম টক দই, ২ টি আস্ত বড়ো এলাচ, ৪ টি আস্ত ছোটো এলাচ, ২ টি তেজপাতা, সামান্য আস্ত গোলমরিচ, ৪-৫ টি লবঙ্গ, ১০০ গ্রাম ঘি, ৫ টি শুকনো লংকা এবং স্বাদ অনুযায়ী নুন নিন। মাটন পরিষ্কার করে জলটা ঝরিয়ে নিন। মাটনটা, দই এবং আর সব উপকরণের সঙ্গে মাখিয়ে হাঁড়িতে চাপিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। প্রেশারের দরকার নেই। অল্প আগুনে রান্না হবে। মাংস সিদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। হ্যান্ডি মাটন তৈরি।

নীতিনের কথা

বিয়ের পরপরই সরদারশহর যাওয়া। রতনগড়ে বগি কেটে কয়লা ইঞ্জিনের সঙ্গে লাগে। রতনগড় থেকে সরদার শহরের মাঝে ছোটো ছোটো স্টেশন। উডসর, পুলাসর, রাজলদেসর ইত্যাদি ইত্যাদি। প্লাটফর্ম নেই, দু-দিকে শুধু বালি আর কখনো কখনো কাঁটার ঝোপঝাড়। মাঝে মধ্যে উট দেখা যায়। স্টেশন থেকে বাড়ি টাঙ্গা করে। গিয়েই শোনা গেল সকাল বিকেল লাইনআপ নেমন্তন্ন। নতুন জামাই বলে কথা!!! পরের দিন সকালে জলখাবারে গেলাম। এক সম্ভ্রান্ত গোছের বয়স্ক ভদ্রমহিলা তরমুজটা হাত দিয়ে ফাটিয়ে

চটকে চটকে জুস বানিয়ে খেতে দিলেন।

মুখটা হাসি হাসি করে খেতে হল। বাঙালি পাপীমনে অযথাই একটা প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিল—হাতটা ভালো করে ধোয়া ছিল তো!!! প্রনাম করব ভাবছিলামই সেই সময় স্নিগ্ধা কানে কানে জানাল যে ইনি এই বাড়ির বহু পুরানো রান্নার লোক খেতুবাই। খুব বেঁচে গেলাম।

বাড়ির গৃহিণী এসে বললেন, রাম রাম কূয়ঁর সা। থান্নে আজ টিকড়া চটনি খানো পরসি। কিছু না বুঝেই, অনেকটা ধন্যবাদ জানাবার স্টাইলে একগাল হেসে মাথাটা নাড়লাম। অপূর্ব জলখাবার। সঙ্গে ছিল ভুজিয়া আর কাজুকতলি। রেসিপিটা দেখা যাক।

টিকড়া

টিকড়ার জন্য আটা নুন দিয়ে মাখুন। চারটি টিকড়ার পুর বানাবার জন্য দুটো পেঁয়াজ কুচিয়ে কাটুন। কড়াইতে দুই চামচ তেল গরম হলে নুন দিয়ে পেঁয়াজ ছাড়ুন। পেঁয়াজ একটু ভাজা হলে পরিমাণ মতো আস্ত জিরে, আস্ত ধনে, গুড়ো লংকা, আমচুর আর দুই চামচ বেসন দিয়ে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে রাখুন। এই পুরটা স্টাফ করুন আর পরোটা বানিয়ে দু-দিক ভালো করে ভেজে নিন।

চাটনি

চাটনি বানাবার জন্য রসুন ১০০ গ্রাম, আস্ত শুকনো লংকা ৫ টা, লাল

টমেটো ২ টো, ১ চামচ ভিনিগার পরিমাণ মতো নুন দিয়ে মিক্সিতে বেটে নিন। এবার কড়াইয়ে ৫ চামচ তেল গরম করে একটু জিরা ফোড়ন দিয়ে মিক্সটা ছেড়ে দিন। ভালো করে কষিয়ে নামিয়ে নিন। এই চাটনি অনেকদিন রেখে খাওয়া যায়।

গরম টিকরার ওপর মাখন কিংবা ঘি দিয়ে চাটনিসহ পরিবেশন করুন।

স্নিগ্ধার কথা

এম.এ পড়ার জন্য বিকানের যেতে হল। পিঠোপিঠি দিদি বিকানেরেই এস.বি.বি.জে তে কর্মরত ছিল। দোতলায় একটা ঘরে ভাড়ায় ছিলাম। দু-বছর বাড়িওয়ালি মৌসি আমাদের মাথায় তুলে রেখেছিলেন। কারণ, আমরা ওঁদের বাড়ি যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর বর ১৮ বছর পর বিকানের বদলি হয়ে আসেন। মৌসির কাছে শিখেছিলাম লালমাস। লালমাস রাজস্থানের শিকারিদের রান্না। রেসিপিটা দেখা যাক।

লাল মাস

১ কিলো মটনের জন্য ১৫-২০টা মাথানিয়া মির্চ চার চামচ জল আর হাফ কাপ দই দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন (মাথানিয়া মির্চ নামেই লংকা,

Apollo Clinic

Expertise. Closer to you.

AGARTALA

With ULTRA-MODERN FACILITIES

&

EXPERIENCED DOCTORS FROM ALL OVER INDIA

খেতে একটু মিষ্টি। উদয়পুরের কাছে মাথানিয়া গ্রামে এই লংকার চাষ হয়)। মাংস হাফ কাপ জলে একটু নুন দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ করা জলটা আলাদা করে রাখুন। একটা কড়াইয়ে হাফ কাপ ঘি গরম করুন আর তার মধ্যে ১০০ গ্রাম বাটা রসুন ছেড়ে দিন। রসুনের গন্ধ বেরিয়ে এলে ওটার মধ্যে দই-এর সঙ্গে বাটা মাথানিয়া মির্চ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। ১ চামচ নুন, ১ চামচ হলুদ, ৩ চামচ গুঁড়ো ধনে আর একটু কাশ্মীরি লাল মিরচি পাউডার দিয়ে কষিয়ে নিন। মসলা কষানোর পর সেদ্ধ করা মাংসটা ছেড়ে দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে অল্প অল্প করে সেদ্ধ মাংসের জলটা ছেড়ে দিন। এই মাংসটা একদম ড্রাই হবে। জলটা শুকিয়ে যাওয়ার পর মাংসের ওপর একটু ধনেপাতা কুচি আর লেবু দিয়ে নামিয়ে গরম গরম রুটি পরোটার সঙ্গে খেতে খুবই ভালো লাগে।

এটা লাল মাসের অরিজিনাল রেসিপি। কিন্তু আজকাল ফিউশনের যুগ। রান্নাতেও ফিউশন। সেজন্য, আজকাল লাল মাস রান্নাতে কেউ কেউ পেঁয়াজ ভেজে দেন, কেউ বা দেন আদা, আবার কিছু রাঁধুনি তো নাছোড়বান্দা হয়ে গরম মশলা দেবেনই দেবেন।

শীতকালের মতো, গরমকালও ছিল ওখানে খুব কষ্টের। ৪৮-৫০ ডিগ্রি তাপমান ছিল সাধারণ ঘটনা। না ছিল কুলার, না ছিল ফ্রিজ। মটকির ঠান্ডা জল একমাত্র ভরসা। মাঝে মাঝে আকাশ কালো করা বালির ঝড় ঘরের ভেতর দু-এক ইঞ্চি ধুলোবালি নিয়ে আসত। কখনো বড়ো বড়ো রাস্তার ওপরেও বালির চর পড়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যেত। জলের অভাব ছিল না, কিন্তু সবুজ শাক-সবজির খুব অভাব ছিল। আমাদের জন্য গরমকালে রান্না করা মায়ের জন্য একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল। এই সময় রাজস্থানের লোকেরা আলু পেঁয়াজ রসুন আর শীতকালের সময় শুকিয়ে রাখা নানারকম শাক-সবজি রান্নায় ব্যবহার করত, বিশেষ করে জৈনীরা। শুকনো করা শাক-সবজির মধ্যে বিশেষ করে ছিল গয়ারফলি, কাচড়ি, বাঁধাকপি, কমল-ককড়ী, ফুলকপি, টমেটো ইত্যাদি। কাচড়ি একটা ফল। কের-এর মতো এটাও একটু টক। কাচড়ি পাউডার টেন্ডারাইজার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

এগুলোর মধ্যে খুব প্রচলিত আর জনপ্রিয় হল কের-সাংগ্রি। কের অনেকটা কুলের সাইজের, খেতে একটু টক। সাংগ্রি অনেকটা বিন্সের মতো দেখতে, কিন্তু খুব সরু।

ভিজিয়ে রাখা কের-সাঙগ্রি, আস্ত আমচুর, কাচড়ি আর শুকনো লংকাকে ধনেগুঁড়ো, লংকাগুড়ো, হিং, নুন, আমচুর পাউডার আর হলুদ দিয়ে একটু বেশি তেল দিয়ে রান্না করা হয়। আচারের মতো তৈরি হয়।

শামী কাবাবের কথা উঠলেই আমার একটা বিবেক দংশন আর অপরাধবোধ জাগে। সেজন্য রেসিপিটা বলার আগে আমি ঘটনাটা জানাতে চাই।

বিয়ের কিছুদিন পরই ছিল দুর্গাপুজো। দিল্লিতে দুর্গাপুজোয় আনন্দমেলা হয় পঞ্চমী কিংবা ষষ্ঠীতে। মহিলারা স্পেশাল পদ বাড়ি থেকে রান্না করে আনতেন আর সেগুলো পুজো প্যান্ডেলে স্টল লাগিয়ে বিক্রি করতেন। নতুন বউ দেখে সবাই চেপে ধরল—স্টল দিতেই হবে। শাশুড়িমাও উৎসাহ দিলেন। আইটেম হবে শামী কাবাব। দেওর মাটন কিমা নিয়ে এল। প্রায় ১৫০ টা কাবাব বানিয়ে আমি বিকেলে প্যান্ডেল যাবার জন্য তৈরি। তিন টাকা পিস। সেই সময় দেখি নীতিন ফ্রিতে খাবার জন্য ঘুরঘুর করছে। দিলাম না। বেগতিক দেখে দেওর দশ টাকা হাতে দিয়ে তিনটি কাবাব চাইল। অবাক কাণ্ড। বাড়ির লোক কাবাব কিনে খাবে সেকী হয়? দেওরকে বোঝালাম কাবাব তো বিশেষ বিক্রি হবে না, বিকেলে পেট ভরে ফ্রিতে খেও। লক্ষ্মণসম দেওর প্রস্তাবে রাজি হল। আনন্দমেলা শুরু হতেই, সমস্ত কাবাব বিক্রি হয়ে গেল। লোকেরা একটা বা দুটো কিনে খেল আর আটটা-দশটা প্যাক করিয়ে নিয়ে গেল। বিক্রির আনন্দ কী করব, টেনশনে মরে যাচ্ছিলাম যে বাড়ির সবাই কাবাবের জন্য অপেক্ষায় বসে আছে। তারপর জীবনে অনেক অনেক বার কাবাব হয়েছে সবাই খেয়েছে, কিন্তু আজও আমি দেওরের কাছে মনে মনে তিনটি কাবাবের ঋণী। পরের দিন বাড়ির সবার জন্য যখন আবার কাবাব তৈরি করছি, পাড়ার দত্তমাসিমা এসে জানালেন যে আনন্দমেলা কমিটি প্রথম পুরস্কার শামী কাবাবকে দিয়েছে।

শামী কাবাব বানাবার জন্য ৫০০ গ্রাম মাংসের কিমা (বিনা চর্বি), ৫০ গ্রাম ছোলার ডাল, ২০ গ্রাম আদা, ১ টা আস্ত রসুন, ১ টা পেঁয়াজ, ৪ টা ছোটো এলাচ, ১ টা দারচিনি, ৪ টা শুকনো লংকা, ১ চামচ গুঁড়ো লংকা, গোটা দশেক গোলমরিচ, পরিমাণ মতো নুন এক কাপ জল দিয়ে প্রেশার কুকারে সিদ্ধ করে বেটে নিন। বার করে একটা ডিম দিয়ে ভালো করে মেশান। সাধারণ চাটু কিংবা ননস্টিক কিংবা ডিপ ফ্রাই যেভাবে ইচ্ছা ভাজতে পারেন। সঙ্গে দিন কাঁচা পেঁয়াজ আর ধনেপাতা পুদিনার চাটনি।

নীতিনের কথা

মরুভূমি, আর জলকষ্ট নেই!!! এটা ভাবাও অন্যায়। মন শক্ত করে তৈরি ছিলাম যে রেশন করা আধ বালতি জল দিয়ে সারাটা দিন চালাতে হবে। কিন্তু দেখলাম অফুরন্ত জল। কুবের গ্রুপদের বাড়ি, বিড়লাদের শ্বশুর বাড়ি, বড়ো বড়ো মেড়ো বিজনেসম্যানদের বাড়ি সব সরদারশহরে ছিল। তাঁরাই মোটামুটি জলের ব্যবস্থাটা করে রেখেছিলেন। আশেপাশের গ্রামে জলকষ্ট অবশ্য ছিল। মাড়োয়ারিদের মেড়ো বলে ডাকলে আমার খুব খারাপ লাগে। যতই হোক, শ্বশুরবাড়ির লোক বলে কথা!

পরের দিন শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ির কাছেই এক শেঠজির বিশাল বাড়িতে পারসোনাল মিউজিয়াম। অকল্পনীয় সংগ্রহ। মধ্যযুগীয় ইউরোপিয়ান পেইন্টিং থেকে মোঘল আমল

Best Wishes from

Medha Chowdhury

Naktala, kolkata

Best Wishes from

Ritu Enterprises

Jadavpur

থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হস্তশিল্পের কাজ যা দেখলাম সেটা বর্ণনা করা খুব কঠিন। যেরকম একটা চিনেবাদামের খোসার মধ্যে বিকানের ফোর্ট। চালের দানার উপর একুশবার রামনাম ইত্যাদি। জানা গেল এই সব কাজ চুরু শহরের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত এক সূথারের। এই শেঠজি শ্বশুরমহাশয়ের বন্ধু আর পেশেন্টও। অতএব নৈশভোজ তাঁর বাড়িতে।

স্নিগ্ধার কথা

নাহ্‌টা চাচাজির নৈশভোজে ছিল মিসি রোটি, বাজরা কি রোটি, খিচড়া, কেড়সাঙড়ী, রসুনের চাটনি, হরা টমাটর কি সবজি, মোটা মিরচি কি সবজি, মোগর মূলী, নানা ধরনের আচার/মিষ্টি আর ছোটো বাটিতে ঘি। খেতে বসে নীতিন মহা অপ্রস্তুতে ফেলল। বাজরার রুটি বড়ো, মোটা আর সিমেন্ট রং হয়। থালাতে রাখা ছিল। বুঝতে না পেরে আমাকে আকার ইংগিতে জিজ্ঞাসা করছিল দুটো প্লেট কেন, একটার ওপর আরেকটা?
চাচীজি বুঝতে পেরে বললেন, কূয়ঁরসা, ই ভী রোটী সে। বাজরে রো। ইরে উপর ঘি ঘালো। থালা, বাটি, চামচ, গ্লাস সব কিছু রুপোর।

গট্টে কি সবজি

নাম গট্টে কি সবজি ঠিকই, কিন্তু এতে মোটেই কোনো সবজি নেই। গট্টে বানাবার জন্য ২০০ গ্রাম বেসন, চামচ নুন, চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, আস্ত জিরা, আস্ত ধনে (আধা চা চামচ) মিশিয়ে দিয়ে একটু কসুরি মেথি আর আধ চামচ বেকিং পাউডার দিয়ে ভালো করে হাত দিয়ে সব মিশিয়ে নিন। এরপর অল্প জল দিয়ে আটার মতো মেখে নিন। একটাে পাত্রে জল ফুটিয়ে জলের মধ্যে এটাকে লম্বা লম্বা করে রোল বানিয়ে ছেড়ে দিন। ফুটে উঠলে নামিয়ে নিন। এবার এই লম্বা লম্বা রোলগুলোকে গোল গোল করে কেটে নিন আর কড়াইয়ে গরম তেলে অল্প করে ভেজে নিন। এটার গ্রেভি বানাবার জন্য আমরা একটা বাটিতে আধা কাপ দই, ১ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, ১ চামচ ধনে গুঁড়ো, আধা চামচ হলুদ গুঁড়ো আর একটু আমচুর পাউডার দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নেব। তারপরে কড়াই-এ আধা কাপ তেল গরম করে ওটার মধ্যে ২ চামচ রসুনবাটা ছেড়ে দিন। রসুনের গন্ধ বের হলে তার মধ্যে ফেটানো মশলাটা দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নেবেন।

এবার কড়াই তে দু-কাপ জল ঢেলে দিন। জল ফুটে উঠলে ওর মধ্যে ভাজা গট্টাগুলো ছেড়ে দিয়ে গ্যাসটা বন্ধ করে দিন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল গট্টে কি সবজি।

বাজরার রুটি

বাজরার রুটির জন্য একটা রুটির মতো বাজরা নিয়ে নুন আর অল্প জল দিয়ে খুব ভালো করে মাখতে হবে। পুরো বাজরাটা একসঙ্গে মাখলে রুটি তৈরি হবে না। মাখাটা নরম হলে মোটা করে রুটির মতন বেলে নিন আর একটা ননস্টিক বাসন গরম করে রুটিটা দিয়ে দিন। রুটিটা হয়ে গেলে ওটা নামিয়ে রেখে দিন। এবারে আরেকটা রুটি বানাবার জন্য আবার করে আপনাকে বাজরা মাখতে হবে। বাজরার রুটিগুলো খুব একটা পাতলা হবে না, বরং একটু মোটা মোটা হবে।

সেই নাহ্‌টাচাচা, চাচীজি আজ কেউ নেই। শুধু আছে ভগ্নদশায় বিশাল হবেলীটা যার কয়েকটি ঘরের ভিতরের ছাদে সোনাজল দিয়ে করা অপূর্ব কারুকার্য। তাঁদের একমাত্র মেয়ে, আমার বান্ধবী, বিদেশে থাকে। আজ মুষ্টিমেয় পুরানো বিশ্বাসী কাজের লোকেই হবেলী আর মিউজিয়ামটার দেখাশোনা করে।

শুধু নাহটাচাচার হবেলী নয়, সরদারশহরে এইরকম পুরানো হবেলী প্রচুর আছে, যেগুলো শুধু কাজের লোকেরা দেখাশোনা করে। মালিকেরা বছরে একবার দীপাবলীর সময় আসেন, লক্ষ্মীপুজো করেন আর চলে যান।

নানারকম রান্নার রেসিপির জন্য দেখুন আমার ইউটিউব চ্যানেল 'পিসির কিচেন'

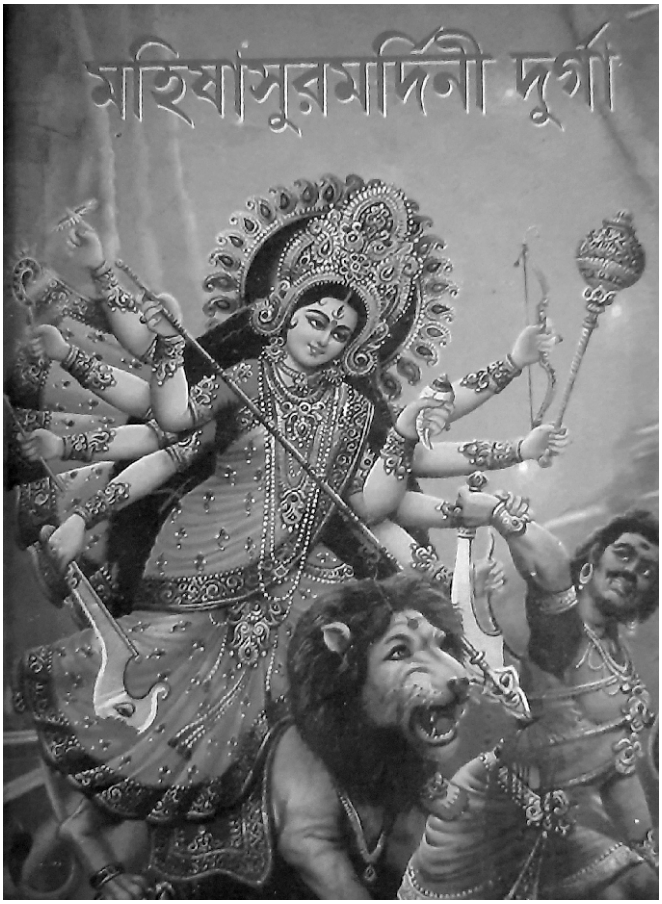

কিছু বই, ছায়াছবি

দেবতোষ মিত্র

১

বই, প্রত্যেকেই আলো। প্রদীপ। মোমবাতি। সূর্যালোক। রাতের লাইটহাউস। সার্চলাইট।

এই বিশ্বাস আছে তাই বই কিনি, বই পড়ি, বই সংগ্রহ করে চলেছি সারাজীবন।

বই আরো অনেক কিছুই। তবে আমার মতন এক সাধারণ পাঠকের কাছে, বই, প্রথমত আলো।

বই আমার জীবন আলোকিত করে রেখেছে। এই আমার বিশ্বাস। এই আমি এক সাধারণ পাঠক। এক সাধারণ পাঠকের জীবনে আঁধারের আলো হচ্ছে এই বই। আর জীবনের আঁধার হলো অজ্ঞানতার আঁধার। এবং বই সেই অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে। বলে চলেছি এই কথাটাই, সবিনয়ে, কিন্তু দ্বিধাহীন উচ্চারণে। বই আমার আলো। জ্ঞানের আলো।

ছড়ানো-ছেটানো লাইটহাউস যত বই এ-ঘরে ও-ঘরে, সারাজীবন ধরে যাদের সংগ্রহ করেছি, তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে দু-এক লাইন লিখতে গেলে এই খাতা বা এই অষ্টপ্রহর রাতদিন, যে কোনো একটা আগে ফুরোবে ; তবু সকলের কথা বলা হয়ে উঠবে না।

২

একটা বই সামনে খোলা, তার ছাপা আখরে নিবদ্ধ দৃষ্টি, সঙ্গে এক-দুই-তিন কাপ কালো কফি, ঝগড়াঝাঁটি যা যা ছিল বা আছে তা আটকে আছে অন্ধকার টেলিভিশনে, এখানে বইয়ের পাতায় হয়তো তুমুল ঝগড়া করছেন যিনি লিখেছেন তিনি, কিন্তু বইয়ের সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া নেই, আছে এক তন্ময় নীরবতা --- যে তন্ময়তা, যে নীরবতা না থাকলে কোনো পাঠ সম্ভব না।

এই জীবন জুড়ে অসংখ্য পাঠ। এবং এই জীবন এক দীর্ঘ পাঠ। এই জীবন এক দীর্ঘ দুঃখের পাঠ। এই জীবন সুখের স্মৃতিচারণ। এই জীবন এক অনিমেষ দৃষ্টির দিনলিপি।

৩

প্রতিটি বই এক যাত্রা। এক ভ্রমণ ।

শুরু প্রথম বাক্যে।

শেষ যতিচিহ্ন যখন আসে তখন যাত্রা সমাপ্ত।
যাত্রী অবশ্যই তিনি, যিনি পাঠ করেন।
একবার পাঠ করে কখনো কখনো পাঠিকা বা পাঠক মনে করেন এই ভ্রমণ এত সুন্দর যে এক বার এসে মন ভরল না, আরো একবার আসতে হবে, আরো একবার পাঠ করতে হবে এই বই।
ঠিক যেমন কোনো জায়গায় ভ্রমণ করে ভ্রমণকারী যখন ভাবেন আর-একবার সুযোগ করে আসতেই হবে, তখন যেমন সেই সুন্দর স্থানের জয় হয়, তেমনই কোনো বই যিনি লিখেছেন তাঁর জয় হয়, যখন কোথাও কোনো পাঠক সে বই আর-একবার পাঠ করতে ফিরে আসেন।

৪
কোনো কোনো বই হয় এমন যে বছরে অন্তত একবার মনে পড়বেই।
এই যেমন, 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গা'। দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশিত এই সংকলন গ্রন্থে ধরা আছে মা দুর্গা সম্পর্কিত সুন্দর নিবেদন কিছু।
দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশ করে চলেছেন 'নবকল্লোল' পত্রিকা, কয়েক দশক ধরে। এই পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যাগুলিতে মা দুর্গা সম্পর্কিত নিবন্ধ থেকে বেছে নিয়ে এই সংকলন, 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গা'। সম্পাদনা করেছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ।
এই সংকলনে মা দুর্গার পূজার প্রাচীন ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, বাংলার নানা প্রান্তে, কলকাতার দুর্গোৎসব প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত সুলিখিত সব নিবন্ধ আছে।
প্রতি বছর দুর্গোৎসব আসে, আশ্বিনে, আর এই গ্রন্থ আলমারি থেকে বার করে পাঠ করি।
দুর্গাপূজার কয়েক দিন আকাশে বাতাসে যখন জগজ্জননী মা দুর্গার নাম, গান, মন্ত্র ও স্তব ভেসে থাকে তখন আমি অবশ্যই প্রতি দিন এই গ্রন্থ পাঠ করি।
এই আমার এক মাতৃপূজা ।
৫
কিছু বই থাকে সর্বদাই হাতের কাছে।
বহু বইয়ের ভিড়ে তাদের হারিয়ে যেতে দেওয়া যায় না।
কী জানি কখন তাদের স্মরণ করতে হয়।
আমার এমন কয়েকটা বই আছে।

এক, 'গীতবিতান'। বিশ্বভারতীর 'গীতবিতান'। আমার 'গীতবিতান'। সর্বদাই হাতের কাছে রাখি। চোখে চোখে রাখি। ব্যবহার করতে করতে ছেঁড়াখোঁড়া হয়ে গেলে নতুন আর-একটা কিনে নিই। 'গীতবিতান'-এর পাতা উল্টে সংগীতগুলো পাঠ করি। সুর যদি জানা থাকে মনে মনে গুনগুন করি।

দুই, রাজশেখর বসু অনূদিত 'মহাভারত'। এম সি সরকার প্রকাশিত লাল মলাটের 'মহাভারত'। 'মহাভারত' আমার আরো আছে। কিন্তু এই 'মহাভারত' অসামান্য, রাজশেখরবাবুর অনবদ্য কলমের গুণে। যেখান থেকে ইচ্ছে

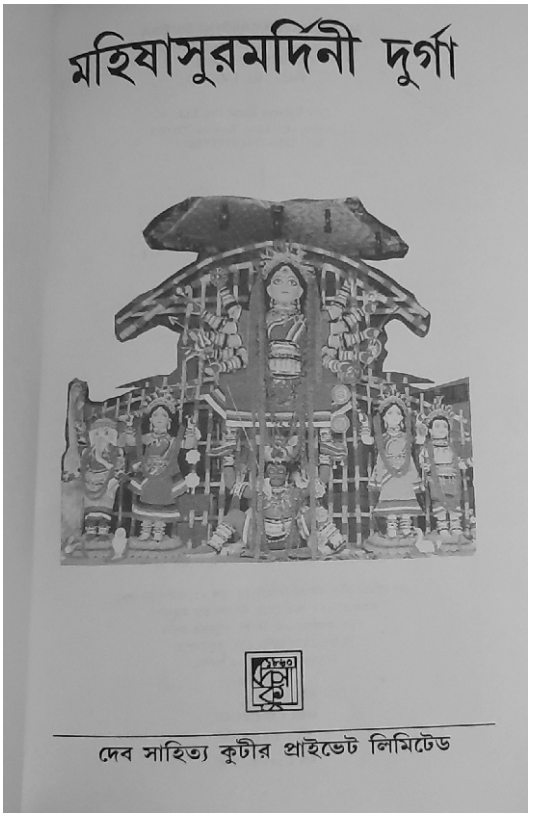

হয় পাঠ করি। সুখপাঠ্য বাংলা লেখা কাকে বলে তার উদাহরণ রাজশেখর বসু-র 'মহাভারত'।

তিন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত দুই খণ্ডের এই শব্দকোষ চোখের আড়াল হতে দিই না। যখনই কোনো শব্দ অনুসন্ধান করতে হয়, হরিচরণবাবুর শরণাপন্ন হই।

চার, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', নিশীথরঞ্জন রায় প্রণীত, দেজ পাবলিশিং প্রকাশিত। চোখের সামনে রাখি এই মহাগ্রন্থ। বাঙ্গালী হয়ে জন্মেছি তো।

বাঙালি হয়ে জন্মেছি তাই এই চারটে বই আমার কাছে কাছে রাখি, হারিয়ে যেতে দিই না।
৬
কোনো কোনো বই কেমন ভাবে শুরু হয় সে দিকে দৃষ্টি যায় প্রথমে, পাঠক বা পাঠিকাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে বই শুরু হওয়ার কোনো বাক্য বা দৃশ্য, যা অঙ্কিত হয়েছে বা কোনো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিকোণ, যিনি লিখেছেন তাঁর, সে দিকে দৃষ্টি যায় প্রথমে, পাঠিকা বা পাঠকদের, এবং আরো বড়ো কথা হল সেইটা মনে থাকে বহুকাল, স্মৃতি ধরে রাখে, সেই শুরুর কথা, দৃশ্য বা দৃষ্টিকোণ।

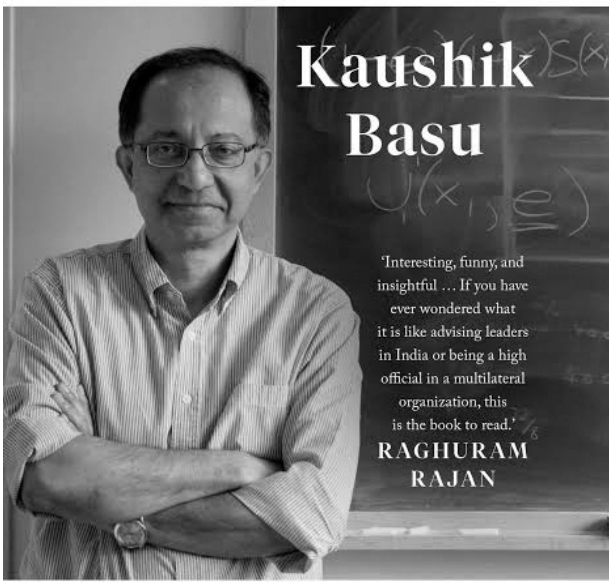

৭

আর যদি কোনো তেমন বই হয় যা সদ্য প্রকাশিত হয়েছে, যে বই সবে মাত্র পড়া শুরু করা হয়েছে, যে বই এই সময়েই আছে এখনো, যে বই তার ভবিষ্যত এখনো শুরু করেনি, এখনো যে বই ভুলে রিভিউ হচ্ছে পত্র-পত্রিকায়, যে বই লেখকের সাম্প্রতিক, আর তার শুরুর দৃশ্য বা কথা বা দৃষ্টিকোণ উল্লেখযোগ্য মনে হচ্ছে পাঠকের, কারণ পাঠকের মনে তা প্রথমেই একটা ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছে, সেই এখনকার নতুন কোনো বইয়ের ভবিষ্যত সম্পর্কে পাঠিকা বা পাঠক কল্পনা করতে থাকেন যে এই প্রথম দৃশ্য বা কথা তাঁর অনেকদিন মনে থাকবে, যদিও সে, পাঠক, তার ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছেন না।

৮

উদাহরণ স্বরূপ, ডঃ অমর্ত্য সেন, তাঁর সাম্প্রতিক স্মৃতিকথা, 'হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড', (যা প্রকাশ পেয়েছে এই একুশ সালের জুলাই মাসে, প্রকাশক অ্যালেন লেন) শুরু করেছেন তাঁর সবচেয়ে প্রথম স্মৃতি যা তাঁর মনে আছে, এক জাহাজের ভোঁ বা হর্ন, উনি ব্যবহার করেছেন ইংরেজির "হুট" শব্দ, যে জাহাজে তাঁর বাবা তাঁদের নিয়ে চলেছিলেন, এবং তখন ডঃ সেনের বয়স তিন।
তাঁর সেই জাহাজের বাঁশি আমার স্মৃতির ঘরে স্থান পেয়ে যায় বরাবরের মতো। যখনই অমর্ত্য সেনের এই স্মৃতিচারণের কথা ভাবব, তখনই আমার ওই জাহাজের কথা মনে পড়বে।
আর একটা কথা অমর্ত্য সেনের স্মৃতিচারণের সূচনা থেকে উঠে আসে আমার স্মৃতিতে। তিনি স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা, এবং স্বীকার করেছেন এই স্মৃতিচারণের নাম যে 'হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড', তা 'ঘরে বাইরে' থেকে অনুপ্রাণিত এবং তাঁর জীবনে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব এর দ্বারা প্রতিফলিত।

৯

এই দু হাজার একুশের জুলাই মাসেই, অমর্ত্য সেনের স্মৃতিকথা প্রকাশিত হওয়ার দুদিন আগে, প্রকাশিত হয়েছে তাঁরই একদা ছাত্র, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কৌশিক বসুর দিনলিপি, 'পলিসিমেকার'স জার্নাল -- ফ্রম নিউ দিল্লি টু ওয়াশিংটন ডিসি', প্রকাশক সাইমন অ্যান্ড স্কুশটার।
জার্নালে এন্ট্রি স্টাইলে ও ফর্মাটে হালকা চালে লেখা এই গ্রন্থে অধ্যাপক বসু বহু এমন বিষয়ে আলোচনা ও আলোকপাত করেছেন যা আমার মতন সাধারণ মানুষের জানা সম্ভব নয়।
ডঃ মনমোহন সিংহ যখন প্রধানমন্ত্রী তখন তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন অধ্যাপক বসু এবং প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদে কাজ শুরু করেন, এই জার্নাল সেই সময়ের।
প্রথম দিকে জানাচ্ছেন অধ্যাপক কৌশিক বসু, কীভাবে এবং কেন ডঃ অমর্ত্য সেন হয়েছিলেন কৌশিকবাবুর পিএইচডি রিসার্চ গাইড এবং শিক্ষক।
কৌশিকবাবু দ্বিধাহীন ঘোষণা করেছেন এই গ্রন্থে, যে, আজ থেকে একশো বা দুশো বছর পরের মানুষ অমর্ত্য সেনকে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব রূপে দেখবেন, যেমন এখনকার মানুষের চোখে অতীতের রুসো বা ভলতেয়ার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।
এই কথা কৌশিকবাবুর অনুভব, তিনি জানিয়েছেন, এবং এর পরে দীর্ঘ কয়েক অনুচ্ছেদ ধরে রুসো, ভলতেয়ার, এনলাইটেনমেন্ট ও সেই সময় নিয়ে আলোচনা করে তিনি দেখাতে সচেষ্ট কেন অমর্ত্য সেন সম্পর্কে তাঁর এমন অনুভব।
আর তারপর ফিরে এসেছেন কৌশিক বসু, অমর্ত্য সেন প্রসঙ্গে, জানিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয়ে অমর্ত্য সেনের বিপুল আগ্রহের কথা, আর ডায়েরি লেখার হালকা স্টাইলে কৌশিকবাবুর আলোচনা চলে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে।
অমর্ত্য সেন তাঁর স্মৃতিকথার ভূমিকায় জানিয়েছেন, প্রায় দশ বছর ধরে তাঁর এই স্মৃতিকথা তিনি লিখেছেন।
কৌশিক বসুর এই ডায়েরি তাঁর একটা সময়ের চিন্তাভাবনার প্রকাশ।
এই সময়ের এই দুই উজ্জ্বল বিদ্বান ব্যক্তিত্ব তাঁদের

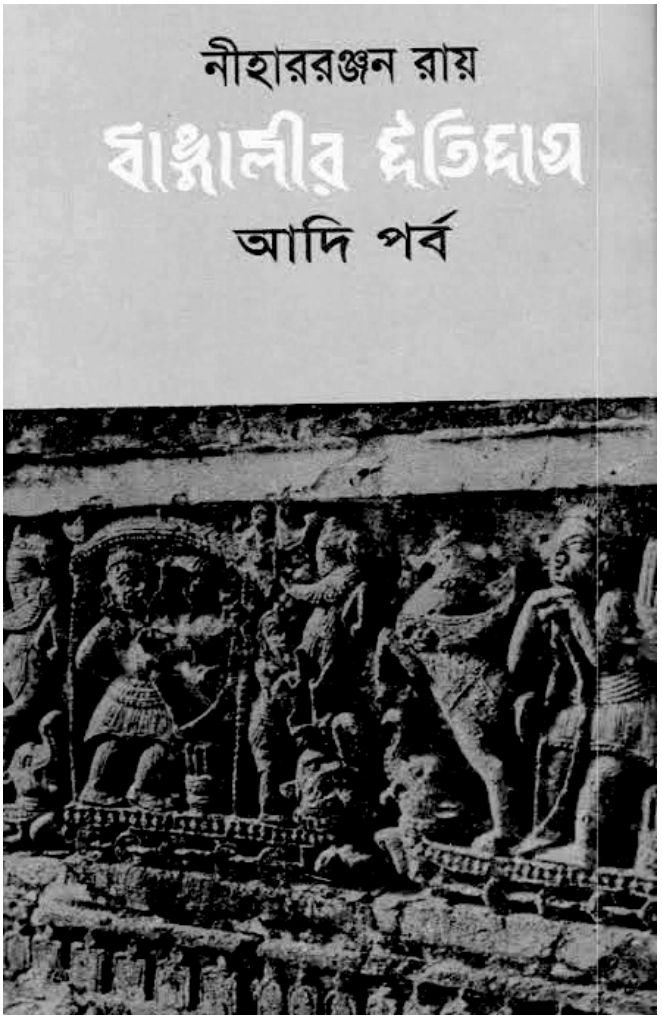

কথা বলেছেন এই দুই গ্রন্থে, তাই মনে হয়, এই দুই গ্রন্থ, এই দু হাজার একুশে প্রকাশিত দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রূপে ধরা হবে।

১০
এই দু হাজার একুশের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়েছে একটি আশ্চর্য উপন্যাস যা লিখেছেন ঝুম্পা লাহিড়ি। উপন্যাসের নাম, 'হোয়্যারঅ্যাবাউটস'।

এটি ইংরেজী অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন নিজেই, ঝুম্পা লাহিড়ি। প্রথমে লিখেছেন ইতালিয়ান ভাষায়। ইতালিয়ান থেকে তারপর নিজেই ইংরেজি করেছেন।
'হোয়্যারঅ্যাবাউটস'।

এই উপন্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে , এখানে উপন্যাসের ফর্মকে ছাপিয়ে উপচে উঠেছেন ঝুম্পা লাহিড়ি।

বেশি কথা কোনো কাহিনি সম্পর্কে বলতে গেলে গল্পের আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায়। এই নষ্ট করার কাজকে ইংরেজিতে বলা হয় স্পয়লার। আমার অন্তত স্পয়লার হওয়ার কোনো বাসনা নেই। একবার পড়েছি, প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

এই উপন্যাসে লেখিকা একটা মন-কেমন করা মেজাজ তৈরি করেছেন। আর এই কারণেই এখন আর একবার পড়তে ইচ্ছে করছে।

১১

মন-কেমন করা মেজাজ কোনো কোনো বইয়ের থাকে। থাকে কোনো লেখক বা লেখিকার কলমে। মনে পড়ে যায় তিন-চার দশক আগেকার ব্রিটিশ লেখিকা অনীতা ব্রুকনার-এর কথা। প্রথম তাঁর বই পর পর কয়েকটা পাঠ করেছিলাম কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি থেকে নিয়ে। অনীতা ব্রুকনার-এর নায়িকাদের এক পৃষ্ঠা পাঠ করলেই চেনা যায়। তার কারণ অনীতা-র বিশেষ একটা ইংরেজি লেখার স্টাইল, যেটা এই বাংলা রচনায় লিখে বোঝানো একটু মুশকিল। অনীতা ব্রুকনার-এর নায়িকাদের চেনা যায় তাদের উচ্চ শিক্ষিত হওয়া, তাদের কথা বলার মধ্যেই বুদ্ধির ছাপ, আর, তাদের বিষণ্ণতায়।

১২
একটা স্মৃতি ডেকে আনে আরেকটা স্মৃতিকে। মনে পড়ল কুড়ি-বাইশ বছর আগে কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পাঠ করেছিলাম জার্মান সাহিত্যিক বার্নহার্ড স্লিংক লিখিত উপন্যাস 'দ্য রিডার', ইংরেজি অনুবাদে।
একটি প্রেম আর বই পাঠ, এই দুটো ধারায় তরতর করে এই উপন্যাস বহে চলে। অসামান্য কাহিনি।

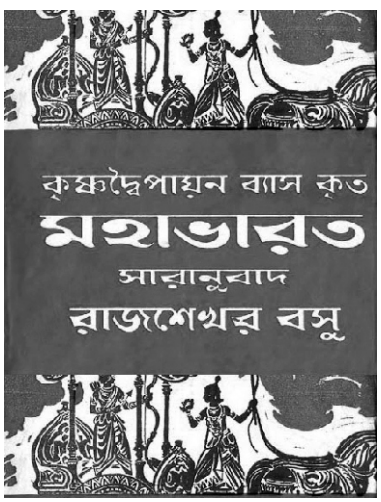

অসামান্য কথকতা লেখকের। আর এক বিষণ্ণ মেজাজ, কাহিনির।
কয়েক বছর পরে কলকাতার বইয়ের দোকানে এল পেপারব্যাক সংস্করণে এই উপন্যাস। কিনলাম, আবার পড়লাম।
আরো কত বছর পরে সিনেমা হল, টিভির চ্যানেলে এল এই উপন্যাস, 'টাইটানিক' সিনেমার বিখ্যাত নায়িকা কেট উইনসলেট এই সিনেমার নায়িকা, এবং এই প্রতিভাধর অভিনেত্রী আরো একবার এই দর্শকের হৃদয়ে কাঁপন ধরানো অভিনয় করেছিলেন। যতবারই সুযোগ পেয়েছি 'দ্য রিডার' সিনেমা দেখেছি। এখন আর দেখতে সুযোগ পাইনি অনেক দিন এই ফিল্ম।
বার্নহার্ড স্লিংক লিখিত 'দ্য রিডার' যেমন চমৎকার উপন্যাস, কেট উইনসলেট অভিনীত 'দ্য রীডার' তেমনই চমৎকার ফিল্ম।

১৩
সচরাচর এমন হয় না, যেমন সাহিত্য তেমনই ফিল্ম। সিনেমায় ছায়াছবির ভাষায় আনা সাহিত্যকে, সে এক দুরূহ

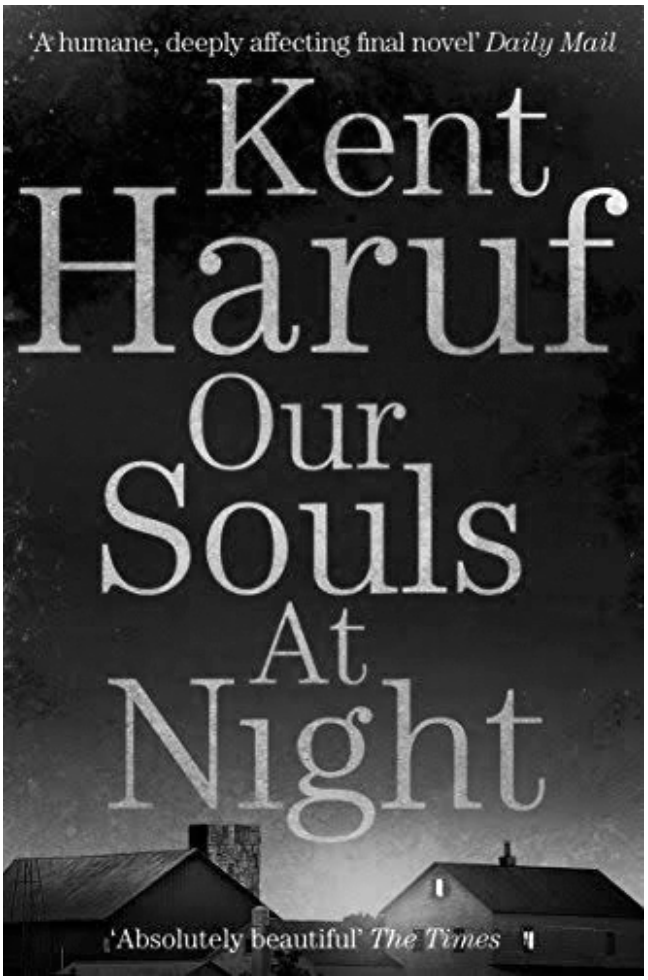

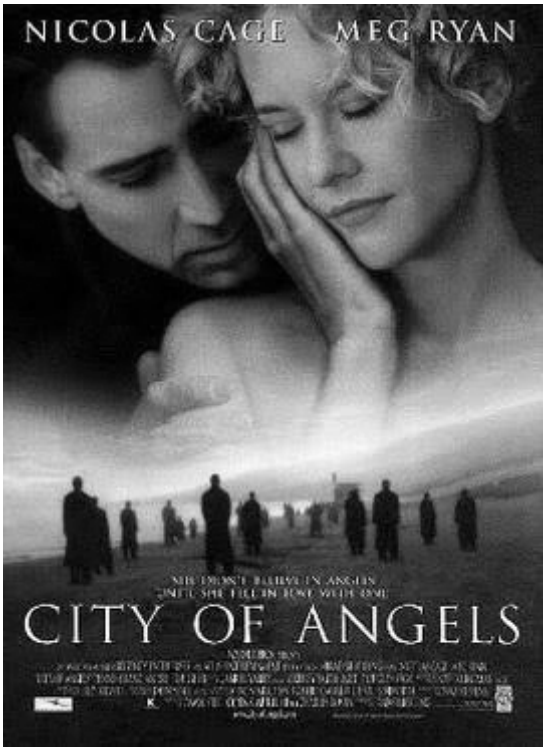

কাজ, মনে হয় আমার, যে এক সাধারণ পাঠক ও দর্শক।

'দ্য রিডার' ফিল্মের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল আরো একটি উপন্যাসের কথা, যা পড়তে 'দ্য রীডার'-এর মতোই ভালো লেগেছিল, চমকে গিয়েছিলাম কাহিনির সরলতায়।

আমেরিকান এই উপন্যাসের নাম 'আওয়ার সোলস্ অ্যাট নাইট', লেখকের নাম কেন্ট হারুফ। লেখকের এইটিই শেষ উপন্যাস। প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরের বছর, ২০১৫ সালে।

হঠাৎই এই উপন্যাস পেয়েছিলাম আমাজনের বই তালিকার মধ্যে, পড়েছিলাম, মোহিত হয়ে, লেখকের সরল কথা বলার স্টাইলে এবং বেদনাবিধুর কাহিনির টানাপোড়েনে।

দু বছর পর, ২০১৭ সালে এই উপন্যাসের সিনেমা হয়। মুখ্য দুই চরিত্রে অভিনয় করেন এককালের সাড়া জাগানো দুই তারকা, জেন ফন্ডা এবং রবার্ট রেডফোর্ড। এবং এই ফিল্ম পরিচালনা করেন হিন্দি ফিল্ম 'লাঞ্চ বক্স'-এর পরিচালক রীতেশ বাত্রা।

রীতেশ বাত্রা , জেন ফন্ডা ও রবার্ট রেডফোর্ড তিন

We are now on

Amazon

Lookeast Media Pvt. Ltd.

CE - 17, Sector -1, Salt Lake, Kolkata - 700064

Ph : 033 2321 3919 / 29

Email : lookeastmediapvtltd@gmail.com

জনেই ধরে রাখতে পেরেছেন লেখক কেন্ট হারুফ যে মেজাজ রেখেছিলেন তাঁর উপন্যাসে, আমার মনে হয়েছে। নেটফ্লিক্স্ এই সিনেমা তাদের ছায়াছবির বিশাল ফিল্ম লাইব্রেরিতে রেখেছে, তাই দেখতে পাই, মাঝে মাঝেই দেখি এই সিনেমা।

আর সাহিত্য থেকে নির্মিত দুটি সাম্প্রতিক সিনেমার কথা মনে হয়, সুযোগ পেলেই দেখি।

একটা হল সমারসেট মম লিখিত উপন্যাস 'দ্য পেন্টেড ভেইল' থেকে নির্মিত ওই নামেরই সিনেমা, ২০০৬ সালের। একশো বছর আগের ইংরেজ উপনিবেশ চীনে কলেরা মহামারির সময়ের কাহিনি। অসামান্য অভিনয় করেছেন নায়ক ও নায়িকা, যথাক্রমে, এডওয়ার্ড নর্টন এবং নাওমি ওয়াটস্।

আর একটা হল ফিলিপ রথ লিখিত উপন্যাস 'দ্য ডাইং অ্যানিম্যাল' অবলম্বনে সিনেমা 'এলিজি'।
উপন্যাস কিনে রাখা আছে, পড়া হয়নি, যখনই দেখি কোনো চ্যানেল দেখাচ্ছে টুক করে দেখে নিই এই সিনেমা, 'এলিজি', দেখতে থাকি দুই শক্তিশালী অভিনেতার অভিনয়, যা অভিনয় নয় বলে মনে হয়। নায়িকা পেনেলোপি ক্রুজ। নায়ক বেন কিংসলে।

১৪
নেটফ্লিক্স্ তার ছায়াছবির বিশাল ফিল্ম লাইব্রেরি থেকে এমন

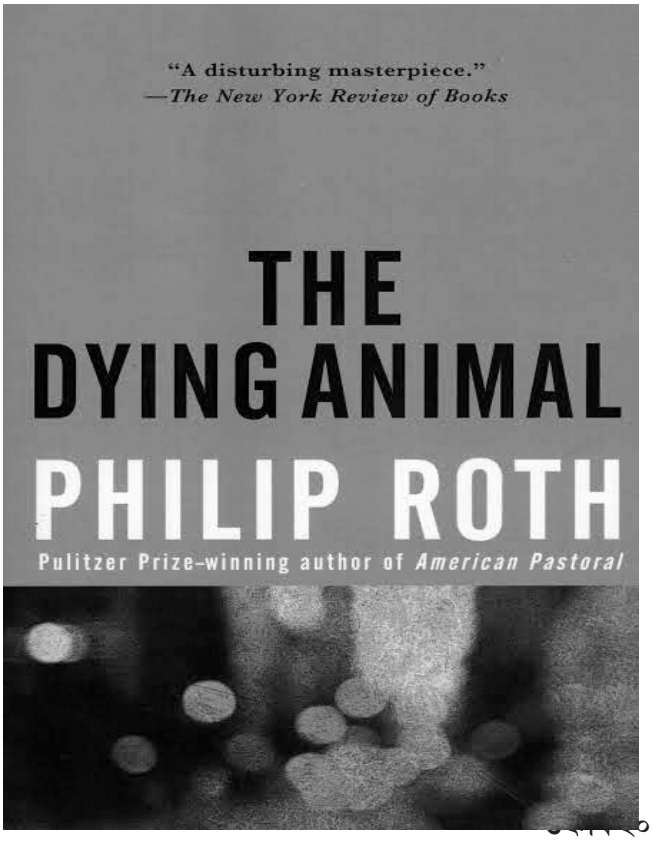

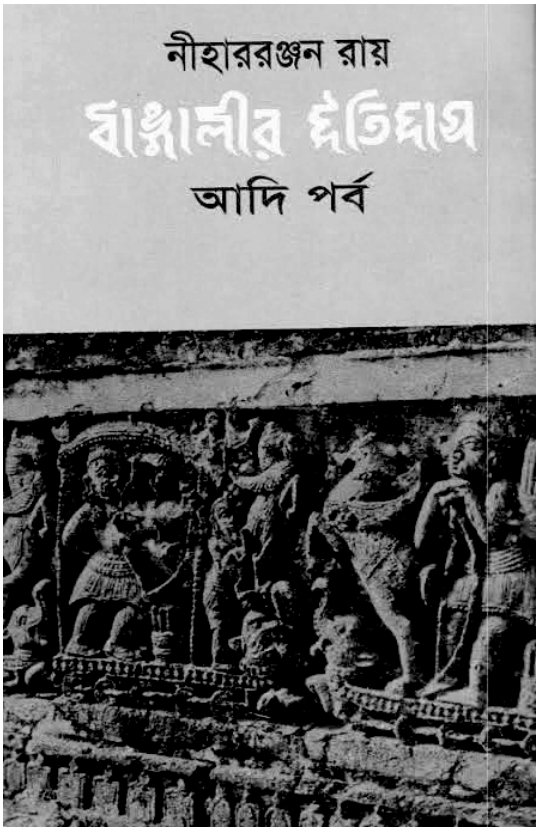

সব সিনেমার খবর দেয় এবং দেখার সুযোগ দেয় যেসব সিনেমার কোনো খবরই কখনো পাই না। এমন বেশ কিছু সিনেমা দেখেছি যা দেখার পর যে বই থেকে এই সিনেমা হয়েছিল সে বই পড়েছিলাম।

এমন এক সিনেমা হল 'অ্যারাইভ্যাল'। সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম, ২০১৬ সালের।

অন্য নক্ষত্র থেকে মহাকাশ যান পৃথিবীর আকাশে আসছে, আর মানুষের সঙ্গে তাদের ঠিক বা ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে সিনেমা বা সায়েন্স ফিকশন, কোনোটাই থিম হিসেবে নতুন কিছু না ; এই ফিল্ম 'অ্যারাইভ্যাল'-এর থিমও সেইটাই, কিন্তু একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যতিক্রম আছে এই ফিল্মে, আর সেটা হল ভাষা নিয়ে। একজন ভাষাবিদ অধ্যাপিকা এই সিনেমার মুখ্য চরিত্র, এবং অ্যামি অ্যাডামস্ সেই ভূমিকায় অনবদ্য।

কাহিনির স্পয়লার না হয়ে এইটুকুই বলা যায়, ভাষা বলতে আমরা মানুষরা যা বুঝি আর অন্য নক্ষত্রের অন্য যুগ থেকে আসা উন্নত প্রাণীরা তাদের উন্নততর বিজ্ঞানের সাহায্যে ভাষা বলতে যেটা বোঝে, সেই

ফারাকটা এক মানুষের ভাষাবিদ ধরতে পারছেন।

এই ফিল্ম এক সায়েন্স ফিকশন ছোট গল্পের ওপর ভিত্তি করে, সেটা জেনে সেই গল্পের বই কিনলাম, পড়লাম, কিন্তু মনে হল সিনেমাটাই বেশি ভালো এই ক্ষেত্রে ; যদিও এই গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনাটি অনন্য, এবং সেইজন্য এই গল্পের লেখক টেড চিয়াং প্রশংসিত, তবু এই ক্ষেত্রে আমার মতে সিনেমাটাই বেশি ভালো লাগে।

১৫

কোনো কোনো সিনেমা চিত্রনাট্য-নির্ভর, সাহিত্য বা গল্প বা উপন্যাস-ভিত্তিক নয়। এরকম তিনটে ফিল্ম মনে পড়ল।

একটা সায়েন্স ফিকশন। 'HER', সে সিনেমার নাম। উন্নত প্রযুক্তির আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা রোবট এবং নিঃসঙ্গ মানুষের ভালোবাসার গল্প। আমার খুবই প্রিয়।

দ্বিতীয় যে সিনেমার কথা বলতে চাই সেটা সায়েন্স ফিকশন নয় বটে, কিন্তু মন, মানুষের মন ও স্বপ্ন সেই সিনেমারও বিষয়। দুজন সদ্য পরিচিত মানুষ একই স্বপ্ন রোজ রাতে দেখেন। ভদ্রলোক স্বপ্নটা দেখেন একদিক থেকে, ভদ্রমহিলা সেই একই দৃশ্য স্বপ্নে দেখেন আর-এক দিক থেকে। হাংগেরির এই সিনেমার নাম 'অন বডি অ্যান্ড সোল'। দেখায় নেটফ্লিক্স্।

তৃতীয় সিনেমাটা দুবার নির্মাণ হয়েছে। প্রথম বার জার্মানির সিনেমা, দ্বিতীয়বার হলিউডের, ১৯৯৮ সালে। আমার দেখা হলিউডের ভার্সানটা। সিনেমার নাম 'সিটি অফ অ্যাঞ্জেলস্'। নিকোলাস কেজ এবং মেগ রায়ান প্রধান দুই চরিত্রে। এক দেবদূত প্রেমে পড়ছেন এক হার্ট সার্জেন লেডি ডাক্তারের সঙ্গে। তারপর যা হয়। আমার হৃদয়ের ছবি। কতবার যে দেখেছি!

১৬

সন্ধ্যা, দেখতে দেখতে হয়ে গেল মাঝরাত। প্রথমেই লিখেছিলাম, বই নিয়ে লিখতে বসলে রাত কিংবা এই খাতা, যেটা হোক আগে ফুরোবে, তবু বই শেষ হবে না। তার সঙ্গে আবার যোগ দিল সিনেমা। বই আর সিনেমা। বই আর ছায়াছবি। এই দুই নিয়ে এই জীবন যাপন। তার সঙ্গে যোগ দেয় স্মৃতি। বই আর ছায়াছবি আর স্মৃতি। বই আর ছায়াছবি আর স্মৃতি আর এই জীবন যাপন। এই নিয়ে কথা আর ফুরোতে চায় না।
রাত শেষ হয়ে যাবে তবু কথা আর ফুরোতে চায় না। অনুচ্ছেদ বেড়ে চলে।

দেবতোষ মিত্র

ফ্যাশন

উৎসবের দিনগুলোতে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সেজে উঠতে চলেছে ফ্যাশানপ্রিয় বাঙালিও। কেবল জামাকাপড়ই বা কেন, তার সঙ্গে তাল রেখে মানানসই ঘড়ির বাজারও কি কম রমরমা ? চলুন , দেখে নেওয়া যাক

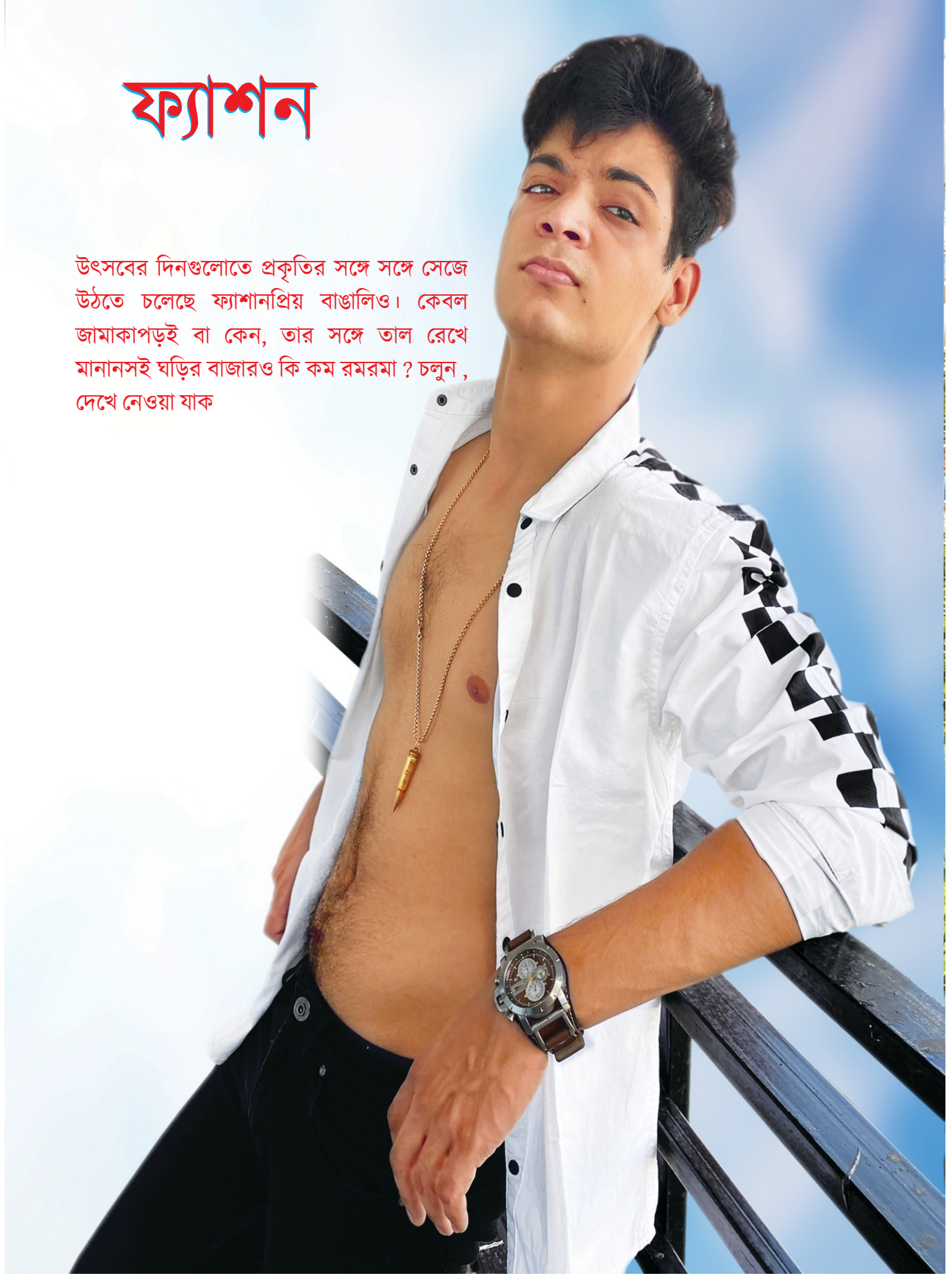

ঘড়ি : ল্যাকোস্টে
মূল্য : ৭,৯৫০ টাকা

ঘড়ি : টাইমেক্স
মূল্য : ২,৮৯৫ টাকা

ঘড়ি : ফেরারী
মূল্য : ১৯,৯৫০ টাকা

ঘড়ি : ডিজেল
মূল্য : ১২,২৯৫ টাকা

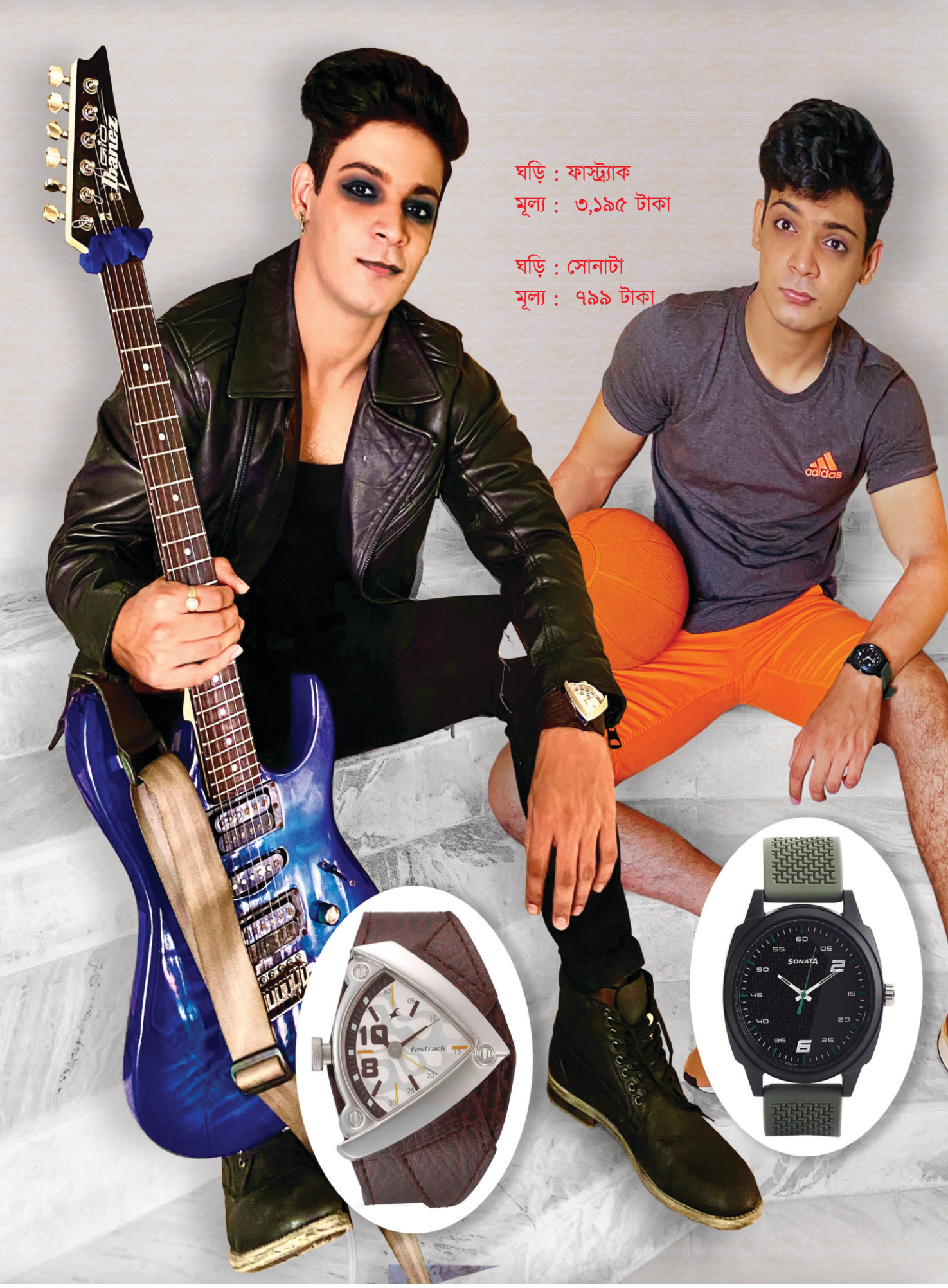
ঘড়ি : ফাস্ট্র্যাক
মূল্য : ৩,১৯৫ টাকা
ঘড়ি : সোনাটা
মূল্য : ৭৯৯ টাকা
adidas
fastrack
SONATA

ঘড়ি : ডিজেল
মূল্য : ৮,৯৯৫ টাকা

ঘড়ি : ফসিল
মূল্য : ৯,৪৯৫ টাকা

মডেল : আয়ুষ চৌধুরী

ফটো ফিচার

পার্পল সানবার্ড, সুন্দরবন

রুফাস নেকড হর্নবিল (ফিমেল), লাটাপাঞ্চার

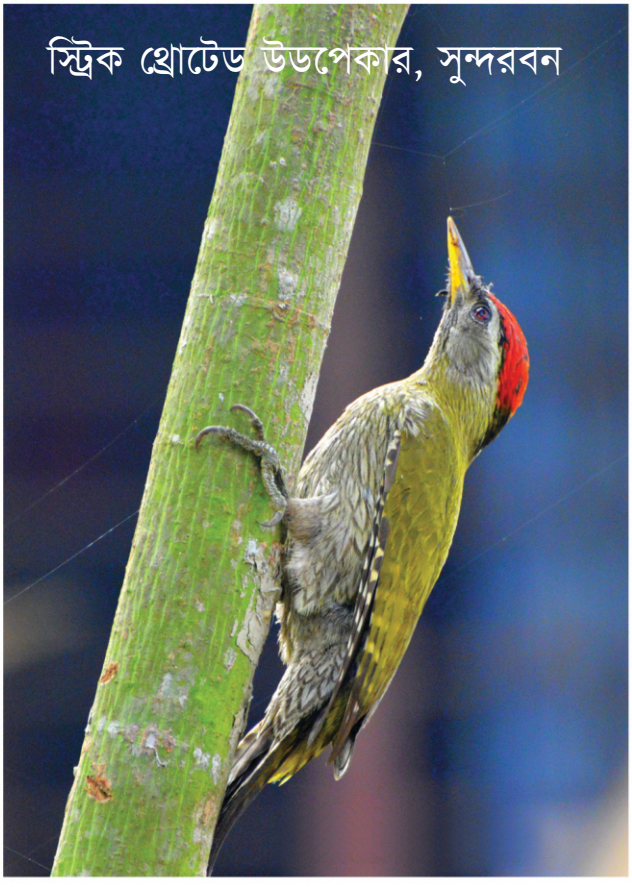

স্ট্রিক থ্রোটেড উডপেকার, সুন্দরবন

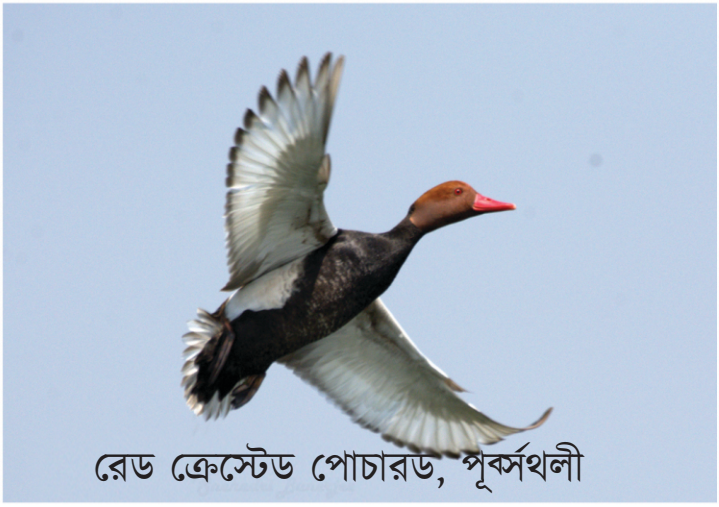

রেড ক্রেস্টেড পোচারড, পূর্বস্থলী

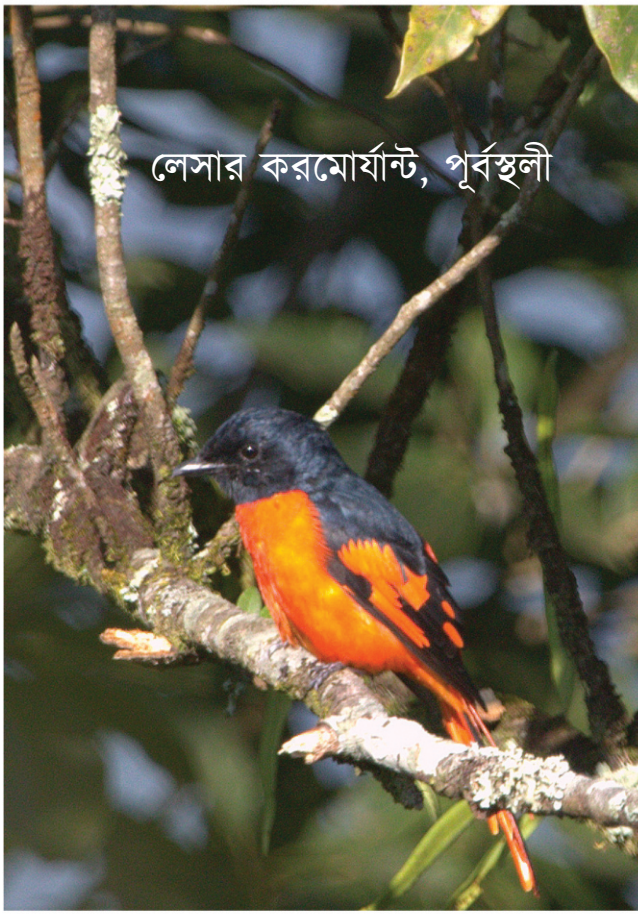

লেসার করমোর্যান্ট, পূর্বস্থলী

লিটল রিংড প্লোভার, পূর্বস্থলী

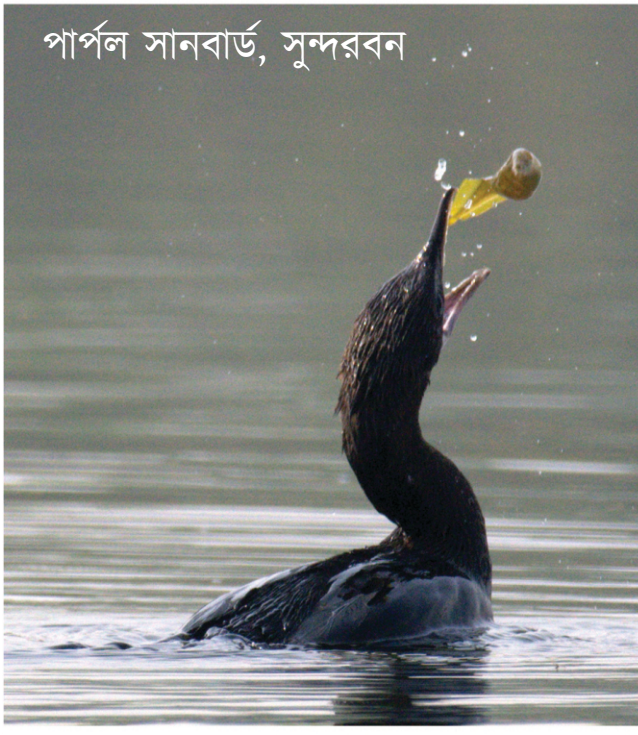

পার্পল সানবার্ড, সুন্দরবন

ফেজ্যান্ট টেলড জাকানা, রাজারহাট

ফোটোগ্রাফার : স্নেহাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত হল

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তীর আন্তর্জাতিক কলমে বিশ্বমানের থ্রিলার

নিউ ফাউন্ডল্যান্ডে থুনথারাপির জের
প্যারিস, হংকং হয়ে ভারতের ভুজে।
অন্যদিকে আফগানিস্তান থেকে
পাকিস্তান হয়ে আবার ভারতে।
কিন্তু কেন? এই বিশাল পরিব্যাপ্তির
রহস্যের পিছনে কি ষড়যন্ত্র?
রহস্যভেদে ব্রিগেডিয়ার
পরমজ্যোৎ সিংয়ের
অনামী টীম।
ইকো-টেরোরিজমের
এই জঘন্য প্রকেষ্টা
বিফল করা যাবে কি?

প্রত্যন্তের ডাক

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

বই পাওয়া যাবে দে বুক স্টোরে
এবং
লুক ইস্ট মিডিয়া প্রা. লি.
সিই ১৭, সল্ট লেক
কলকাতা- ৭০০০৬৪

যোগাযোগ: +৯১ ৯৮৩০০২৪১৫৩

ncbs

M/s. N C Banerjee & Son

Engineer & Govt. Contractor,Class A in MES

Room No M/30, Mezzanine Floor, 4, Fairlie Place,
HMP House, Kolkata- 700 01, (WB) India

Call Us

033 4063 3369

Web: www.ubinfra.com

Email: banerjee65@gmail.com

SRAM & MRAM

44, NORTH ROAD, BRIGHTON, BN1 1YR,
UNITED KINGDOM.

sales@srammram.com
info@srammram.com

www.srammram.com

A global conglomerate headquartered in London with offices across 5 continents.

Our Business

- Agriculture / Agro products
- Urban housing / Low cost housing
- Information technology / RFID / Animation
- Manufacturing / Mining
- Infrastructure

Our Group Companies

Puja Wishes

FROM

OVERSEAS CONSULTANTS
OC CONSULTANTS Pvt Ltd
OVERSEAS EDUCATION TRUST
BANGLASTREET
ONE STOP SKILL
LOOK EAST MEDIA Pvt Ltd
PROVIVA CONSULTANTS (INDIA) LLP
MEERA INTERNATIONAL FILMS
KROMOSOM DIAGNOSTICS LLP
PSC MEDISERVICES Pvt Ltd

CE-17 SECTOR-1 SALTLAKE, KOLKATA-700064
PH:033 4062 1285

FIVE STAR GROUP

MAIDEN CONTAINERISED CARGO MOVEMENT ON INDO BANGLADESH PROTOCOL ROUTE FROM HALDIA TO PANGAON

- Five Star Logistics is proud to announce the first voyage of containerized cargo movement through the Indo Bangladesh Protocol Route to further strengthen the ties between India and Bangladesh. This is the first movement of EXIM containers to Bangladesh through the protocol route.
- 45 containers carrying Sponge Iron on account of Rashmi Cements Limited and Orissa Metaliks Pvt. Ltd. will be loaded from Haldia Port for Pangaon Terminal in Bangladesh.
- The voyage will take about 8 days via Hemnagar and Mongla.
- Five Star Group would like to thank Rashmi Cement Limited, Orissa Metaliks Pvt Ltd., Haldia Port Authorities, Kolkata Customs and Adani Logistics for their guidance and support in making this vision a reality.
- This will be a regular service with a voyage every 15-20 days.

FIVE STAR LOGISTICS PVT. LTD.

OUR SERVICES :

◗ Stevedoring ◗ Logistics Storage ◗ Man Power handling ◗ Documentation

◗ Shipping Agency and Chartering ◗ Exporting & Importing (Iron Ore Fines, Coal, Clinker)

KOLKATA OFFICE : 19A, J. N. Road, Lesley House, 2nd Floor, Kolkata-700087, West Bengal India. Ph : 91-33-22171040 / 40014608, Fax : 91-33-22171041

HALDIA OFFICE : Ranichak, Haldia, Dist: Purba Medinipur, West Bengal, India. Ph: +91-3224 252415, +91-324093, Fax: +91-3224-251740